



একটি ত্রৈমাসিক বাংলা পত্রিকা

মূল্য - ৭৫ টাকা মাসিক, সংরক্ষণ ততদিন

স্বাধীনতা সংগ্রাম-শ্রেণী ঐক্য বজায় রেখে এস.সি., এস.টি., ও.বি.সি., সংখ্যালঘু, অসাম্প্রদায়িকতার অধিকার আন্দোলন গড়ে তুলুন

জাতিবাদ, ব্রাহ্মণ্যবাদের কবল থেকে ভারতবাসীদের মুক্ত করুন

পেটের পেটের বাহানায় অমানবিক উচ্ছেদ বন্ধ হোক

শ্রমিক শ্রমিকী পুঁজি বাজেয়াপ্ত করে ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের বিকাশ ঘটান

DAFODWAM thinks that India is a de facto upper caste Hindu state and the caste system derived from MANU SANGHITA is still the guiding philosophy of the ruling classes. Until the abolition of the caste system and discrimination based on gender and community there is no chance of the class struggle in whatever form.

DAFODWAM is taking programmes of rights of Dalits, Women and Minorities and Linguistics) DAFODWAM is in the area of publication of concerned subjects in different languages without support from any government(s) fund.

Correspondence :

ananta acharya
DAFODWAM
Road, Kolkata - 700 055
India
Phone: 318551, 3185854

dafodwam@gmail.com

Price : 75/-

Published by ananta acharya on behalf of DAFODWAM
Kolkata - 700 055, and Printed at Saakhin Mudran - 4, D.P.S. Rd., Kolkata - 700 033



মূল্য সংখ্যা - এপ্রিল ২০১৩ - ডিসেম্বর ২০১৩

Combined Issue CHETANA LAHAR

Volume - 3 No. 2

চেতনা
লাহর

সম্পাদকীয়

সবহারা দলিত মুক্তিসংগ্রাম সূচি শিল্প বা ভোজসভা নয়

সংরক্ষণ শব্দটি উচ্চারিত হলেই “ভদ্রলোক” সমাজ থেকে একটা গেল গেল রব উঠে আসে। যে অসংগঠিত নির্বোধ শিবির থেকে সংরক্ষণের বিরোধিতা করা হয় তাতে মেধা ও উৎকর্ষতার মানের অবনতির আশংকা করা হয়। তারা ধরেই নেয় যে মেধা উৎকর্ষতায় ভরপুর ওণীজন রাষ্ট্র, সমাজকে বেশ ভালো ভাবেই পরিচালনা করছেন। সেখানে “অযোগ্য নিম্নবর্ণ” জন কেবলমাত্র দৈহিক শ্রম ব্যবস্থার সাথেই যুক্ত থাকুক। বৈদিক কর্মকাণ্ডের একচেটিয়া অধিকার বর্ণ হিন্দুদের। ফলে সারাভারতের কোনও রাজ্যেই সরকারী নির্দেশানুসারে সঠিক সংরক্ষণ প্রয়োগ হয়নি।

ভারতীয়ের বিবর্তন তত্ত্ব পরেও পশ্চিমদেশের বহু বিজ্ঞানী প্রমাণ করতে পারেন নি যে কৃষ্ণাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় কম মেধার অধিকারী। আসলে মেধা উৎকর্ষতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় “বিদ্যে বোঝাই বাবুসমূহ চড়ি শখের বোটে” কবিতায় যা জ্ঞানান দিতে চেয়েছিলেন “ভদ্রলোক” বঙ্গসন্তানদের অনেকেই তার অর্থ বুঝতে পারেন নি।

মার্কসবাদের নামাবলী ধারণকারীরা সংরক্ষণের বিরোধিতা করেন ভিন্নপন্থায়। মার্কসবাদকে বইএর পাতার বাইরে এনে ভারতীয় সমাজ জীবনের প্রতিটি স্তরের প্রভুত্ববাদী ভাবনার বিশ্লেষণী চর্চার সাপে না মেলালে “শ্রেণীসংগ্রাম”, “শ্রেণী ঐক্য”র আরাধনা হবে, বাস্তবে ভারতের সমাজজীবনে প্রাথমিক স্তরের গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডল তৈরী হবে না। অন্ততঃ ৩ হাজার বছরের একটি সুসংরক্ষিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংরক্ষণ আন্দোলন একটি অতি দুর্বল কিন্তু ইংগিতবাহক হাতিয়ার। ভারতের মতো দেশে যেখানে শিল্প ঐক্যব ঘটেনি এবং সমাজ কাঠামো প্রাক পুঁজিবাদী অনাধুনিক সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই তার প্রাণশক্তি খুঁজে পাচ্ছে, সেখানে যে কোন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি বা সংগঠনকে জাতিভেদ ব্যবস্থা, বর্ণহিন্দু সাম্প্রদায়িকতা এবং পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে কথা ও কাজ চালিয়ে যেতে হবে। বি.আর.আম্বেদকর সারাজীবন নানাধরনের গণনাগোড়নের মধ্যেও যে সংরক্ষণ ব্যবস্থার জনক হিসাবেই পরিচিত তিনিও আশংকা

করেছিলেন যে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পদাধিকারীপণ সংরক্ষণের সুবিধা পেয়েও পে ব্যাক টু দি সোসাইটি উপদেশকে অগ্রাহ্য করে শাসন ক্ষমতার উচ্ছিন্নভোগীতে পরিণত হবে। এই সুযোগেই ভারতে মনুবাদী শাসকবর্গ আন্দোলনকে সংবিধান রচয়িতা ছাড়া অন্য কোন পরিচয়ে পরিচিত করাতে চায় না। দলিত নেতাদের অধিকাংশই জানেন না যে আন্দোলনকারী তাঁর তথাকথিত রচিত সংবিধানের অনেকাংশের সাথে সহমত ছিলেন না।

কেন্দ্র বা রাজ্যের শাসকবর্গ যেহেতু নতুন কোন বিরশামুভা, সিধো, কানহ, ফুলে, পেরিয়ার, ভগৎ সিং, বেগম রোকেয়া, হরিচাঁদ, গুরুচাঁদের চেহারা দেখতে চায় না, তাই আনুগত্যে বিগলিত বিধায়ক, মন্ত্রী, সাংসদদের মধ্যে দলিত, সংখ্যালঘু, মহিলাদের বর্তমান অপমানকারী রাষ্ট্রব্যবস্থার দাসত্বে বাঁধা হয়।

উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কহীন দৈহিক শ্রম বিমুখ পরগাজা মধ্যবিত্ত যেমন তাদের দৌল্যমান মানসিকতা নিয়েই শ্রমিক কৃষক আন্দোলনের নেতা হয়ে যায় এবং যার ফলে সমাজ বিবর্তনে যাদের নেতৃত্বে হওয়ার কথা, যাদের নীতি নির্ধারক হওয়ার কথা তাঁরা নির্দেশপালকের ভূমিকায় থেকে যায়। তেমনই দলিত, আদিবাসী, সংখ্যালঘু, মহিলাদের ক্ষোভকে প্রশমিত করার জন্য ভারতের শাসকবর্গ পরিচয়ের সংকটকে (Identity Crisis) কে গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাধান না করে পরিচয়ের রাজনীতিকে (Identity Politics) প্রদায় দেয় যা পরবর্তীকালে পরিচয়ের উগ্রজাত্যাভিমানী (Identity Chauvinism) শক্তিতে পরিণত হয় যা অবলিলাক্রমে দিল্লীর পুতুলে পরিণত হয় এবং এইসব দাসানুদাসদের সাথে বিশাল ভারতবাসীর সম্পর্ক অন্য কোন দলের নেতাদের মতোই কোনও ফারাক থাকে না।

দেশের ৮৫ শতাংশ বাসিন্দা যখন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিবেশ এবং সর্বোপরি মর্যাদা থেকে প্রতিদিন বঞ্চিত থাকছে তখন রাজস্বক্ষমতার ক্ষুদ্র ভাগিদার হওয়ার প্রচেষ্টার পরিবর্তে সকলের জন্য ক্ষমতা তথা সমতাবাদের পথই গনতান্ত্রিক ভারতের সন্ধান দেবে।

মহাত্মাকে ড: বি. আর. আম্বেদকরের

উত্তর

ভাষান্তর:- উৎসা আহমেদ

এক

‘জাত পাত-তোড়ক মন্ডল’-এর অধিবেশনের জন্য জাত-ব্যবস্থার ওপর আমার প্রস্তুত ভাষণ সম্বন্ধে ‘হরিজন’ পত্রিকায় মহাত্মা যে বিচার ব্যক্ত করেছেন, তার জন্য আমি সম্মানিত বোধ করছি। এটা স্পষ্ট যে, জাত-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমি যে অভিমত ব্যক্ত করেছি, তার থেকে মহাত্মার অভিমত সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রতিপক্ষের সঙ্গে বাধ্য করতে পারে, এমন কোনও কারণ না থাকলে বিতর্কে জড়িয়ে পড়া আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ। যদি আমার প্রতিপক্ষ কোনও নীচ ও অখ্যাত ব্যক্তি হতেন, তা হলে আমি তার বিরুদ্ধতায় যেতাম না। কিন্তু আমার প্রতিপক্ষ হলেন স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী। তাই মনে করছি, তিনি যে-সব মন্তব্য করেছেন, তার প্রত্যুত্তর দিতে আমার চেষ্টা করা উচিত। আমাকে সম্মান দেখানোর জন্য যদিও আমি কৃতজ্ঞ, তবু আমি বিশ্বাস প্রকাশ না করে পারছি না যে, অন্য কেউ নন, স্বয়ং মহাত্মা আমাকে অভিযুক্ত করেছেন এই বলে যে, আমি প্রচারের লোভে না-দেওয়া ভাষণটি প্রকাশ করেছি, পাছে আমি হারিয়ে না যাই, এই উদ্দেশ্য নিয়ে। মহাত্মা যা মনে হয় বলুন, কিন্তু এই ভাষণটি প্রকাশ করার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের চিন্তা করার জন্য উসকে দেওয়া এবং তাদের নিজের অবস্থা সম্বন্ধে জানা। প্রচারের জন্য আমি কখনও লালায়িত নই, যদি হতাম তা হলে ইচ্ছা বা চাওয়ার অনেক বেশি পেতে পারতাম। যদি মেনেও নেওয়া যায় যে, প্রচারের উদ্দেশ্যই আমি ভাষণটি মুদ্রিত করেছি, তা হলেই বা কে আমাকে পাথর নিক্ষেপ করতে পারে? নিশ্চয়ই ওঁরা নন, যারা মহাত্মার মতো কীচের ঘরে বাস করেন?

দুই

উদ্দেশ্যের কথা বাদ দিলে, ভাষণে যে সব প্রশ্ন আমি তুলেছি, সে সম্বন্ধে মহাত্মার মত আমার আছে? প্রথমত, যে কেউ আমার ভাষণ পড়বেন, তিনিই বুঝতে পারবেন যে মহাত্মা আমার তোলা প্রসঙ্গগুলি, যা তাঁর মতে হিন্দুদের প্রতি আমার অভিযোগ, সেগুলি প্রমাণিত করতে পারেননি।

আমার ভাষণে প্রধান যে প্রসঙ্গগুলি তোলা হয়েছে, তা হলো :

(১) জাত-পাত হিন্দুদের ধ্বংস করে দিয়েছে;

(২) চাতুর্বর্ণ্য-এর ওপর ভিত্তি করে হিন্দু ধর্মের পুনর্গঠন অসম্ভব। কারণ, বর্ণ-বাহন ফুটোপাতের মতো অথবা নাককে দিশা করে দৌড়বার মতো। এই ধর্ম নিজের গুণের জন্য নিজের শক্তিতে দাঁড়িয়ে থাকতে অসমর্থ। জাত-ব্যবস্থার মধ্যে নিজেকে অধ:পতিত করবার রয়েছে এর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, যতক্ষণ না বর্ণউন্নয়ন করতে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আইন ব্যবস্থা চাপানো হয়;

(৩) 'চাতুর্বর্ণ্য'-কে ভিত্তি করে হিন্দু সমাজের পুনর্গঠন ক্ষতিকর। কারণ বর্ণ ব্যবস্থা জনগণকে অধ:পতিত করে, তাদের জ্ঞান অর্জনে বাধা সৃষ্টি করে এবং শত্রুহীন করে বলহীন করে তোলে;

(৪) সমাজকে পুনর্গঠিত করতে হবে, যার মূলনীতি হবে স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃ;

(৫) ধর্মের পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে 'জাত' এবং 'বর্ণকে' ধ্বংস করতে হবে;

(৬) 'জাত' বা 'বর্ণের' পবিত্রতা কেবল 'শাস্ত্র'র ধর্মীয় কর্তৃত্বই ধ্বংস করতে পারে।

দেখা যাবে, মহাত্মা যে-সব প্রশ্ন তুলেছেন, তা সম্পূর্ণভাবেই প্রসঙ্গ বহির্ভূত। ভাষণের প্রধান যুক্তিগুলি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণে ব্যর্থ হয়েছে।

তিন

মহাত্মা কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নগুলি ব্যাখ্যা করে দেখা যাক। মহাত্মার প্রথম প্রশ্ন, আমি যে-সব গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি নিয়েছি, সেগুলি প্রামাণ্য নয়। আমি স্বীকার করছি, এ বিষয়ে আমার যোগ্য পাণ্ডিত্য নেই। কিন্তু আমি বলতে চাই, যে-সব গ্রন্থ থেকে আমি উদ্ধৃতি দিয়েছি, সেগুলির রচয়িতা প্রয়াত তিলক, যার সংস্কৃত ভাষা এবং 'শাস্ত্র' বিষয়ে পাণ্ডিত্য স্বীকৃত। তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্ন, কোনও শিক্ষিত ব্যক্তির শাস্ত্র ব্যাখ্যা নয়, সন্ত দ্বারা ব্যাখ্যাত শাস্ত্রই গ্রহণ করতে হবে, কারণ সন্তরাই একমাত্র তা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। 'শাস্ত্র' কখনও জাতপাত বা অস্পৃশ্যতাকে সমর্থন করে না। প্রথম প্রশ্নটি সম্বন্ধে মহাত্মাকে যা জিজ্ঞাসা করতে চাই, তা হল, মূল গ্রন্থটি যদি হয় প্রক্ষিপ্ত কিছু অংশ এবং সন্তদের থেকে বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা, তা হলে একজন তার থেকে কী পেতে পারে? জনসাধারণ মূল গ্রন্থ বা কোনও গ্রন্থের প্রক্ষিপ্ত অংশের পার্থক্য করে না। তারা জানেই না, মূল গ্রন্থটি কী? তারা এতই নিরক্ষর যে, শাস্ত্রে কী আছে, তাও জানে না। যা তাদের বলা হয়, তাই বিশ্বাস করে। তাদের বলা হয়, তা হল, 'শাস্ত্র' জাতপাত ও অস্পৃশ্যতাকে ধর্মীয় কর্তব্য বলে নির্দেশ করে।

সন্তদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই, আমার এই বক্তব্যকে যে-কেউ অনুমোদন করবেন যে, পণ্ডিত ব্যক্তিদের তুলনায় সন্তদের উপদেশ যত উচ্চ এবং স্বতন্ত্র হোক না কেন, তা শোচনীয়ভাবে প্রভাবহীন। সন্তদের প্রভাবহীনতার কারণ দুটি। প্রথমত, সন্তদের কেউ-ই কখনও জাত-ব্যবস্থাকে আক্রমণ করেননি। উপরন্তু তারা জাত-ব্যবস্থার কট্টর বিশ্বাসী। তাঁদের অধিকাংশই যে জাতের, সেই জাতের সদস্য হিসাবেই জীবন ধারণ করেছেন এবং মৃত্যুবরণ করেছেন। ব্রাহ্মণ হিসাবে জ্ঞানসেব তার পদমর্যাদা সম্বন্ধে এতই আবেগপ্রবণ ছিলেন যে, যখন পৈথামের ব্রাহ্মণরা তাঁকে তাঁদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকার করেন, তখন তিনি ব্রাহ্মণ সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত ব্রাহ্মণের পদমর্যাদালাভের জন্য স্বর্গ-মর্ত্য ছুটে বেড়িয়েছেন। এমনকি, সন্ত একনাথ, যিনি এখন 'ধর্মাত্মা' চলচ্চিত্রে অস্পৃশ্যদের স্পর্শ করার জন্য এবং তাদের সঙ্গে আহারের জন্য নায়ক হিসাবে পরিগণিত, তিনিও জাতপাত বা অস্পৃশ্যতার বিরোধিতার জন্য তা করেননি। কারণ তিনি জানতেন, গঙ্গায় ডুব দিলেই সব দূষণ ধুয়ে যাবে। সন্তরা আমার গবেষণায়, কখনও জাতপাত বা অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রচার অভিযানে নামেননি। সমাজে যে সংঘর্ষ চলছে, তা নিয়ে তাঁরা ভাবেননি। তাঁরা ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিয়েই ভাবিত ছিলেন। সব মানুষ সমান এমন শিক্ষাও তাঁরা দেননি। তাঁরা বলেছেন, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সব মানুষ সমান— এ এক বিসদৃশ অহানিকর প্রস্তাব, যার প্রচারে কারও অসুবিধা হবার কথা নয় বা বিশ্বাস কারও কারও পক্ষে বিপজ্জনক নয়।

সন্তদের প্রস্তাব কেন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, তার দ্বিতীয় কারণ হল, জনসাধারণকে শেখানো হয়েছে যে, সন্তরা জাত ভাঙতে পারেন, কিন্তু সাধারণ মানুষ নয়। একজন সন্ত তাই কখনও অনুসরণযোগ্য হয়ে ওঠেননি। সর্বদা সম্মানযোগ্য ধর্মপরায়েণ ব্যক্তি হিসাবে থেকেছেন। জাতপাত এবং অস্পৃশ্যতার কট্টর সমর্থক হিসাবে জনসাধারণ পড়ে আছেন। এর থেকে বোঝা যাবে, কেন সন্তদের পবিত্র জীবন এবং মহান উপদেশ 'শাস্ত্র'-এর বিপক্ষে জনসাধারণের জীবনে ও আচরণে প্রভাব ফেলতে পারেনি। অবশ্য সান্তনা পাবার কোনও কারণ নেই এই থেকে যে, অনেক সন্ত ছিলেন বা একজন মহাত্মা আছেন যারা 'শাস্ত্র'কে বিদ্বান ও অনেক অজ্ঞ ব্যক্তির চেয়ে ভিন্নভাবে উপলব্ধি করেছেন। জনসাধারণ 'শাস্ত্র' সম্বন্ধে ভিন্ন ধারণা পোষণ করে, এই তথ্যকে মান্যতা দিতে হবে। দোষ না করলে 'শাস্ত্র'র কর্তৃত্বকে কীভাবে অস্বীকার করা যাবে, যা এখনও তাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে? মহাত্মা এই প্রশ্নটি নিয়ে ভাবেননি। শাস্ত্রীয় উপদেশের প্রভাব থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করার জন্য মহাত্মা যতই প্রভাব বিস্তারের কথা ভাবুন না কেন, তাঁকে মানতেই হবে যে, কোনও ভাল স্যামারিয়া (Samaritan) পবিত্র জীবন যাপন

করে নিজেকে উন্নীত করতে পারেন। কিন্তু ভারতবর্ষের সন্তদের প্রতি ও মহাত্মার প্রতি সাধারণ মানুষের যে দৃষ্টিভঙ্গি — তাদের সম্মান করতে পারে কিন্তু অনুসরণ নয় — এর চেয়ে বেশি কেউ কিছু করতে পারবে না।

চর

মহাত্মার তৃতীয় প্রসঙ্গ হল, চৈতন্য, জ্ঞানদেব, তুকারাম, বিরুবজুবাব, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রমুখ দ্বারা অনুসৃত ধর্ম কখনও বৈশিষ্ট্যহীন হতে পারে না, যে রকমভাবে আমি বিবৃত করেছি। কোনও ধর্ম বিচারিত হবে তার তার শ্রেষ্ঠ দিকগুলির ভিত্তিতে, নিম্নতম দিকগুলির ভিত্তিতে নয়। এই মন্তব্যের প্রতিটি কথাই আমি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, মহাত্মা এর দ্বারা কী প্রমাণ করতে চেয়েছেন। এ কথা ঠিক যে, ধর্মের যাচাই হবে তার উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে, তার অপকৃষ্ট দিকগুলি নিয়ে নয়। কিন্তু এতেই কি বিষয়টির সমাপ্তি ঘটে। আমি বলি — না। প্রশ্ন থেকেই যায় — কেন অপকৃষ্টের সংখ্যা বেশি, উৎকৃষ্টের সংখ্যা কম? আমার চিন্তায় এই প্রশ্নের কল্পিত উত্তর দুটি হতে পারে: (১) কিছু নিজস্ব বিপথগামীতাই অপকৃষ্টতার কারণ এবং নৈতিক দিক দিয়ে শিক্ষণীয় নয়। এই কারণে, ধর্মীয় আদর্শকে প্রভাবিত করতে অক্ষম বা (২) ধর্মীয় আদর্শ সম্পূর্ণ ভুল আদর্শ, যা সাধারণের জীবনে ভুল নৈতিকতাকে মোড় দিয়ে নিশিয়েছে অনেকের জীবনে, যাতে ভুল আদর্শ হওয়া সত্ত্বেও যা শ্রেষ্ঠ, তা শ্রেষ্ঠই রয়ে গেছে — বাস্তবে ভুল আদর্শকে সঠিক দিশার মোড় দিয়েছে। এই দুটি ব্যাখ্যার মধ্যে আমি প্রথমটি মানতে রাজি নই। আমার বিশ্বাস, মহাত্মাও এর বিপরীতে যাবার জন্য চাপ দেবেন না। আমার বিচারে দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি কেবল যুক্তিপূর্ণ এবং সঙ্গত যতক্ষণ না মহাত্মা তৃতীয় একটি বিকল্পে দেখাতে চান অপকৃষ্টের সংখ্যা কেন এত বেশি এবং উৎকৃষ্টের সংখ্যা কম। যদি দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিই একমাত্র ব্যাখ্যা হয়, তা হলে মহাত্মার এই উক্তি, যাতে বলা হয়েছে, ধর্ম তার শ্রেষ্ঠ অনুগামীদের দ্বারা বিচার্য, তা হলে তা আমাদের কোনও কিছু করার থাকে না, কেবল যে বিরাট সংখ্যক মানুষ ভুল আদর্শের জন্য বিপথচালিত, তাদের প্রতি দয়া প্রকাশ ছাড়া।

পাঁচ

সন্তদের নিদর্শন অনেকের দ্বারা অনুসৃত হলেই যে, হিন্দুধর্ম সহনীয় হত, মহাত্মার এই যুক্তি ও অন্য কারণে বিভ্রান্তিকর। চৈতন্য প্রমুখ মহান ব্যক্তিদের উল্লেখ করে আমার মনে হয় মহাত্মা উল্লেখ করতে চেয়েছেন যে, হিন্দু-সমাজকে সহনীয় এমন কী সুখী করে তোলা যায় কাঠামোগত মৌলিক কোন পরিবর্তন না করে, যদি উচ্চ বর্ণের সমস্ত হিন্দুকে প্রাণিত করা যায়, নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে ব্যবহারের উচ্চ নৈতিক মান বজায় রাখতে। আমি এই ধরনের আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী। আমি স্বীকার করতে পারি বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে তাদের, যারা নিজেদের জীবনে উচ্চ আদর্শকে উপলব্ধি করেছে। এই ধরনের লোক ছাড়া ভারত বর্তমানে যে অবস্থা আছে, তার চেয়ে কুৎসিত এবং কম সুখদায়ক বলে গণ্য হত বাস করার পক্ষে। তৎসত্ত্বেও যদি কেউ বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যদের ভাল মানুষ করার জন্য তাদের ব্যক্তিগত চরিত্র উন্নয়নের

চেষ্টা করেন, তা হলে আমার বিবেচনায় তা হবে শক্তিশালী এবং ভ্রমকে আঁকড়ে ধরা। ব্যক্তিগতভাবে কি একজন অল্প প্রস্তুতকারককে ভাল মানুষ করতে পারে অর্থাৎ সে গোলা বিক্রি করবে কিন্তু সেই গোলাটি ফাটবে না আর গ্যাস থেকে বিষ বের হবে না? যদি তা না হয়, তা হলে জাত-চেতনায় ভারপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তিগত চরিত্র বদল করে ভাল মানুষ করা যাবে, যে তার সঙ্গী ও বন্ধুদের সমান ভাবে? নিজের প্রতি সং হবার জন্য, সে তার সঙ্গীদের সঙ্গে উচ্চতর গা নিম্নতর হিসাবে ব্যবহার করবে, যে-ভাবেই হোক নিজের জাতের চেয়ে অন্য রকম ব্যবহার করবে, তাকে কখনও নিজের জাতের সঙ্গে যে-রকম ব্যবহার করা হয়, সে-রকম সঙ্গীদের সঙ্গে ব্যবহার প্রত্যাশা করা যায় না। সত্যি বলতে কি একজন হিন্দু তার জাতের বহিরের কোনও লোকের সঙ্গে এমন ব্যবহার করে, যেন সে ব্যক্তিটি বহিরাগত। কোনও শাস্তি ছাড়াই তার সঙ্গে বিভেদমূলক ব্যবহার করা যাবে এবং কোনও রকম লজ্জা ছাড়াই তার সঙ্গে জালিয়াতি গা ধামা দেওয়া যাবে। বলা যায়, একজন অধিকতর খারাপ হিন্দু পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু একজন ভাল হিন্দু পাওয়া যাবে না। এটা এ জন্য নয় যে, তার ব্যক্তিগত চরিত্রে কিছু ত্রুটি আছে। আসলে নিজের সঙ্গীদের সঙ্গে ব্যবহারে কিছু ত্রুটি আছে। মানুষের মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ তা নৈতিকতা হতে পারে না, যদি সঙ্গীদের সঙ্গে তার ব্যবহারের ভিত্তি একটি ত্রুটিপূর্ণ ভুল হয়। একজন দাসের কাছে তার প্রভু কম ভাল বা খারাপ হতে পারে, কিন্তু ভাল হবে না। একজন ভাল মানুষ কখনও প্রভু হতে পারে না এবং একজন প্রভু কখনও ভাল মানুষ নয়। এটা উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্নবর্ণের মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একজন নিম্নবর্ণের মানুষের কাছে একজন উচ্চবর্ণের মানুষ অন্য উচ্চ জাতের লোকের চেয়ে অধিকতর ভাল খারাপ হতে পারে। উচ্চবর্ণের মানুষ কখনও ভাল মানুষ হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে স্বতন্ত্র চিহ্নিত করার জন্য নিম্নবর্ণের মানুষ থাকবে। একজন নিম্নবর্ণের মানুষের পক্ষে সচেতন থাকার ঠিক নয় যে, তার চেয়ে উচ্চবর্ণের লোক রয়েছে। আমার ভাষণে আমি দেখিয়েছি, 'বর্ণ' বা 'জাত' — এর ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকা সমাজ হল ত্রুটিপূর্ণ সম্পর্কের সমাজ। আশা করব, মহাত্মা আমার যুক্তিকে বণ্ডন করতে সচেষ্ট হবেন। (কিন্তু তা না করে, প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ না করে 'চরিত্র' ও পর তাঁর বিশ্বাসের পুনরাবৃত্তি করেছেন।)

ছয়

মহাত্মা যে উপদেশ দেন, তা পালন করেন তো? যে বিতর্ক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত তাতে গাঢ়পট সমালোচনা পছন্দযোগ্য নয়। কিন্তু যখন একজন প্রচারক একটি মতবাদ প্রচার করেন, তখন সাধারণভাবেই মন কৌতুহলী হয়ে ওঠে জানতে, তিনি যা প্রচার করছেন, তা কি পালন করেন? হতে পারে তাঁর আচরণে ব্যর্থতার কারণ হল উচ্চ আদর্শ, মানুষের মজাগত জগত। যাই হোক, তার আচরণ তদন্তসাপেক্ষ এবং আমার ওপর দোষ চাপালে চলবে না যদি আমি অজ্ঞান থাকি, মহাত্মা নিজের ক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ কতদূর বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেছেন। মহাত্মা মহাত্মা বেনিয়া। স্বাক্ষরগণা তাঁদের পূর্বসূরীদের ভেঁকে মন্ত্রীত্বপদ প্রদান করলে তাঁরা

ব্যবসা-বাণিজ্যকে বর্জন করেছিলেন। তাঁর নিজের জীবনে, মহাত্মা হওয়ার পূর্বে, সুযোগ এলে তিনি আইন ব্যবসাকেই বেছে নিয়েছিলেন। আইন-ব্যবসা পরিত্যাগ করে তিনি আধা-সন্ন্যাসী ও আধা রাজনীতির জীবন বেছে নিয়েছিলেন। পূর্ব-পুরুষদের বর্জিত ব্যবসা তিনি কখনও-ই গ্রহণ করেননি। তাঁর কণিষ্ঠ পুত্র — আমি জানি তিনি তাঁর বাবার ঘনিষ্ঠ অনুগামী — বৈশ্য সম্প্রদায়ে জন্মেও ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিয়ে করে পত্রিকা ব্যবসায়ীরা পেশা বেছে নিয়েছিলেন। পূর্বপুরুষদের অনুসরণ না করলেও, অন্য ব্যবসা করলেও তিনি তাঁকে নিন্দা করেননি। কোনও আদর্শের কেবল খারাপ দিকগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করলে ভুল এবং অনুদার হবে। কিন্তু নিঃসন্দেহে মহাত্মার কাছে এর চেয়ে উল্লেখ্য কিছু নেই এবং যদি তিনি অনুভব করতে ভুল করেন, তা হলে সেই আদর্শ ছিল অসম্ভব — মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তির বিরোধী। কালহিলের জ্বর জানত যে, কোনও কিছু ব্যক্ত করার আগে তা নিয়ে বহু চিন্তার প্রয়োজন। আমি অবাক হচ্ছি, জাত-প্রথা সম্বন্ধেও মহাত্মার অনুরূপ ধারণা। না হলে যে প্রশ্নগুলি আমার মনে জাগছে, সেগুলি মহাত্মাকে এড়িয়ে যেত না। কোনও পেশা কখন পৈতৃক পেশা ছিল, তা জেনে মান্য করার কি বাধ্যবাধকতা মানুষের আছে? যদি উত্তর-পুরুষের কারও এই পেশা সহ্য না হয়, তবে কেন পেশা তাকে গ্রহণ করতে হবে? যদি পূর্বপুরুষদের পেশা অনৈতিক হয়, তবেও কি তা তাকে অনুসরণ করতে হবে? যদি কারও ঠাকুরা দালাল ও ঠাকুমা বেশ্যা হয়, তবে কি উত্তরপুরুষ মেয়ে সংগ্রহকারী দালাল ও বেশ্যাই থাকবে? মহাত্মা কি তাঁর মতবাদের বৃত্তিসম্মত উপসংহার মেনে নেবেন? আমার মতে, পূর্ব-পুরুষের পেশাকে গ্রহণ করার আদর্শ কেবল অসম্ভব-ই নয়, অবাঞ্ছনীয়। নৈতিকতার দিক থেকেও সমর্থনযোগ্য নয়।

সাত

একজন ব্রাহ্মণের আজীবন ব্রাহ্মণ হয়ে থাকাকে মহাত্মা অতিশয় গুণ মনে করেন। এই তথ্যটি বাদ দিলেও দেখা যায়, অনেক ব্রাহ্মণ-ই সারা জীবন ব্রাহ্মণ থাকতে চান না। তাদের আমরা কি বলব যে, ব্রাহ্মণরা সারা জীবন পূর্বপুরুষদের অনুসৃত যাজক বৃত্তিই পালন করে যাবে? তারা কি তাদের পূর্বপুরুষদের নৈতিকতার ওপর গভীর আস্থা রাখে, না অন্য আর্থিক লাভের লোভে তা করে যায়? মহাত্মা নিশ্চই-ই এই অনুসন্ধান নিয়ে ভাবিত নন মনে হয়। তিনি খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন এই ভেবে যে, “প্রকৃত ব্রাহ্মণ তাঁরই যারা বিনা পরসায় পাওয়া শিক্ষাকে নিয়ে বেঁচে আছেন এবং পরসায় না নিয়ে তা বিতরণ করছেন।” বংশানুক্রমিকভাবে যাজক বৃত্তি গ্রহণ করা — মহাত্মার কাছে তা আধ্যাত্মিকতার ভাণ্ডার। কিন্তু অপর একটি চিত্রও বংশানুক্রমিক ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে অঙ্কন করা যায়। একজন ব্রাহ্মণ, প্রেমের দেবতা বিষ্ণুর পূজক হতে পারে। অপর একজন, শঙ্কর — ঋগ্বেদের দেবতারও পূজক হতে পারে। বুদ্ধগায়ার গিয়ে বুদ্ধের পূজারী হতে পারে, যে বুদ্ধ — মানবতার মহানতম শিক্ষক, যিনি মহৎ “প্রেমের” শিক্ষা দিয়েছেন। কেউ বা কালীর — যার রক্ত-তৃষ্ণাকে তৃপ্ত করতে রোজ একটি করে জন্তু বলি দিতে হয়। কেউ বা রাম — ক্ষত্রিয়দের দেবতার পূজারী হতে পারে। পরশুরাম, যিনি ক্ষত্রিয়দের

ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন, সেই অবতারেরও কেউ-কেউ পূজারী হতে পারে। বিশ্বের ষাঁটা ব্রাহ্মণও পূজারী হতে পারে। একজনও কেউ বলতে পারে না, এই ছবিটাই সত্য নয়। চিত্রটি সত্য হলে কেউ জানে না, কী বলা হবে দেব-দেবীর প্রতি অনুগত থাকার এই ক্ষমতাকে? কারণ তাদের লক্ষণ এত পরস্পর বিরোধী যে, কোনও সংস্কৃতির পক্ষে তাদের সকলের পূজা করা সম্ভব নয়। এই অত্যাশ্চর্য ঘটনাকে হিন্দুরা তাদের ধর্মের সবচেয়ে বড় গুণের সাক্ষ্য মনে করে অর্থাৎ তাদের উদারতা এবং সহিষ্ণুতা। এই সরল বিশ্বাসের বিপরীতে জোড় দিয়ে বলা যায় যে, সহিষ্ণুতা বা উদারতা, প্রকৃতপক্ষে উদাসীনতা অপেক্ষা অভিনন্দনযোগ্য আর কিছু নয়। বাইরে থেকে এই দুই মনোভাবকে পার্থক্য করা শক্ত। কিন্তু যথার্থ গুণ বিচারে এরা এত মৌলিকভাবে স্বতন্ত্র যে, ঘুরিয়ে দেখলে কেউ একটিকে অপর একটি বলে ভুল করতে পারে না। একজন মানুষ বহু দেব-দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রস্তুত থাকলে-ই হয়তো সেটাই উদারতার নিদর্শন বলা হবে। কিন্তু তা কি তার অমনোযোগের প্রমাণ হতে পারে না, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ইচ্ছা থেকে তার জন্ম? আমি নিশ্চিত যে, এই সহনশীলতা কপটতারই প্রমাণ। যদি এই অভিমত দৃঢ় ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হলে কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে যে, একজন ‘পূজারী’র এমন কি অধ্যাত্ম সম্পদ থাকতে পারে, যার জন্য প্রয়োজন মেটাতে যে কোনও দেব-দেবীর সে পূজা বা আরাধনা করতে পারে? আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তিকে কেবল সেউলিয়া বলাই যথেষ্ট নয়, সে পূজারীর পেশা গ্রহণ করেছে এই জন্যে যে, এটি তার পূর্বপুরুষের পেশা — কোনও আস্থা বা বিশ্বাসের জন্য নয়। যান্ত্রিকভাবে পিতা-পুত্র এই পেশা হস্তান্তরিত হয়েছে। এটা কোনও গুণের সংরক্ষণ নয়, একটি মহৎ বৃত্তির অপপ্রয়োগ, যা ধর্ম-সেবা ছাড়া কিছুই নয়।

আট

পূর্বপুরুষদের বৃত্তিতে উত্তরপুরুষ অনুরক্ত হবে, এই তত্ত্বকে কেন মহাত্মা আঁকড়ে রয়েছেন? তিনি তার কারণ কোথাও লেখাননি। কিন্তু নিশ্চই এই সম্পর্কে তাঁর কাছে কিছু তথ্য আছে যা তিনি এড়িয়ে যেতে বিধা করেননি। “ইয়ং ইন্ডিয়া” পত্রিকায় প্রকাশিত ‘জাত বনাম শ্রেণী’ প্রবন্ধে মুক্তি দেখিয়েছিলেন, জাত প্রথা শ্রেণী প্রথার থেকে অনেক ভাল, বিশেষত এই প্রথা সামাজিক স্থিতির ক্ষেত্রে সর্বোত্তম সামঞ্জস্য। স্ত্রী অথবা পুরুষ যার-যার পুরুষানুক্রমিক পেশায় যুক্ত থাকলে সমাজব্যবস্থা স্থিতিশীল হবে। মহাত্মা যদি এই ভেবে থাকেন তা হলে ভুল সিদ্ধান্ত আঁকড়ে আছেন। প্রত্যেকেই সমাজের সুস্থিতি চায়। ব্যক্তিগত ও শ্রেণী উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করেই সমাজের মধ্যে এই সুস্থিতি বজায় থাকে। কিন্তু আমি নিশ্চিত, দুটি বিষয় কেউ চায় না। একটি বিষয় নিশ্চল সম্পর্ক যা অপরিবর্তনীয় এবং স্থির, কেউ তা চায় না। সুস্থিতির চাহিদা আছে, কিন্তু যখন পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তখন নয়। দ্বিতীয়ত, কেউ-ই কেবলমাত্র সমঝোতা চায় না। সামাজিক ন্যায়কে ত্যাগ করে কেউ সমঝোতা চায় না। এটা কি বলা যায়, সামাজিক সম্পর্ক জাত প্রথার ওপর অর্থাৎ নিজের পৈতৃক পেশার ওপর নির্ভর

করে? আমার হির বিশ্বাস যে, তা করে না। সম্ভাব্য সবচেয়ে ভাল সমঝোতা দূরে থাক, আমার কোনও সন্দেহ নেই, এটি সবিনয় ধরনের। যেহেতু সামাজিক সামঞ্জস্যে দুটি নীতি—বহমানতা ও সমতা, উভয়কেই তা লক্ষ্যন করে।

নয়

কেউ কেউ মনে করেন, মহাত্মা এখন কেবল 'বর্ণ'কে বিশ্বাস করেন, জাত-ব্যবস্থায় নয়। তাই তিনি সমাজকে অনেকটাই এগিয়ে নিতে পেরেছেন। এটা সত্যি যে এক সময়ে মহাত্মা সম্পূর্ণভাবে অভিজাত সনাতন হিন্দু ছিলেন। তিনি 'বেদ', 'উপনিষদ', 'পুরাণ' এবং সকল রকম হিন্দু ধর্মশাস্ত্র এমন কি, অবতারবাদ ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি জাত প্রথায় বিশ্বাসী ছিলেন। গোড়াসের মতো সমর্থন করেছেন। তিনি অস্ত্রোভোজন, অস্ত্রবিবাহ, জলচলকে নিন্দা করেছেন এবং যুক্তি দেখিয়ে অস্ত্রোভোজন, অস্ত্রবিবাহ, জলচলকে বিরোধিতা করেন। বলেছেন, 'এতে ইচ্ছাশক্তির বৃদ্ধি ও কিছু সামাজিক মূল্যবোধকে রক্ষা করে।' এটা উল্লেখ্য যে, তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ মূর্খতাকে বর্জন করে স্বীকার করেছেন, "জাত ব্যবস্থা আধ্যাত্মিক ও রাষ্ট্রীয় বিকাশের পক্ষে হানিকর।" হয়তো অন্য জাতের সঙ্গে তাঁর পুত্রের বিবাহ এই মত পরিবর্তনের কারণ। কিন্তু মহাত্মা কি বাস্তবে প্রগতি এনেছেন? 'বর্ণ' এর প্রকৃতি কী, যা মহাত্মা মনেন? এটা কি বৈদিক ধারণা, যা সাধারণভাবে বুঝায় এবং যা আর্বসমাজী ও দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিপাদিত করেছেন? 'বর্ণের' বৈদিক সারমর্ম হল, কোনও ব্যক্তি সেই পেশাই অবলম্বন করবে, যা তার স্বাভাবিক যোগ্যতার উপযোগী। 'বর্ণ' সম্বন্ধে মহাত্মার ধারণা হল, ব্যক্তি তার পৈতৃক পেশাকে অবলম্বন করবে, যদি সেটি তার স্বাভাবিক যোগ্যতার উপযোগী না-ও হয়। মহাত্মা 'বর্ণ' ও 'জাতের' মধ্যে কীভাবে ভেদ রেখে টেনেছেন? আমি কোনও পার্থক্য দেখি না। যে পরিভাষা মহাত্মা দিয়েছেন, তাতে 'বর্ণ' হল 'জাতের' অন্য নাম। এর কারণ এই যে, দুয়েরই সারবস্তু এক — অর্থাৎ পৈতৃক পেশা অবলম্বন করা।

প্রগতি তো দূরের কথা মহাত্মা এতে অবনতিই ঘটিয়েছেন। 'বর্ণের' বৈদিক ধারণার ব্যাখ্যা করে উনি যা উৎকৃষ্ট, বাস্তবে তাকে হাস্যকর করে তুলেছেন। যদিও আমি বৈদিক 'বর্ণ'-ব্যবস্থার বিরোধী, যার কারণ আমার ভাষণে আমি বলেছি। তবু আমি স্বীকার করি যে, স্বামী দয়ানন্দ এবং অন্য অনেকেই 'বর্ণের' বৈদিক ধারণাকে ব্যাখ্যা করেছেন, তা যুক্তিপূর্ণ ও আপত্তিজনক নয়। আমি এই তত্ত্ব মানি না যে, জন্ম কারও স্থান সমাজে নির্ধারিত করে দেয়। এ কেবল যোগ্যতাকেই স্বীকার করে। বর্ণের ওপর মহাত্মার দৃষ্টিভঙ্গি বৈদিক ধর্মকে কেবল তুচ্ছ করে না, অঘন্যতম বিষয়ে পরিণত করে। 'জাত' ও 'বর্ণ' দুটি দু'ধরনের ধারণা, বর্ণ যেখানে গুণনির্ভর, জাত সেখানে জন্ম-নির্ভর। বস্তুত উভয়ে পরস্পর বিরোধী। যদি মহাত্মা প্রকৃত-ই বিশ্বাস করেন, যা তিনি অবশ্যই করেন, প্রত্যেকেই তার পৈতৃক পেশা পালন করবে, তা হলে অতি অবশ্যই তিনি জাত-ব্যবস্থার বিশ্বাসী। তাকে বর্ণ-ব্যবস্থা বলে তিনি কেবল পরিভাষা প্রয়োগের দোষে দেখি নন, বিভ্রান্তিকে বরং আরও বেশি বাড়িয়ে তুলেছেন। আমি নিশ্চিত,

এই বিভ্রান্তির মূলে আছে, 'জাত' এবং 'বর্ণ' সম্বন্ধে মহাত্মার স্পষ্ট ও স্বচ্ছ ধারণার অভাব এবং হিন্দু ধর্মের সংরক্ষণের জন্য এর মধ্যে কোনটির প্রয়োজন সে বিষয়ে ধারণা? তিনি অবশ্য বলেছেন এবং আশা করি, মত পরিবর্তন করতে কোনও অতীন্দ্রিয় যুক্তিকে আশ্রয় করে বলবেন না যে, জাত-ব্যবস্থা হিন্দু ধর্মের সার নয়। তিনি কি 'বর্ণ'কে হিন্দু ধর্মের মূল বলে অভিহিত করেছেন? এখনও পর্যন্ত কেউ নিশ্চিত উত্তর দিতে পারেনি।

'ড: আশ্বেনকরের অভিযোগ' বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধটি যে পড়বে, সেই বলবে— না। উক্ত প্রবন্ধে তিনি বলেন যে, 'বর্ণ' মতবাদ হিন্দু ধর্মের আবশ্যিক অংশ। বর্ণকে হিন্দু ধর্মের সার বলার চেয়ে উনি বলেন, "হিন্দু ধর্মের সারকথা নিহিত আছে এই উচ্চারণের মধ্যে যে, সত্যই ভগবান এবং অহিন্সা প্রতিটি মানব-পরিবারের অনুশাসন।" কিন্তু শ্রী সন্তরামের চিঠির উত্তরে লেখা তাঁর রচনাটির পাঠক বলবে, হ্যাঁ। উক্ত রচনার তিনি বলেছেন, 'কোরান'কে অস্বীকার করে কেউ মুসলমান হিসাবে কীভাবে থাকতে পারেন অথবা 'বাইবেল'কে অস্বীকার করে কেউ খ্রীষ্টান থাকেন কী করে? 'শাস্ত্র' এবং 'বর্ণ' যদি এক-ই পর্যাভূত হয় এবং যদি 'বর্ণ' হিন্দুধর্মের পরিভাষায় 'শাস্ত্রের' অঙ্গীভূত হয়, তাহলে 'জাত' অর্থাৎ 'বর্ণ'কে অস্বীকার করে কেউ নিজেকে হিন্দু বলে দাবী করে কী করে? আবার সেই সত্যের অগলাপ। মহাত্মা কেন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন? কাকে তিনি খুশি করতে চান? সন্তরা কি সত্যের অর্থ বুঝতে পারেননি? নাকি রাজনীতিবিদরা সন্তদের পথ অবরুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছেন? মহাত্মা কেন বিধায় ভুগছেন, তার কারণ সম্ভবত দুটি সূত্র থেকে জানা যেতে পারে। প্রথমটি হল মহাত্মার স্বভাব। তিনি প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শিশুর মতোই স্বয়ং-প্রতারিত হতেন। শিশুর মতোই তিনি যা বিশ্বাস করতে চাইতেন, তা বিশ্বাস করতেন। আমাদের এ জন্য প্রতীক্ষা করা উচিত সে পর্যন্ত, যে পর্যন্ত না তিনি যেভাবে 'জাত'-এর প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছেন, সেভাবেই বর্ণের প্রতি বিশ্বাস হারান। দ্বিতীয় সূত্রটি হল, তাঁর মহাত্মা আর রাজনীতিবিদের দ্বৈত ভূমিকা। রাজনীতিবিদ হিসাবে তিনি রাজনীতিতে আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ ঘটাতে চান, এতে তিনি সফল হোন বা নাই হোন, রাজনীতি তাঁকে নিশ্চয়ই ব্যবসাদারি মনোভাবাপন্ন করে তুলেছিল। একজন রাজনীতিবিদের জানা উচিত যে, সমাজ পূর্ণ সত্যকে মেনে নিতে পারে না এবং তাঁরও সব সত্য কথা বলা উচিত না। যদি তা বলেন, তবে সেটা হবে তাঁর রাজনীতির পক্ষে ক্ষতিকারক। মহাত্মা কেন সর্বদা 'জাত' ও 'বর্ণ'কে সমর্থন করে গেছেন, তার কারণ, সমর্থন না করলে রাজনীতিতে নিজস্ব স্থান থেকে চ্যুত হবেন, এই ভয়ে। তাঁর বিধায় যে কারণই থাকুক না কেন, মহাত্মাকে এ কথা বলা উচিত যে, 'বর্ণের' নামে 'জাত' কে প্রচার করে তিনি নিজেকে এবং জনসংস্কারকে প্রতারিত করেছেন।

দশ

মহাত্মা বলেছেন যে, হিন্দু এবং হিন্দুত্ববাদ বিচার করতে আমি যে মাপকাঠির কথা বলেছি, তা মারাত্মক এবং তার নিরিখে বিচার করলে সমস্ত প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসই অসফল হবে।

থাকলেও, এখন পথ প্রদর্শনের কালে বরাং সন্তর্ভাবের পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাচীনত্বের কারণে সেগুলির প্রতি এখনও এক দুর্বোধ্য শঙ্কা আছে, যা সমাজের ভিত্তি সম্পর্কে কোনও রকম হাতাই করার বিরোধী করে লোককে অস্বীকার করে রাখে। হিন্দু জনগণ অবশ্যই তাদের বিশ্বাস গঠনের ক্ষেত্রে অধিষ্ঠাতাভাবে অমনোযোগী। হিন্দু নেতারাও এই ধরনের। এবং আরও ব্যাপক যে, হিন্দু নেতারা তাঁদের বিশ্বাসের প্রতি এক বিচ্ছিন্ন আবেগে ভরে ওঠেন, যখন-ই কেউ এই সব বিশ্বাসের সারিখ বর্জন করতে চায়। মহাত্মাও তার ব্যতিক্রম নন। সেখান থেকেই মহাত্মা চিন্তা-ভাবনার আস্থা রাখেন না। তিনি সাধু সন্তানের অনুসরণ করতে পছন্দ করেন। একজন রক্ষণশীল ব্যক্তি যেন পবিত্র ধারণার প্রতি মনে শঙ্কা পোষণ করে, তেমনি তিনি ভয় পান যে, একবার তিনি ভাবতে শুরু করলে বহু আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠান, যেগুলিকে তিনি জঁকড়ে ধরে আছেন, সে-সব ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁর প্রতি সকলের সহানুভূতি দেখানো উচিত। কারণ স্বাধীন চিন্তাশ্রদ্ধত সব কাজ স্পষ্টত, প্রচলিত জগতের কিছু আংশকে বিশেষ ফেলে। কিন্তু এও সমান সত্য যে, সাধু সন্তানের ওপর নির্ভরশীলতা আমাদের সত্যাত্মবোধের পথে চলিত করে না। সব সত্ত্বও সাধু-সন্তরা মানুষ মাত্র। লর্ড ব্যাক্সফোর্ড বলেছেন, "মানুষের মন একটি সত্যাত্মবোধ যন্ত্র, যা তত্ত্বাত্ত্বের নাকের ডগার চেয়ে বেশি কিছু নয়।" এ পর্যন্ত তিনি যা চিন্তা করেন, তাতে আমার মনে হয়, তিনি প্রকৃতপক্ষে হিন্দুদের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থাকে সমর্থনের কারণ খুঁজতে তাঁর বুদ্ধিকে পণ্য করছেন। তিনি এর সবচেয়ে প্রভাবশালী সমর্থক এবং এই জন্য হিন্দুদের সবলীকৃত শত্রু।

মহাত্মার মতো নর, এমন অনেক হিন্দু নেতা আছেন, যারা কেবলমাত্র বিশ্বাস ও অনুসরণ মেনে চলেন না। তাঁরা ভাবতে সাহস করেন এবং নিজ ভাবনার ফল অনুযায়ী কাজ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, যখন জনগণকে সঠিক পথ দেখানোর সময় আসে, তখন তাঁরা খুব অসং, অথবা একদম উদাসীন। প্রায় প্রত্যেক ব্রাহ্মণ-ই জাত প্রথার নির্দেশ ভাঙে। জুতো বিক্রি-করা ব্রাহ্মণের সংখ্যা যাক কত, নিযুক্ত ব্রাহ্মণের চেয়ে অনেক বেশি। ব্যবসার জন্য ব্রাহ্মণরা তাদের পেশা যাক কর্মক্ষেত্রে গুরু পরিত্যাগ-ই করেনি, অধিকন্তু তারা এমন সব ব্যবসায় নিযুক্ত হয়েছেন, যেগুলি শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। তা হলেও কত ব্রাহ্মণ, যারা প্রতিদিন জাত ভাঙে, জাতপ্রথা এবং শাস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচার চালায়। কারণ তার বাস্তব প্রবৃত্তি এবং নৈতিক বিবেক সেগুলির দৃঢ় ধারণাকে সমর্থন করতে পারে না। শত-শত ব্রাহ্মণ আছে, যারা প্রতিদিন জাত ভাঙছে এবং শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করছে। কিন্তু যারা সবচেয়ে গোঁড়া, তারা জাতপ্রথার তত্ত্ব এবং শাস্ত্রের পবিত্রতা উন্নত তুলে ধরতে সচেষ্ট। কেন এই কপটতা? কারণ তাঁরা বুঝে, যদি সাধারণ মানুষ জাত-ব্যবস্থার দৃষ্টিতে মুক্তি পায়, তা হলে শ্রেণী হিসাবে ব্রাহ্মণদের মর্যাদা ও ক্ষমতার পক্ষে তারা আতঙ্ক হয়ে পড়বে। এই খুঁজিবারি শ্রেণী তাদের চিন্তার ফসল সাধারণ মানুষকে দিতে অস্বীকার করে এবং তাদের এই অসন্তোষ এক ঘৃণ্য প্রবণতা।

বিচারের মাপকাঠি সত্যিই হয়েছে উঁচু। কিন্তু সে মাপকাঠি উঁচু কি নিচু, তা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল আমার এই মূল্যমানের সাহায্যেই কোনও জাতি বা ধর্মকে বিচার করতে হবে। জনগণের হিতার্থে ধর্মকে যদি প্রয়োজনীয় বলে ধরা হয়, তা হলে অন্য মূল্যমানের কোনও অর্থ থাকে না। হিন্দু ও হিন্দুধর্ম বিচারের জন্য আমি যে মাপকাঠি ব্যবহার করেছি, তাকেই আমি এখন সবচেয়ে উপযুক্ত মাপকাঠি বলে মনে করি। এও জানি যে, এর চেয়ে ভাল মাপকাঠি আর কিছু নেই। উপসংহারে বলা যায়, যদি আমার মূল্যমান দিয়ে বিচার করা হয়, তবে সব ক'টি প্রচলিত ধর্ম অসফল বলে প্রতিপন্ন হবে এবং তা-ই হয়তো সত্যি। কিন্তু এই সত্যি হিন্দু এবং হিন্দুধর্মের প্রকৃতা হিসাবে মহাত্মাকে, একজন পাগলের অস্তিত্ব যেমন অপর একজন পাগলকে কিংবা একজন অপরাধী যেমন অপর একজন অপরাধীকে তুলি দেয়, তার চেয়ে এতটুকু বেশি তুলি দেবে না। আমি মহাত্মাকে নিশ্চিত করতে চাই যে, আমার মনে জেগে ওঠা ঘৃণা বা বিরক্তি, যে জন্য আমাকে দেবী করা হয়েছে, তা শুধুমাত্র হিন্দু ও হিন্দুধর্মের অসামঞ্জস্য। আমি অনুভব করি, এই বিশ্ব খুবই অসম্পূর্ণ বিশ্ব। যে কেউ এখানে বেঁচে থাকতে চাক না, তাকে অবশ্যই এই অসম্পূর্ণতাকে সহ্য করতে হবে। কিন্তু যখন আমি শ্রমদানের জন্য নির্দিষ্ট সমাজের অসম্পূর্ণতা ও সৌভাগ্যটিকে মনিয়ে নিতে নিজেকে প্রস্তুত করি, তখন বুঝি, যে সমাজ ভুল আদর্শের লালন করে, সে সমাজে আমার বাস করতে চাওয়া উচিত নয়। কিংবা যে সমাজ সঠিক আদর্শের লালন করে, কিন্তু সামাজিক জীবনে সেই সব আদর্শকে মিশতে দেয় না, সেখানে বাঁচতে চাওয়া উচিত নয়। আমি যদি হিন্দু ও হিন্দুধর্মের প্রতি বীতরাগ হই, তা হলে তার কারণ হল, আমার ধারণায়, এরা ভুল আদর্শ বহন করে এবং ভুল সামাজিক জীবন যাপন করে। হিন্দু ও হিন্দুধর্মের সঙ্গে আমার বিবাদ তাদের সমাজনীতির অসম্পূর্ণতা নিয়ে নয়। আরও মৌলিক কারণ আছে। তা হল আদর্শ নিয়ে।

এপারো

আমার মনে হয় হিন্দু সমাজ নীতিগত পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, যা এড়িয়ে চলা বিপজ্জনক। এবং প্রশ্ন হল, কে এই নীতিগত পুনর্গঠন এবং নিয়ন্ত্রণ স্থির করতে পারে? স্পষ্টত কেবল তাঁরাই, যারা বৌদ্ধিক পুনর্জন্ম অনুধাবন করেছেন এবং যারা চিন্তা-সংক্রান্ত বুদ্ধির থেকে মুক্তির সাহস রাখার ক্ষেত্রে ব্যস্তি সং। এই মূল্যমানের বিচারে আমার মতে, হিন্দু নেতারা এ কাজের জন্য একেবারে অযোগ্য। বলা অসম্ভব যে, তাঁরা বৌদ্ধিক পুনর্জন্মের প্রাথমিকটুকুই অনুভব করেছেন। যদি তারা বৌদ্ধিক পুনর্জন্ম অনুভব করে থাকেন, তা হলে অনিশ্চিত জনগণের মতো সহজভাবে তাঁরা নিজেদের হতাশা করতেন না অথবা অন্যের আদর্শ অজ্ঞতার সুযোগে গ্রহণ করতেন না, যেমন তাঁরা করেছেন। হিন্দু সমাজের ঋণ-বিষও অবশ্য সত্ত্বেও এই সব নেতারা নির্বিজ্ঞভাবে অতীতের আদর্শের কথা বলবেন, যেগুলি সবদিক থেকে বর্তমানের সঙ্গে সম্পর্কহীন। সেগুলি সৃষ্টির সময়ে উপযুক্ত

মাথু আর্নেস্টের ভাষায়, হিন্দুরা “দুটি জগতে বিচরণশীল। একটি মৃত, অপরটি জন্মাবার শক্তিহীন।” তারা কী করবে? তারা বীর কাছে নেতৃত্বের জন্য আবেদন জানায়, সেই মহাত্মা চিন্তার বিশ্বাস করে না। সুতরাং এমন কোনও নির্দেশ তিনি দিতে পারেন না, যা বলা যায়, অভিজ্ঞতার দ্বারা পরীক্ষিত। যে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর কাছে সাধারণ মানুষ দিশা খোঁজে, তারা হয় প্রচণ্ড অসৎ অথবা সঠিক পথে তাদের শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে অতি-উদাসীন। আমরা সত্যিই এক দারুণ ট্রাজিডি-র স্রষ্টা। এই ট্রাজিডির সামনে সবাই যা করতে পারে, তা কেবল বিলাপ করা আর বলা—“হে হিন্দুগণ! তোমাদের নেতারা এ-রকমই।”



বনাম



অস্পৃশ্যতার সমস্যা ভগত সিং

ভাষান্তর:- সুশান্ত সরকার
কীর্তি পত্রিকা-জুন ১৯২৮ এ প্রকাশিত

আমাদের দেশের মতো বারাপ অবস্থা অন্য কোন দেশে নেই। এখানে অদ্বুত অদ্বুত প্রশ্ন ওঠে আসে। এখন অস্পৃশ্যতা বিষয়টি আলোচনায় আসছে। সমস্যা হোল এই যে ৩০ কোটি জনসংখ্যার দেশে ৬ কোটি মানুষকে অস্পৃশ্য বলা হচ্ছে যাদের স্পর্শে বাকিরা ধর্মভ্রষ্ট হয়ে যাবে। গুন্ডের মন্দির প্রবেশে দেবতা অসন্তুষ্ট হবে। ওরা কুয়োর জল তুললে ক্যো অপবিত্র হয়ে যাবে। এমন কথাও শুনেতে হচ্ছে, যা লজ্জাজনক। আমাদের দেশ অধ্যাত্মবাসে ভরপুর তবুও আমরা মানুষে মানুষে বিভেদ কটাবার জন্য ইউরোপের দেশগুলির মতো ইনকিলাবের আওয়াজ তুলছি। ওরা ফ্রান্স ও আমেরিকায় সমানারিকারের কথা তুলছে। আজ রুশ দেশে বিপ্লবের আগে ও পরে এই ধরনের ভেদাভেদ দূর করার কাজে অনেকটাই সফল। আমরা আত্ম-পরমাশ্রা নিয়ে জোড় বিতর্ক চালাই কিন্তু অস্পৃশ্যতার সমস্যা নিয়ে করিনা কেন? ওদের কি বেদ শাস্ত্র পড়ার অধিকার নেই? আমরা অভিযোগ করি যে বিদেশী বুটিশরা আমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করছেন। আমরা ইংরেজ শাসকদের মতো অধিকার চাই অথচ পাইনা। আমাদের কি সেই অভিযোগ করার অধিকার আছে? নূর মহম্মদ নামে এক বোম্বাই কাউন্সিল সদস্য যিনি সিদ্ধ এর বাসিন্দা ১৯২৬ সালে বলেছিলেন: “হিন্দু সমাজ যদি তাদের নিজেদের স্বজাতিদের বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার না দেয়, একই স্থানে জলপানের অধিকার না দেয় তবে আমরা কিভাবে বিদেশ থেকে আগত বিদেশীদের (বুটিশ) কাছে অধিকার ক্ষমতার দাবী তুলব? আমরাই যখন মানবাধিকার মানছি না তখন আমরা অধিকতর রাজনৈতিক অধিকারের কথা তুলব কোন মুখে?” নূর মহম্মদ এইসব কথা বলার পর হৈ হট্টগোলের মাঝে বলা হয় যে উনি অস্পৃশ্যদের মুসলমান করবার ষড়যন্ত্র করছেন।

কথা এই হোল যে যদি স্বজাতিদের কাছ থেকে অমানবিক ব্যবহার পেলে যে কোন ব্যক্তি ভিন্ন ধর্মের প্রতি আবৃষ্ট হবে যেখানে অস্পৃশ্যতা নেই। স্পর্শ কিন্তু বিতর্ক জন্ম দেয়। প্রভাব হিন্দুদের মাথো ও পড়ে, সনাতনপন্থী হিন্দুরা এ বিষয়ে ভাবতে শুরু করেছে। “যুগান্তকারী” বলে পরিচিতরা এ বিষয়ে কথা বলছেন। পাটনায় হিন্দু মহাসভার সম্মেলনে অস্পৃশ্যদের সমর্থক বলে প্রচারিত লালো লাজপত রায়ের সভাপতিত্ব এই বিষয় নিয়ে চর্চা হয়। কড়া বিতর্ক হয়। প্রশ্ন উঠল যে অস্পৃশ্যদের কি যজ্ঞোপবিত ধারণের অধিকার আছে? প্রশ্ন উঠল যে কি অস্পৃশ্যদের বেদ শাস্ত্র পড়ার অধিকার আছে? লালাজি সম্মেলনে উপস্থিতদের জানানো

এসব হিন্দুধর্মের লজ্জার দিক। পালিত কুকুর আমাদের কোলে পিঠে বসতে পারে এমনকি আমাদের রান্নাঘরেও ঢুকতে পারে অথচ একজন মানুষ আমাদের স্পর্শ করলে আমি ধর্মভ্রষ্ট হবো। মালব্যক্তি, যিনি অস্পৃশ্যদের সাধী বলে দাবী করেন, এক মেঘরের হাত ধরে কথাও বলেন এবং তারপরই স্নান করে শুদ্ধ হন। এসব কি চালাকি নয়? সকলের ভগবানের জন্য মন্দির বানানো হোল কিন্তু সেখানে অস্পৃশ্যরা প্রবেশ করলেই মন্দির অপবিত্র হয়ে যাবে? ভগবান রুষ্ট হবেন? ঘরের মধ্যে যখন এই অবস্থা তখন বাইরের অবস্থা বোকা যায়। আমাদের দেশে কৃতজ্ঞতা কমছে আর কৃতদ্ব্যতা বাড়ছে। যারা তথাকথিত নীচু ধরনের কাজ করে সকলের সুবিধা করে দিচ্ছে তাদের অবজ্ঞা অবহেলা করা হচ্ছে।

আমরা পণ্ডাদের পূজা করি কিন্তু মানুষের পাশে বসতে চাই না। আজকাল এ বিষয়ে জোর আলোচনা নানা দিকে চলছে। দেশের মুন্ডির কথাও যেমন বলা হচ্ছে তেমনি এইসব বিষয়েও আলোচনা চলছে। অধিকারের অতিরেক্ষা আরও বড় করার জন্য সম্প্রদায়ের অধিকার নিয়েও চর্চা চলছে।

অস্পৃশ্যরা দেখছে যে তাদের সমস্যা নিয়ে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান নেতারা টানাটানা করছে তার পেছনে কোন ইংরেজ সরকারের কুটকৌশল নেই তো? “আদি ধর্ম সংরক্ষণ” সংগঠনটি এই ধরনের প্রচার করছে। একটি প্রশ্ন উঠছে যে এই সমস্যার সমাধান কোন পথে? এটি একটি কঠিন প্রশ্ন। উত্তর আরও কঠিন। এটা আগে নির্ণয় করতে হবে যে সব মানুষের সমান অধিকার মানলে জন্মসূত্র বা পেশাসূত্রের মাধ্যমে বিভাজন কি ন্যায়সঙ্গত। এর সাথে যদি পূর্বজন্মের পাপ পুণ্যের কথা জুড়ে বসে তো কথাই নেই। এক্ষেত্রে বিমোহ না করে চুপচাপ বসে থাকো পরজন্মে সুখী হবে। কিন্তু তাতো অন্যায় কথা হবে। এ ব্যবস্থা মানবজাতির মধ্যে অমানবতা ঢুকিয়ে দিয়েছে। আত্মবিশ্বাস এবং স্বাবলম্বনকে মাটিতে মিলিয়ে দিচ্ছে। বহুদিন যাবৎ এ সমস্যা চলছে। এখন এটা বন্ধ হওয়া খুবই প্রয়োজন।

এর সাথে আরেক সমস্যা যোগ হচ্ছে। কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ পেশাকে নীচু চোখে দেখানো হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশে জেলা(তীতি), কাহার সম্প্রদায়কে অস্পৃশ্য ঘোষণা করা হচ্ছে। এতে সামাজিক উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। নওজওয়ান ভারতসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যারা অন্যদের অস্পৃশ্য বলে ঘোষণা করেছে এবং সেইরূপ ব্যবহার করেছে তাদের প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। ওদের মানবমর্যাদা দিতে হবে। তথাকথিত গুঁড়িকরণ ছাড়াই ওদের হাত থেকে জলপান করতে হবে। সমস্ত ধরনের ভেদাভেদ কাটুজি বন্ধ করতে হবে।

এখন গ্রামে মজদুরদের মধ্যে প্রচারে সময় বলা হবে জমির মালিকরা সঠিক কাজ না করলে সাফাইকর্মী, চামাররা জমির মালিকদের কাজ বন্ধ করে দেবে। এতেই মালিকরা ভয় পেয়ে যাবে। মালিকরা প্রায়ই বলে যে এটা পরিষ্কার হচ্ছে না ওটা থেকে দুর্গন্ধ বেরচ্ছে। সাফ উত্তর আমরা গরীব। তোমরা আমায় দেখলে আমরা তোমাকে দেখবো। পৃথিবীতে কোন কাজই খারাপ নয়। নীচু নয়। মা যখন শিশুসন্তানের মল পরিষ্কার করেন তখন তিনি কি নোংরা কাজ

করেন? এটা ততদিন সম্ভব হবে না যতদিন অস্পৃশ্যরা নিজেরাই সংগঠিত হবেন। অস্পৃশ্য এবং মুসলমানদের সমান অধিকারের দাবীতে সংঘবদ্ধ হোতে হবে।

কর্তৃপক্ষের দেখা উচিত যে জুল কলেজে, কুয়ো, রাস্তায়, বাজার-হাটে সকলের সমান অধিকার থাকা। অনেকেই ভাবছেন যেখানে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলী বাল বিবাহ বন্ধে বিধাগ্রহণ তখন অস্পৃশ্য সমস্যা মিটিবে কি করে? এজন্য আমাদের মানতে হবে যে অস্পৃশ্যদের নিজস্ব জাতিনিধি প্রয়োজন। আমি পরিষ্কার বলি অস্পৃশ্যদের মধ্যে থেকেই আসল জনসেবক উঠে আসুক। ল্যান্ড অ্যালিয়োনেশন অহিন অনুসারে অস্পৃশ্যদের জমি কেনার অধিকার নেই। অস্পৃশ্যদের এর বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে হবে। এ প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। স্বাধীনতার জন্য স্বাধীনতাকামীদেরই আঘাত হানতে হবে। কিছু মানুষ নিজের অধিকারের কথা বলে, আমাদের অধিকারের কথা বলতে চায় না। উপমা আছে যে লাখি খাওয়া ভুত কথায় দূর হয় না। অর্থাৎ সংগঠনবদ্ধ হয়ে সমাজকে জোড় ধাক্কা দিতে হবে। তখন দেখা যাবে যে কেউই অস্পৃশ্যদের অধিকার কেড়ে নিতে পারবে না। অস্পৃশ্যদের অন্যের উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়। আমাদের বদবুদ্ধির শিকার হওয়া উচিত নয়। খেয়াল রাখতে হবে যে তাঁরা যেন দাসতন্ত্রের কীসে পা না দেয়। দাসতন্ত্র অস্পৃশ্যদের কোনও কাজে লাগবেনা উপরন্তু অস্পৃশ্যদের দখল থেকে পুতুল নেতা বানাবার চেষ্টা করবে। পুঁজিবাদ বা দাসতন্ত্র অস্পৃশ্যদের গোলাম এবং গরীব বানিয়ে রাখতে চায়। অস্পৃশ্যরাই আসল সর্বহারা। সংগঠনবদ্ধ হোলে কেউই ভয় করতে পারবেনা। এই দাসতন্ত্র শেকল ছিঁড়ে যাবে। বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তৈরী করতে হবে। সামাজিক, রাজনৈতিক বিপ্লবের জন্য তৈরী হতে হবে। অস্পৃশ্যরাই দেশের আসল শক্তি।



প্রস্তাব

অশোক মিত্র

১৯৫৩ সালে নেহরু কৈলাসনাথ কাটজকে একটি চিঠিতে লেখেন:

ভারতের অদৃষ্ট অনেকাংশে হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গি ও চারিত্রিক গড়নের খুঁটে বাঁধা। যদি বর্তমান হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গী আমূল না বদলায়, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভারতের সর্বনাশ হবে। আমার মতে মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি হয়তো, হয়তো কেন অনেকাংশে, আরো হানিকর। কিন্তু ভারতের ভবিষ্যতের পক্ষে মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গির মত অত গুরুত্বপূর্ণ হবে না।

ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে, সে পৃথিবীর বা ভারতের বলুন, নেহরুর মত সামগ্রিক ধারণা ও সমন্বয়সাধক মূল্যজ্ঞান পৃথিবীতে খুব কম লোকেরই ছিল বা আছে। তার বলে তিনি পণ্ডিতদের মধ্যে পূজ্য আসন অধিকার করেন। তা সত্ত্বেও, ১৯৪০ সালে চাকরীতে ঢুক খুজবাসের অনেক জেলায় কাজ করে এবং পরে ভারতবর্ষের অধিকাংশ জেলায় ঘুরে আমার মনে তাঁর সম্বন্ধে আশ্চর্য্যে আশ্চর্য্য একটি ক্ষোভ ক্রমশ জন্ম হল। এটি প্রকাশ না করলে আমার মন হালকা হচ্ছে না, এবং যে-কোন স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন পণ্ডিত যদি আমার ক্ষোভ অমূলক বলে বিস্তরভাবে লেখেন, তবে আমি নিশ্চয় স্বস্তি পাব। কী কারণে বর্ণাশ্রম ও ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের ভারে ভারত ক্রমশ ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তার প্রতিবাদে বৌদ্ধধর্ম সামাজিক সাম্য বা সমতার প্রবর্তন করে দাসবর্ণের জাতপাত, উপজাতিদের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মসম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে ভারতে আবার কয়েক শ'বছর সর্ববিষয়ে এক স্বর্ণযুগ আনে। কীভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানে আবার ভেদাভেদপূর্ণ সমাজ কায়েম হয় ও পরে জীর্ণ হয়। কীভাবে ভেদাভেদ ও সামাজিক বিরোধ ও অসাম্যের সুযোগ নিয়ে মুসলমান আক্রমণের বিদেশী টেউয়ের পর টেউ এসে অক্রেমশে এদেশ অধিকার করে। কীভাবে হিন্দু-উচ্চবর্ণের সৃষ্ট সামাজিক অসাম্য ও অত্যাচার, তার সঙ্গে লৌকিক ও জীবিকার দাসত্ব থেকে মুক্তির আশায় ভারতের সর্বত্র দাসধর্মের জনগণ, এবং তাদের সঙ্গে উপজাতিদেরও অনেকাংশে ইসলাম ধর্ম—অতীত যুগে বৌদ্ধধর্ম পরিগ্রহণের মত—আগ্রহে বরণ করে; কী কারণে ধর্মাস্তরিত জনগণ, ইসলামীর সামাজিক ও ধর্মোপাসনায় সাম্যের স্বাদ পেয়ে কীভাবে হিন্দু বর্ণাশ্রমসমাজের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়। কীভাবে হিন্দু উচ্চবর্ণগুলি পূর্বকালের দাশ ও পরে ধর্মাস্তরিত হয়ে রাজার জাতের সমিল হওয়া নিম্নবর্ণদের প্রতি নিষ্কল আক্রোশে এবং জাতক্রোধে বিরুদ্ধভাবে পুবে রাখে, বলে তাদের সমগোত্রের মানুষ বলে গ্রহণ করতে অপারগ হয়। এ সব বিষয়ে নেহরুর মত জ্ঞান ও বোধ নিশ্চয় খুব কম ব্যক্তিরই ছিল বা আছে। উপরন্তু কীভাবে যুগে যুগে ভারতীয়দের বিঘ্নীকরণশ্রোত, এবং একই সঙ্গে হিন্দু সমাজের দুটিকরণ ও বিস্তারকল্পে নানা স্থানে, নানা সমাজে, সর্বধর্ম সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্য নিয়ে নতুন নতুন সমাজ ও ধর্মসংস্কারক ভূমিষ্ঠ হয়ে দেশে নবসমষ্টিত ধর্ম সামাজিক সাম্যের প্রবর্তন করার প্রয়াস পান। কীভাবে হিন্দুবর্ণাশ্রমধর্মী উচ্চবর্ণের শ্রেণীরা,

তাদের সামাজিক, ধর্মীয়, আর্থিক এবং উৎপাদিকা শক্তির অধিকারবলে সমন্বয়ধর্ম আন্দোলনগুলিকে একে একে নির্বাপিত করেন (একমাত্র গুরু মানক প্রবর্তিত শিখধর্মই ব্যতিক্রম)। কীভাবে এমন-কি বাংলার চৈতন্যদেব প্রণোদিত সমন্বয়ধর্মী বৈষ্ণবধর্মও লোপ পায়। এই শতকের স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দুবর্ণাশ্রম কীভাবে ভারতের ঐক্যকে ব্যক্তি করে। কীভাবে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতিযুগের বর্ণাশ্রম শনি-প্রবেশের অমোঘ রক্ত হিসাবে কাজ করেছে। নিম্নবর্ণ সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা ত্রিশ দশকেও এত বেশী ছিল, গান্ধীজি যখন হরিজন আন্দোলন শুরু করেন, এবং 'হরিজন' পত্রিকাকে আপন মুখপত্র প্রকাশ করেন, তখন তাঁর সহকর্মীরা আপত্তি করেন এই বলে যে একাজ করে গান্ধীজি ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের গুরুত্ব লঘু করে দিচ্ছেন। তবে বর্ণাশ্রমে বিশ্বাসী গান্ধীজি ন্যায়ের বলে দয়া ও সমবেদনা বা সহমর্মিতার উপর বেশী নির্ভর করেছিলেন, তা না হলে হয়তো তিনি আন্দোলনকে আরো কাছে টানতে পারতেন।

কোন সমস্যা বুদ্ধি দিয়ে বোঝা এক বস্তু, আর মর্মান্তিক অভিজ্ঞতায় বোঝা ভিন্ন বস্তু। যেহেতু এটি আত্মচরিত, নিজের দু'একটি অভিজ্ঞতা না বলে পারছি না। আধুনিক ইওরোপীয় সাম্যবাদ সম্বন্ধে আমার শিক্ষাগুরু সুশোভনচন্দ্র সরকার ও রাখারমণ মিত্র আমাকে অবহিত করার জট করেদেনি। সে সাম্যশিক্ষা মুখ্যত ইওরোপীয় সমাজে অর্থোপাদান-রীতিজনিত, রাজনৈতিক, শ্রেণীগত ক্রমবর্ধমান অসাম্যের নিরাকরণের শিক্ষা। নৃতত্ত্বে ও জনসংখ্যাবিজ্ঞানে আমার অন্যতম নুই গুরু, বতীন্দ্রমোহন দত্ত (সাহিত্যিক ছদ্মনাম যমদত্ত) ও শৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ১৯৫১-র সেপাসের সময়ে বিস্তারিত বারো শতক থেকে কত হিন্দু ইসলাম ও খ্রিস্টধর্ম ধর্মাস্তরিত হয়েছে তার একটি সংখ্যাভিত্তিক আনুপাতিক হিসাব তৈরি করেন। গোড়া থেকে ১৬ এবং ১৭ শতক পর্যন্ত ভারতের বাইরে থেকে কত মুসলমান ও খ্রিস্টিয়ান ভারতে আসেন, তার মোটামুটি হিসাব প্রথম করেন, ঐতিহাসিক বিবরণ আহরণ করে। যদি ধর্মাস্তরকরণ না হত তাহলে স্বাভাবিক প্রজননহারে তাঁদের বর্তমান জনসংখ্যা কত হত তা ধার্য করেন। এখন মোট কত মুসলমান ও খ্রিস্টিয়ান আছে তার থেকে স্বাভাবিক জনিত মুসলমান ও খ্রিস্টিয়ান জনসংখ্যা বাদ দিয়ে তাঁরা এই কয়েকশত বছর ধরে কত ধর্মাস্তরিত লোক এই দুটি ধর্মে এসেছে তার হিসাব করেন। যমদত্ত ও সেনগুপ্ত মোটামুটি এই হিসাবে উপনীত হন যে ১৯৫১ সালে মুসলমান ধর্মাস্তরকরণের অনুপাত অনুসারে ভারতকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়। যথা তামিলনাড়ু, মহারাত্রি, উড়িষ্যা এবং ভারতের সারা পূর্বাঞ্চলে এবং বাংলাদেশে (তখন পূর্ব পাকিস্তান) যত মুসলমান ছিলেন তাঁদের শতকরা ৯৫ জন এই শতকের আগের পুরুষে হিন্দু ছিলেন। অর্থাৎ আদিতে তাঁরা হিন্দু ছিলেন, পরে তাঁদের ইসলামে দীক্ষিত করা হয়। কেবলে, উত্তরপ্রদেশে, বিহারের এখ-তৃতীয়াংশে, পাঞ্জাবের এবং গুজরাটের কিছু অংশে, এবং মধ্যপ্রদেশের উত্তর ও পশ্চিমাংশে ধর্মাস্তরিত মুসলমানের হারাহার কিছু কম, তাঁদের পূর্বপুরুষদের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ হিন্দু ছিলেন। যেহেতু ধর্মাস্তরিত মুসলমানরা এখনও অধিকাংশই কৃষক বা কারিকর শ্রেণীভুক্ত সেহেতু তাঁদের পূর্বপুরুষ হিন্দুরাও বর্ণাশ্রমের

নিম্নস্বারিতে ছিলেন। এই সম্পদস্বজনবরী দাসজাতিদের নিজাদের কবল থেকে হারিয়ে হিন্দু উচ্চবর্ণের বিদ্রোহ নিষেধ আরো বেড়ে গেল। সারাজিয়ারতের সমস্ত জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ এখনও তপশীলী, অন্যান্য হিন্দুবর্ণাশ্রমযুক্ত নিম্নজাতি, উপজাতি ও মুসলমান। তার উপর প্রায় ৩৫ ভাগ যোগ করলে হবে সেইসব জাতির জনসংখ্যা যারা শিপা, পেশা, অর্থ, সম্পদ ও সম্মানবলে রাজনীতি বহিন্দু-ভারত আন্দোলনের পুরোধ। এমন-কি বেসব রাজনৈতিক দল ধর্ম বা কণ্ঠস্ব-নিরপেক্ষতার দাবী করেন, তাঁরাও কার্যত তাঁদের উচ্চবর্ণের উপর মুখ্য নির্ভরতার প্রমাণ দেন। বেল ১৯৮২ সালের পশ্চিমবঙ্গ মহিলাসভায় মোট ৪২ জন মহিলার মধ্যে ১৭ জন ছিলেন উজ্জ্বল পদবীধন ব্রাহ্মণ, ১২ জন ছিলেন সবিন্দিত পদবীধন উচ্চ কায়স্থ, ১ জন পদবীধন বৈদ্য। বাকি দশজনের মধ্যে পদবী দেখে মনে হয় অন্তত তিনজন মধ্যবিত্তের জাতিভুক্ত। ১৯৫১ সালে সাক্ষরতার সারা-ভারতে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল দ্বিতীয়; ১৯৮১ত সেই স্থান দাঁড়িয়েছে ১৮তম। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ তপশীলী ও জনজাতিদের সাক্ষরতার গার সারা রাজ্যের গড় সাক্ষরতার হারের সামান্য ভগ্নাংশমাত্র। তপশীলী মেয়েদের সাক্ষরতার আনুপাতিক হার অ-তপশীলী উচ্চবর্ণের মেয়েদের তুলনায় আরো কম, অর্থাৎ প্রায় দশমাংশ। তপশীলী জাতি ও জনজাতিদের মধ্যে শিশুশ্রমতার হার রাজ্যের গড় হারের তুলনায় প্রায় আড়াই গুণ। উচ্চবর্ণ হিন্দুদের এই হারগুলির তুলনায় তপশীলীদের হারগুলি আরো নগণ্যের কোঠায় পড়ে। মুখে আমরা বতই অস্বীকার করি না কেন, এই রাজ্যের বর্ণাশ্রম কার্যত এখনও কত প্রবল এইসব হারে বেশ বোকা যায়।

আমাদের আর্থকৌল্যবৈষয়িক নীতি যে কত হাস্যকর সে বিষয়ে সুনীতিভ্রমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি কথা মনে পড়ে। একদিন কথাগুলো তাঁকে আমি বলি অধ্যাপক মহোদয় ও রক্তকর বসু আমার মাথা মেপে বলেছিলেন মসৌলীয়া। ফলে বাস্তব জীবনে নেপাল থেকে হাওয়াই পর্যন্ত যে দেশেই গেছি, সে-দেশের লোক মনে করেছে আমি সে দেশীয়। সুনীতিবাসু হেসে বলেন, 'অশোক, আমার কুলপঞ্জীত বলে আমি খাঁটি কলৌজীব্রাহ্মণবংশোদ্ভূত। কিন্তু ১৯৩৬ সালে শ্রমশাস্ত্রবাসু আমার মাথা মেপে বলেন, আমার কেফালিক ইন্ডেক্স খাঁটি সীওতালি। অতএব আমি আমার কেননা-কোন পিঠেই বা পিতামহীর ডনজুয়ানি বা জোজবেল প্রবৃত্তির ফল!'

১৯৫০ সালে আমি কলকাতায় সোস দপ্তরে বহু কসী নিয়োগ করার দুযোগ পাই। পূর্বপাকিস্তানের নানা স্থানে আমার সাঁ একদা কাজ করেছিলেন, এমন অনেক উচ্চবর্ণ হিন্দু চাকুরিপ্রার্থী হয়ে আমার কাছে আসেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আমার বিশেষ আদ্যার পাত্র, বিক্রমপুরের এক বিখ্যাত স্কুলে প্রাক্তন সহকারী প্রধান শিক্ষক। জাতে ব্রাহ্মণ। তাঁর প্রসিদ্ধির হয়তো এও একটি কারণ শি। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম—তিনি বিক্রমপুর ছাড়লেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন, যেদিন পর্যন্ত কেন রকম ব্যক্তিগত বা পরিবারগত

শঙ্ক্যাবোধের কারণ তাঁর কিছু ঘটনি। বরঞ্চ, স্কুলে গ্রামে, এমন-কি মহকুমার অনেকেই ঠাক থেকে খাবার জন্য সাধাসাধি করেছিলেন। তা সত্ত্বেও একদিন সকালে হঠাৎ তিনি দেশত্যাগের যে অমোঘ সিদ্ধান্ত নিলেন তার কারণটি বললেন। সেদিন সকালে তিনি উচ্চ দাওয়ার উপরে চেয়ারে বসে আছেন, এমন সময়ে গ্রামের গণ্যমান্য কয়েকজন মুসলমান ওয়লোক এলেন। সকলেই সমাজে মোটিমুটি তাঁর সমতুল্য। এসে তাঁরা সোজা দাওয়ার উপর উঠে দাওয়ার পাতা বেঞ্চির উপর বসলেন। মাষ্টারমশায় বললেন, এরকমটি তাঁরা আগে কখনও করেননি। সর্বদা উঠানে বিছানো মাদুরের উপর বসতেন। সেইদিনই তিনি ঠিক করলেন, আর নয়। এই বিবরণ শুনে মুহূর্তে আমার মনে এমন অনেকগুলি প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট হয়ে গেল, যা নিয়ে আমি পূর্ববঙ্গে কাজ করার সময়ে প্রায়ই অত্যন্ত চিন্তিত হতুম, কুল পেতুম না। 'হে মোর দুর্ভাগ্য দেশ। যাদের করেছে অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।'

আবেদনকর

আবেদনকরের লেখা আমি ভাল করে জানি না। সুতরাং বলতে পারব না তিনি নিম্নবর্ণ হিন্দুসমাজে নিজাদের মধ্যে যে আর্থিক অসাব্য আছে তার বিরুদ্ধে কতখানি অসহিষ্ণুতা বা আপত্তি প্রকাশ করেন। আমি সে-সব রচনাই পড়েছি যেখানে তিনি নিম্নবর্ণ ও উচ্চবর্ণ হিন্দুদের মধ্যে সমতার, বিশেষ করে সামাজিক সমতার স্বীকৃতি চেয়েছিলেন। গান্ধীজির বর্ণাশ্রম সমর্থনে আমি কোনদিনই স্বত্তিবোধ করিনি। বর্ণাশ্রম টোহপির মাধ্যমে সমাজসংস্কার ও হরিজনদের পক্ষবলধন, তাঁর বাণীর আধারকে 'হরিজন' নাম দেয়া সত্ত্বেও, মনে হত কোথায় যেন সমতার বদলে দয়ার রেশ আছে; তাঁর অজীজা আর আবেদনকরের সামাজিক সমতার স্বীকৃতি বা সম্মানের দাবী এক নয়। প্রথম গোলাটেবিল বৈঠক থেকেই বেঙ্কা গেল গান্ধীজি আবেদনকরের পাল থেকে হাওয়া টেনে নিতে পারেননি। তাঁকে গান্ধীজি কেন একান্তভাবে নিজের দলে টানতে পারলেন না, ভেবে বিমূঢ় হয়েছি। তার ফলে হরিজনদের ফলদে আবেদনকরের স্থান উত্তরোত্তর দৃঢ় হয়েছে, সে অনুপাতে গান্ধীজির স্থান কমেছে। আবেদনকরের বাণী এখন যে পরিমাণ শক্তি আহরণ করেছে, সে অনুপাতে গান্ধীজির বর্ণাশ্রম উচ্চবর্ণ হিন্দু রাজনৈতিক পটভূমিতে এখন ভীতিকর দানবাকারে স্কীত হতে শুরু করেছে। অথচ একই ভাবে সেখানে সন্বেহ থাকে না আবেদনকরকে পাশে রাখলে গান্ধীজির ভারত আরো কত শক্তিশালী, লোকায়ত, সামাজিক সমতার দিকে এগোত।

পাঠকের মনে থাকবে ১৯৩৭ সালে কংগ্রেসশাসিত প্রদেশের মহিলাসভাগুলিতে মুসলমানরা সংখ্যানুপাতিক আসন বা ওরুধ পাননি। ১৯৪৬ সালে, বিশেষ করে উত্তর প্রদেশে, এর ব্যত্যয় ঘটেছিল। ১৯৩৮ সালে কলকাতায় দু'বার এসে চেষ্টা করা সত্ত্বেও গান্ধীজি কৃষকপ্রজা-কংগ্রেস মন্ত্রীরা সাধনে সফল হয়নি। ফলে ফজলুল হক অগত্যা মুসলিম লীগের সমর্থন গ্রহণ করেন। এ ব্যর্থতার ফলে একটি বড় কারণ, আমার এখনও

নিশ্চয় হিন্দু-মুসলিম ও অনুরক্ত হিন্দু জাতি ও উপজাতির উন্নতিকল্পে জনমনীর মনোভাব নিতে পারতেন। তা যদি করতেন তাহলে তাঁরা নিশ্চয় জিন্নার নৌকার পাল থেকে ছাওয়া টেনে নিতে পারতেন এবং ভারতের ভাগ্য অনারকম হত।

আমার ধারণা জিন্না মনে করতেন হিন্দু-পরিষ্কৃতের তরফ থেকে মুসলমান সম্প্রদায়কে যে সব আশ্বাস দেওয়া হত তা দাবি-পূরণ সমিল, তাকে সামাজিকিক ন্যায় অথবা সমান অংশীদারি স্বীকার বলা যায় না, যা নাকি ছিল তাঁর দাবী। আমার এখনও মনে হয় তাঁর অন্তরের আপত্তি, ঠিক যেমন হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী উনিশ শতকের প্রথম থেকে ভারতের সাংস্কৃতিক, আর্থিক, প্রশাসনিক, পেশাগত, বিজ্ঞানপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে নিজের প্রতীক্ষিত করেছে এবং ভারতীয় জীবনে ন্যায় স্বীকৃতি আদায় করেছে, সেইমত আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যুগ থেকে উদ্ভূত নতুন মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীও হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে সমানে হাত মিলিয়ে সমান সুযোগে সমান ভালে, সমস্থানে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে চলার সুযোগ পাবে। জিন্না এমন একটি ধর্ম [ধর্মীর সমাজ] জন্মগ্রহণ করেন যাতে, অন্যান্য অসাম্য সত্ত্বেও দু'ভিন্নতার মুখ্য সাময়িকী প্রথম থেকেই স্বীকৃত হয়েছে, যথা সকলে একসঙ্গে আহ্বানে আসন গ্রহণ ও একত্রে একপায়ে খাওয়া, এবং একই সঙ্গে মসজিদের মোকাবেলা পাশাপাশি বসে ধর্মোপাসনার অধিকার — যার কথা আগে বলেছি। সেই সঙ্গে চেয়েছিলেন হিন্দু-মুসলমানের সমান মর্যাদা দাবীর স্বীকৃতি। এই স্বীকৃতি পূর্ণভাবে না পেয়ে যেহেতু তিনি কোরানে পিঠ দিয়ে কয়েক দাঁড়ায়েন। আমার মনে হত তিনি যে একান্ত গৌড়া ধর্মবিশ্বাসে পাকিস্তানকে ইসলামিক রাষ্ট্র আখ্যা দিলেন তা নয়। পাছে ভবিষ্যতে হিন্দু ভারতের সঙ্গে পুনর্মিলনের আন্দোলন হয় সেই সম্ভাবনার বিরুদ্ধেই তিনি এই পথ নেন। ১৯৪৬ এর আগস্টের পর থেকে আমার সর্বদা পরিতাপ হত যে কংগ্রেস, লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি নৈবেদ্যের মত কেন নিজস্বের ব্রিটিশদের হাতে তুলে ধরেন। 'সম্মান' অংশীদারি স্বী, বিভাব্যে তাকে কার্যকরী করা যেতে পারে, সে বিষয়ে কেউই চেষ্টা করেনি বলে আমার মনে হত। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অর্থে ও অসহিষ্ণুতা দুই নেতৃত্বকে ব্রিটিশের কোলে ঠেসে দিল, ঈশ্বরের দুই বেড়াল ও বানরের গল্পের মত। তবে, দেশভাগের পর জিন্নার একটি কাজে আমি বিশেষ খুশি হই মাইটব্যাকটোমাকে স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল পদে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তিনি ব্রিটেন ও মাইটব্যাকটোমাকে সমুচিত জবাব দেন।

জিন্না একদা নেহরুর হাবভাবকে 'পিতার পান' ধাঁচের বলেছিলেন। নেহরুর দ্বিধার ফলে পঞ্জাবের দশকে সিভিল কোড বিল তাকে তোলা হয়, ফলে সামাজিক সংস্কারে ও অগ্রগতির পথে পথের চাপা পড়ে। সামাজিক ও আর্থিক অসাম্যের ভুক্তভোগীদের জন্য একের পর এক অসাব্যক নাম-কে-ওরাস্তে কাঁপুটি চালু হয়, সমুদ্র ও আশির দশকে যাদের সাধারণ নাম হয় 'পরিব্রাজী' ও 'কর্মসূচী'। এর ফলে গরীবী যত না হঠাৎ তার চেয়ে বেশী হল আমলা-বাজের প্রসার ও তাদের মধ্যে হরির দুটের ব্যবস্থা। আমার বরাবরই অথাক লেগেছে, পণ্ডিতবী, এবং

বিশ্বাস, কংগ্রেসের জমিদার শ্রেণীভুক্ত হিন্দু সভাব্য, শ্রেণীগত স্বার্থহেতু ফজলুল হক-প্রবর্তিত কৃষিক্ষণখাতক আইনের বিকল্পে ছিলেন। খাতকদের অধিকাংশই ছিলেন নিউজাতের হিন্দু ও উপজাতি এবং ধর্মাত্মরিত মুসলমান। আমার এখনও মনে হয় ১৯৩৮ সালে গান্ধীজি যদি ফজলুল হক-কংগ্রেস কোয়ালিশন প্রচেষ্টায় সফল হতেন তবে পরের দশকে বাংলার এবং ভারতের ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্ন মোড় নিত, এবং ১৯৪০ সালে লাহোরে পাকিস্তান রেজলিউশন হয়তো অত জোরদার হত না।

জিন্না

অবিভক্ত ভারতে, এমনকি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও জিন্না যে কখনও ইসলামিক প্রশাসনে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য ও সকলের সমান সুযোগ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন সে মনে করার কোন নজির নেই। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক পরিধিতে বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান যে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ তা তিনি ভালভাবে জানতেন। তিনি এও জানতেন যে বাংলার ভূমিসম্পদ আইন ও সংশ্লিষ্ট অন্যতম আইনের দুঃসহ অসাম্য সৃষ্টির ফলে সংখ্যিক ক্ষতিগ্রস্ত বাঙালি মুসলমান চারীসম্প্রদায়কে প্রচণ্ড বিক্ষোভের বাক্যের কাজে লাগাতে পারা যায়। গান্ধীজির কৃষকজা-কংগ্রেসের একপ্রচেষ্টা যখন বিফল হল তখন জিন্না এই সত্য উপলব্ধি করে মুসলীম লীগকে নির্দেশ দেন নিরুপায় ফজলুল হকের পার্টির সঙ্গে হাত মেলাতে।

জিন্না জীবন শুরু করেন মুখ্যত ইতরোপীয় উদারপন্থী, যুক্তিবাদী ঐতিহ্যে, যাতে ধর্মীয় গোঁড়ামির স্থান কম। বলা যায় তাঁর মাননিক জগতের সঙ্গে নেহরুর জগতের যতখানি মিল ছিল, তাঁর নিজের সাসোপাস বা কংগ্রেসের অন্য নেতাদের ততখানি ছিল না। তাঁর কাজ ও কথা থেকে বেশ বোঝা যায় যে এই শতকের বিশ দশকের শেষ পর্যন্ত তিনি ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক রাজনীতির পক্ষপাতী ছিলেন। সেই যুগে ইংল্যান্ডে একটি বক্তৃতায় সরোজিনী নাইডু জিন্নাকে 'হিন্দু মুসলমান ঐক্যের রাজদূত' বলে অভিহিত করেন। এমনকি, বলা যায়, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জিন্না, কাজে ও কথা, এখন আমার ইসলামিক ফাভারিস্টলিজম বলতে যা বুঝি, তাকে শতহস্ত দূরে রাখতেন। আমার ধারণ ছিল ইসলাম কথাটি তিনি রাজনৈতিক সংজ্ঞা হিসাবে বুঝতেন, ধর্ম হিসাবে নয়। হুয়ায়ুন কবীর মহাশয়ের ভাগিনের, আবতাক্কজ-জামান প্রায়ই বলতেন, বিডেড মুচিয়ে হিন্দুসুসলিম ঐক্য আনতে হলে সব ভারতীয়ের একটি আহ্বানের পদ 'অবশ্য' হওয়া উচিত, সেটি ঈদ-আদ-হাম পাই, অর্থাৎ খাঁড় শুয়োরের মাংসের মিশ্র কাবাব গোছের তরকারি। পাঠক হয়তো লম্বু চিত্ততা ভাববেন, কিন্তু আমার ভাবতে ভাল লাগত যে জিন্না মুসলীমধর্মীয় আচারনীতি, বিধিবিবেধ মানতেন না। এমন-কি সেগুলি অনেক বর্জন করেছিলেন। নেহরু যদিও কোনদিন মন্দিরে গিয়ে পূজা দেননি [?]। তবুও তিনি হিন্দু রীতিনীতি অগ্রাহ্য বা অবহেলা করতেন না। গান্ধীজি ও নেহরু যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে

পরে তাঁর কন্যা সরাসরি অন্য অনেক আশ্রয়স্থান ও আশ্রয়নির্ভরতাসূচক ব্যবস্থা ফেলে দিয়ে কেন এই ধরনের কর্মসূচির প্রস্রাব দিলেন, যার ফলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আঞ্চলিক ও আর্থিক অসাম্যগুলি বজায় থাকল, অথচ সরকার একের-পর-এক এমন সব কার্যসূচীতে টাকা ঢাললেন, যার মধ্যে ব্যর্থতার বীজ প্রথম থেকেই নিহিত হল, এবং দেশের অর্থেকের বেশী নাগরিককে অনিশ্চিতকালের জন্য ভিক্ষার পথে জোর করে ঠেলে দেয় হল।

১৯৪৬ সালে পূর্ববঙ্গ ছাড়ার আটশ বছর পর ১৯৭৪ সালে আমি আবার ঢাকায় যাই। ইতিমধ্যে আর যাইনি। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ উদ্দীপনার তুঙ্গে। যা দেখে আমার সবচেয়ে ভাল লাগল, এমন-কি বিষয়ে অভিভূত হলুম বলা যায়, তা হল দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে শুধু যে প্রশাসনের প্রতি ধাপে তা নয়—যাবতীয় শিক্ষানির্ভর পেশায় প্রযুক্তিতে বিজ্ঞানে-এঞ্জিনিয়ারিং-শিক্ষকতায় সর্বক্ষেত্রে আসন দখল করে আছেন বাঙালি মুসলমান। অথচ, ১৯৪৬ সালে এসব স্থান প্রায় একচেটিয়াভাবে অধিকার করে ছিলেন হিন্দুরা। প্রত্যেকেই যথেষ্ট শিক্ষিত, সজাগ। কাজে আছে প্রত্যেকের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং আত্মবিশ্বাস। অথচ কথাব্যতী বা ব্যবহারে নেই আমাদের কলকাতার 'ইয়াপি'দের মত হামমত্ চালবাজি। আরো একটি ব্যাপার লক্ষ্য করলুম। একপুরুষ, বাড়ো জোর দুইপুরুষের মগজজীবী হবার দরশন তাঁদের কারোরই হাতে-কলমে কাজ করতে, হাত ময়লা করতে, অথবা কত ধানে কত চাল আর হিসাব নিতে বা নিতে আপত্তি বা জ্ঞানের অভাব নেই। আমাদের মত ও সব 'ছোট ব্যাপারে' তাঁরা নাক উঁচু করে মুখ ঘুরিয়ে বসেন না।

মাত্র আটশ বছর ধরে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ যখন নিজের ঘরে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হবার উদ্দেশ্যে, মালিক হবার একান্ত চেষ্টায়, এক-নাগাড়ে লড়াই করে চলেছেন তখন আমাদের দেশের, বিশেষত পূর্বভারতের অনেক রাজ্যই—যেমন আসাম, উড়িষ্যা, মণিপুর, এমন কি পশ্চিমবঙ্গও গয়ংগা-কেন্দ্রনির্ভর-নাবালক অবস্থায় নিশ্চিতভাবে কালাতিপাত করছিল, এবং সাক্ষি গাইবার জন্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অহরহ উচ্চকণ্ঠে বিবোধগার করেই পাশ ফিরে আবার গুত। স্পষ্ট প্রমাণ হল নিজের বুড়োবয়ে রাজা হবার চেষ্টা করা এক কথা, আর সংবিধানগত মৌলিক অধিকারের, তথা নির্দেশনীতির মনোহারা তালিকায় আত্মবিশ্বাস থাকার আরেক কথা। সংবিধানগত অথবা আইনগত অধিকার এবং আশ্রাস এক কথা এবং বাস্তব জীবনে তার ফলভোগ আরেক কথা। প্রথমটি দিয়ে দ্বিতীয়টির অভাব পূরণ হয় না। এ বিষয়ে ভাবের ঘরে চুরির প্রকৃষ্ট উপাহরণ পশ্চিমবঙ্গ, প্রগতি ঐতিহ্যবাহী পশ্চিমবঙ্গ এখনও রাজনীতিতে বা প্রশাসনে একজনও জগজীবন রায়, কামরাজ, রফি আহমেন কিংবোয়ই, জৈল সিং, বুটা সিং, অথবা বংশীলালকে সমাজের শীর্ষে তুলতে পারল না। ছেলেবেলার দেখেছি বীরেন্দ্রনাথ শাসনামলের মত সুদক্ষ প্রশাসককে আমরা কলকাতার পৌরসভার অধ্যক্ষ হতে দিইনি, তার কারণ নেতারা সমঝের বলেছিলেন, ও তো জাতে কেয়ট, সে কলকাতার কী বুঝবে?

পৃথিবীতে, আইনপ্রদত্ত সমতা বা সমানঅধিকারের ফল কার্যত কিভাবে পদনলিত হচ্ছে তা

রোজ ভোরে যোধপুরে পার্কে যখন প্রাতঃসমাবেশে বার হই তখন ডাস্টবিন থেকে ছোট ছেলেমেয়েদের খাবার খুঁটে খাওয়াতেই দেখি। ১৯৪১ সালে বরিশালে একটি লোকপ্রবাদ শুনেছিলুম সেটি ১৯৯০ সালে বিশেষ করে মনে পড়ল :

গত বছর আমার পদবী ছিল মোমিন (জোলা), এবছর চাষে লাভ করে আমার পদবী হয়েছে খান, খোদা দেন তো আসছে বছর হব শেখ, খোদার দেয়ায় অবস্থা আরো ভাল হলে হব সৈয়দ।

বাংলাদেশের প্রথম যুগে, অর্থাৎ পূর্ব-পাকিস্তান থাকার সময়েই সমানঅধিকার লাভের অভিযান কেভাবে অগ্রসর হয় তার প্রধান কারণ সম্বন্ধেও আমার নিজস্ব একটি অনুমান আছে। ইসলাম সব মুসলমানকে অন্তত দুটি সামাজিক সমানঅধিকার দেয়। প্রথম, খাবার সময়ে আপামর সকলে মিলে একত্রে বসে একই থালা থেকে সকলের ভোজনের অধিকার। দ্বিতীয়, ধর্মোপাসনার সময়ে সকলে একই মসজিদে ছোটবড় নির্বিশেষে পাশাপাশি বসে উপাসনা করার অধিকার। তৃতীয় একটি অধিকার আমি বরিশাল, ঢাকা, মৈমনসিং, চট্টগ্রাম সর্বত্র দেখি। মুসলমান জমিদারবাড়িতে যত ছোট প্রজা বা ভাগীদারই হোক—তার ভাগ তাকে ঠাকুরের জন্য কার্যক্ষেত্রে যত যদিফিকরিই খাটানো হোক—জমিদারবাড়ির দাওয়ায় উঠে বসতে পারে। এই তথ্যকথিত সমান মর্যাদা, অনেকে আনুষ্ঠানিক নাম-কা-ওয়াস্তে বলে উড়িয়ে দিতে চান, ভুল কৌচকান। কিন্তু নাম-কা-ওয়াস্তেরও একটি মহৎ মূল্য থাকে, সেই সামাজিক সমতার সঙ্গে বৈবয়িক, সাংস্কৃতিক বা অর্থনৈতিক সাম্য যদি নাও আসে, তবুও। তা না হলে আমাদের দেশের কোটি কোটি তথ্যকথিত ইতরজাতের নরনারী ইসলাম বরণ করতেন না এবং ঠিক এই কারণে আজও বোধহয় ইসলামীয় ফাভামেন্টালিজম অনেক দেশে শাস্ত্রীয় লেনিনবাদী সাম্যবাদের প্রতিবাদী ও সমকক্ষ প্রতীকমূল্য বা সম্মান পেয়েছে এবং পাচ্ছে। তবে সব ধর্মের ফাভামেন্টালিজমের মত দুটি বিষয় সমাজের দেহে ঢুকলে তাকে দূর করা শক্ত : একটি, দেশের অর্থেক শক্তির অর্থাৎ নারীসমাজকে দাসত্বে বদ্ধ করা, অন্যটি, নেতাদের মধ্যে কে পবিত্র থেকে পবিত্রতর তার অগ্রাধিকার পায়ের জোরে, অত্যাচার ও আতঙ্কের সৃষ্টি করে প্রতিষ্ঠা করা। শিক্ষিত উচ্চবর্ণের অথবা মধ্যবিত্ত বা মধ্যবর্ণ খুব কম হিন্দু বাঙালিকে আমি শুনেছি মেথর বা মেহুনির সঙ্গে গলার কর্কশ বা হুকুমের সুর না এনে, সমানভাবে আপনি সম্বোধন করে কথা বলতে। বাড়িতে এসে বসতে বলার তো কথাই ওঠে না। আবালবৃদ্ধ সকলকে 'আপনি' সম্বোধন করা আমি মুন্সীগঞ্জে বাঙালি মুসলমানদের কাছে প্রথম শিখি।

নেহেরু

মানে একটি ক্ষোভ আমার থেকেই গেছে। আব্রাহাম লিঙ্কন বলেছিলেন কোন জাতি অর্থেক দাস এবং অর্থেক স্বাধীন হয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। আমার ক্ষোভ এই, নেহেরু কেন লিঙ্কনের সূত্র অবহেলা করলেন। 'ভারত আবিষ্কার'-পথে তিনি নিশ্চয় জেনেছিলেন যে তাঁর দেশে অর্থেক কেন, এক-চতুর্থাংশেরও কম স্বাধীন এবং তিন চতুর্থাংশের থেকেও বেশি

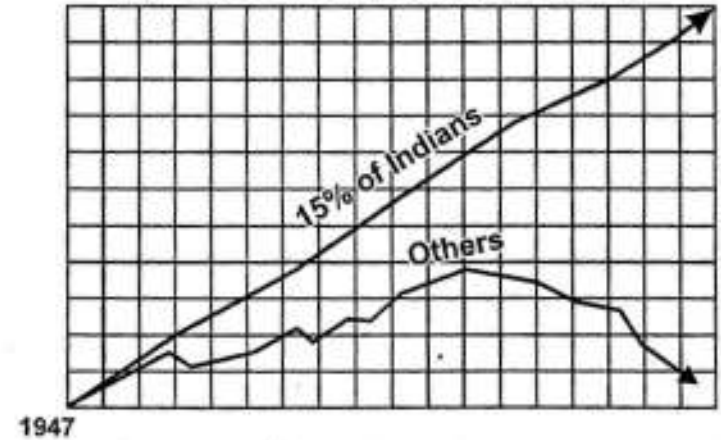
দাস, যদি দ্বিতীয় বিভাগে হিন্দু-সম্প্রদায়ের তপশীলী ও অনুন্নত জাতি, অনুন্নত উপজাতি ও সংখ্যালঘু অন্য সম্প্রদায়গুলিকে ধরা যায়। তাঁর জানতে বাকি ছিল না যে দাসত্বের প্রধান চিহ্ন হচ্ছে নিরক্ষরতা, অপুষ্টি, বাসস্থান, সুস্থ পরিবেশের এবং জীবিকার অভাব। এবং তাদের সাথী হয় উঁচু শিশু ও প্রসুতিমৃত্যুর হার, মাথাপিছু অতি স্বল্প ধনোৎপাদন, যার থেকে আবার আসে স্বাস্থ্যভাব, অপুষ্টি, জ্ঞানভাব, প্রযুক্তির দৈন্য। তিনি নিশ্চয় জানতেন, ভারতে যারা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন তারা অধিকাংশই উচ্চবর্ণের হিন্দু, যারা সবকিছু সুযোগ-সুবিধার প্রায় একচ্ছত্র অধিকারী, যারা চিরকাল ধরে ভারতের ইতিহাসে ছলে-বলে কৌশলে আধিপত্য বজায় রেখে এসেছেন এবং ভবিষ্যতে যতদিন সম্ভব বজায় রাখতে চেষ্টার ক্রটি করবেন না। এ বিষয়ে তাঁর মনে যদি বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকত, তাহলে গান্ধীজির হত্যায় সে-সন্দেহের নিরাকরণ হওয়া উচিত ছিল। এও তিনি অন্য সকলের থেকে নিশ্চয় বেশী গভীরভাবে জানতেন যে আমাদের দেশের শক্তিবৃদ্ধির জন্যে মানবিক, সামাজিক, আর্থিক ও জীবিকার সুযোগের সমতার বিশেষ প্রয়োজন, এবং এই সুযোগ-সমীকরণের পথে দূরপাশে না এগোলে ভারতের শক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হবে। এবং এই অভাবের দরুণ অতিকায় দেহ সত্ত্বেও ভারতের পা দুটি এখনও কাদায় গড়া থেকে গেছে, এবং ঠিক এই কারণে সে জগৎসভায় তার ন্যায্য সম্মান পূর্ণভাবে পাচ্ছে না। বিদেশনীতি, ইত্যাদি নীতির পাশে আমি এককথায় একে গার্হস্থ্যনীতির অবহেলা বলব। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বে নেহরু ছিলেন সম্মানিত নেতা, কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের সর্বত্র তিনি ছিলেন আদর্শব্রজ। তবুও এই গার্হস্থ্যনীতি অবহেলার ফলে তৃতীয় বিশ্বেও ভারতের যতখানি গরিমাময় আসনলাভ সম্ভব হত তা হয় নি। (এই গার্হস্থ্যনীতির অবহেলা শুধু ভারতে নয়, হয়েছে পাকিস্তানে, বাংলাদেশে, নেপালে, ভুটানে এমনকি শ্রীলঙ্কাতেও)।

এমন দু-একটি ‘অতি আবশ্য’ ক্ষেত্রে কথা ধরা যাক, যেখানে নেহরু যদি প্রথম থেকেই দৃঢ়সঙ্কল্প প্রকাশ করতেন তাহলে কোন বিরুদ্ধতা বা গাফিলতি পাওয়া পেত না। ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে তিনি জানতেন ১৮৬৯ সালে মেইজি যুগের প্রারম্ভে জাপান-সম্রাট অন্য কোন জনকল্যাণ খাতেই কোন সরকারি দায়িত্ব নেননি। একমাত্র দায়িত্ব নিয়েছিলেন প্রতি শিশুর বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চারবছরে সম্পূর্ণ করার সর্বজনীন আইনের ও তার পালনের। নেহরুর কাছে অবদিত ছিল না যে ব্রিটেন ১৮৭০ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করে যার ফলে সে দেশ দ্রুত শিল্পোন্নতির শীর্ষে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে জন্ম হার কমে এবং শিশু ও কুলের বয়সী ছোট ছেলেমেয়েদের অর্থকরী কর্মে নিয়োগ আইনমতে রদ হয়ে যায়। শিশু ও ছোটছেলেদের মারকৎ পরিবারের রোজগার বন্ধ হওয়ায়, উপরন্তু স্কুলে শিশুদের প্রতিপালনে ও শিক্ষার খাতে পরিবারের খরচ বৃদ্ধি হওয়ায় মা-বাবারা জন্মহার হ্রাস করতে বাধ্য হয়। নেহরু সোভিয়েট যোজনাদর্শের ভক্ত ছিলেন। সোভিয়েট যুগের প্রথমদিকে দেশময় দ্রুত বিদ্যুৎসঞ্চারকরে লেনিন যখন গোয়েলারো প্ল্যানে প্রচুর অর্থব্যয়ের সঙ্কল্প নিলেন, তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ ঐক্যবদ্ধ জনগণ তাঁর গবেষণালব্ধ তথ্য পেশ করে লেনিনের কাছে আবেদন করেন

যেন বিদ্যুৎসঞ্চারের থেকে টাকা কেটে সারা দেশময় অন্তত চারবছরব্যাপী সর্বজনীন ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা করা হয়, কারণ সে ব্যবস্থা দেশের পক্ষে আরো দ্রুততর উন্নতির সহায়ক হবে। তিনি নানা যুক্তি দিয়ে বলেন যে দেশের সর্বপ্রকার দ্রুত উন্নতির মূলে আছে প্রাথমিক শিক্ষা, এমন-কি, সনাতনী প্রথায তিন শিক্ষা : পাড়া, লেখা ও পাটিগণিত। তাছাড়াও আমাদের দেশেই নেহরুর সমুখে ছিল গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা এবং রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার আদর্শ। যদি প্রথমেই তিনি জেন করতেন আগামী নির্দিষ্ট কয়েকটি বছরের মধ্যে দেশে পুরোপুরি সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করতেই হবে এবং নিরক্ষরতা দূর করতে হবে, যা সোভিয়েট রাশিয়া বা জাপানে সম্ভব হয়েছিল; যদি তিনি তপশীলী, অনুন্নত জাতি, উপজাতি ও সংখ্যালঘু ধর্মসম্প্রদায়গুলির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অসাম্য দূর করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যবস্থা নিতেন; তাহলে সার্বিক ঐক্য, দেশের প্রতি আনুগত্য ও নির্ভরতা অনেক রাত, যার ফলে জাতির শক্তি ও সম্মান বৃদ্ধি পেত। আপামর সকলের মনে আসত প্রকৃত আত্মসম্মান, আত্মনির্ভরতা, স্বচ্ছায় পরিবার নিয়ন্ত্রণ, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে পারিবারিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ও অর্জনশক্তি এবং প্রতিশ্রুতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিপ্রয়োগের দৃষ্টিভঙ্গী। সঙ্গে সঙ্গে আসত সমাজের সর্বনিম্নস্তর থেকে স্বাস্থ্য, জীবিকা, পরিবেশ ইত্যাদির উত্তরোত্তর উন্নতির দাবী।

● প্রয়াত লেখক ইন্ডিয়ান সিভিস সার্ভিস (আই.সি.এস.) এবং জনগণনা দপ্তরে প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। রচনাটি পুনর্মুদ্রিত।

DEVELOPMENT WITHOUT DIGNITY



তোমার পূজার ছলে

মনোরঞ্জন ব্যাপারী

আমি যে অঞ্চলে বাস করি সেই মুকুন্দপুরে এক তেমাখায় বাবা সাহেব আশ্বেদকরের একটি আবক্ষ মূর্তি আছে। একদা যাবাবর লিখেছিলেন যে দশ ঘর বাড়ালি হিন্দু যেখানে বসবাস শুরু করে সেখানে সর্বপ্রথম গড়ে তোলে একটা কালী মন্দির। এই প্রবণতা আজকাল কিছু শিক্ষিত নিম্নবর্ণ মানুষের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে- তারা দশ জন একত্র হলে সমাজের হিতার্থে আর কিছু না করুক একটি আশ্বেদকরের মূর্তি অবশ্যই বসাবে।

আমি একবার নাগপুর গিয়েছিলাম। সেখানে যে মহাশয় ছিলাম- ছোট মাঝারি বড় এমন কোন গলি দেখিনি যে গলিতে বুদ্ধ আর আশ্বেদকরের মূর্তি নেই। এতে আমার আনন্দিত হবার কথা। তবে হতে পারিনি কারণ মহারাষ্ট্র- যে মহারাষ্ট্র সেই মহান সন্তানের জন্ম এবং কর্মভূমি, সেখানে আজ তেমন কোন দলিত আন্দোলন নেই। সেখানকার দলিত বুদ্ধিজীবীদের কাছে আশ্বেদকর মানে একজন বিশিষ্ট মানুষ। তাই তার পদাঙ্ক অনুসরণ করার কোন তাগিদ নেই। আছে মূর্তি প্রতিষ্ঠার আড়ম্বর। এই কারণে আজ মহারাষ্ট্র জুড়ে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সবচেয়ে বড় স্বার্থরক্ষাকারী সংগঠন রাস্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের এত দাপট। শিবসেনা বিজেপির এত বাড় বাড়ন্ত। এই চিত্রপটে দলিতদের স্বযোজিত নেতৃত্ব যেন পাহাড়ের পাশে উইটিপির মত। অতি কষ্টে যাদের অস্তিত্ব চিকিয়ে রাখতে হয়। তাও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দয়্যার।

আশ্বেদকরের মূর্তি স্থাপনার হিড়িক সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গেও দেখা যাচ্ছে। এটা বেশ মনোরম ব্যাপার। একবার মূর্তিটা কোনক্রমে বসিয়ে দিতে পারলেই ঝামেলা মিটে গেল। সায়া বছর রোনে জলে গড়ে থাকবে পথের ধারে। ভাত চাইবে না জল চাইবে না, কাকে মাথায় মল ত্যাগ করলেও ক্ষেপে উঠবে না। বলতে গেলে কোন “বর্চা” নেই। লাভ যোল আনা। সেই মূর্তি-ফলকের গায়ে জল জল করে ফুটে থাকবে খোদাই করা নাম। সমাজবন্ধু অমুক চন্দ্র মহাশয়ের উদ্যোগে এই মূর্তি স্থাপিত হইল। যত কাল মূর্তি থাকবে, অক্ষয় থাকবে অমুক চন্দ্রের নাম।

মুকুন্দপুরের মূর্তিটি অবশ্য কোন এক ব্যক্তির দানে নয়। অঞ্চলের অসংখ্য দলিত মানুষের শ্রমে ঘামে উপার্জিত অর্থ থেকে চাঁদা স্বরূপ দশ বিশ টাকা আদায় করে তা দিয়ে মূর্তি নির্মাণ এবং অন্য ব্যয় মেটানো হয়েছিল। সে সব তো ঠিকই ছিল, কিন্তু সেই মূর্তির আবরণ উন্মোচন করতে যাকে আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছিল- তিনি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। এ কী বিভ্রম! যে আশ্বেদকর সারাজি জীবন এক আপোষহীন সংগ্রাম পরিচালিত করেছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে- সেই আশ্বেদকরের মূর্তির উন্মোচন করতে তারই অনুগামীরা শরণাপন্ন হলেন এক ভট্টাচার্য

বামুনের। দলিত সমাজে আর কোন যোগ্য লোক পাওয়া গেল না?

পাওয়া নিশ্চয় যেত যদি খোঁজা হতো। তারা খোঁজেননি। তাদের যুগপথের দাস মনোবৃত্তি সেই অনুসন্ধান থেকে বিরত রেখেছে। সেই ব্রহ্ম এদের দাস মনোবৃত্তি এদের বুঝিয়েছে- সবচেয়ে ভালো নিম্নবর্ণ মানুষটার চেয়ে বা হোক আর যেমন হোক-বামুন বংশের যে কেউ শ্রেষ্ঠ। আর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। একে বামুন তার মুখ্যমন্ত্রী আর কী চাই-! ওই পায়ে প্রণত হলে ইহকাল-পরকাল দুটোই কানায় কানায় পূর্ণ হবার সমুহ সম্ভবনা। আবার আশ্বেদকরের মূর্তির দৌলতে দলিত সমাজে নেতার পদটাও ধরা রইল।

আমি কলকাতায় থাকি বটে তবে বাসিন্দা বা স্থায়ী নাগরিক দণ্ডকারণের পারালকোটের ৫৬ নম্বর ভিলেজের। পারালকোট ১৩৩টা ভিলেজ আছে। এখানে যারা বাস করে সবাই পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত - পূর্ববাসন প্রাপ্ত নমো জেলে এই সব জাতির লোক। বামুন কায়েত আছে তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম। কাশী অঞ্চলে প্রায় গোটা কুড়ি বাইশ ভিলেজে মাত্র দুখর ব্রাহ্মন। এর মধ্যে এক ঘরের একজনই যজমানি করে অন্য আর কেউ নেই। বাকি যারা-বাবসায়ী বা চাকুরে।

আমি তখন কলকাতা বাস সমাপ্ত করে পাকাপাকি ভাবে পারালকোটে থাকবার ইচ্ছায় ঘিরে গিয়ে কাশীতে ঘর বেঁধেছি। তখন এক বিকালে আমার কাছে ছুটে গেল একজন বিপন্ন। কী ব্যাপার! না, তার মেয়ের হঠাৎ করে বিয়ে স্থির হয়ে গেছে। পাশের ভিলেজের কোন এক পাত্র আজই তার কন্যাদায় উদ্ধার করার জন্য রাজি হয়েছে। পাছে কাল মত পরিবর্তন করে ফেলে তাই আজই অটী জন লোক সাক্ষী রেখে বিয়েটা সেরে দিতে হবে। রাত দশটা দশ গতে - এগারোটা পাঁচ পর্যন্ত শুভলগ্ন আছে। তবে মুশকিল একটাই-বামুন পাওয়া যাচ্ছে না। সেই যে একজন বামুন-তার অন্যত্র আর একটা বিয়ে দিতে যেতে হবে বলে সে আসতে পারবে না। বামুন ছাড়া তো বিয়ে হবে না।

এখন উপায়? আছে, উপায় একটা আছে। বলেছে বামুন। যদি কেউ একজন পুরোহিত দর্পন দেখে বিয়ের মন্ত্র পাঠ করে তখন তাকে কোন বামুন ছুয়ে বসে থাকে - সে মন্ত্রও আসল মন্ত্রের মতো ফলদায়ক।

বামুনের পুরোহিত দর্পন মোটে একখানা। সেখানা নিয়ে সে নিজে যাবে অন্য কোনখানে কাউকে বিয়ের মন্ত্র পড়াতে। ওটা তো রেখে যেতে পারবে না-তাহলে সেই বিয়ে যে হবে না। তাই সেই বিপন্ন বাপ আমার কাছে এসেছে। আমি পুরোহিত দর্পন দেখে একটা খাতায় যদি মন্ত্রটা লিখে দিই-বড় উপকার হয়। সেই খাতা দেখে কেউ মন্ত্রটা পড়ে দেবে।

কী আর করি! আমার যে হাতের লেখা। সেই আকারীকা অক্ষর খাতার পাতায় লিখে সেই বিবাহের মন্ত্র। আমি জননতাম এই লেখার যথাযথ মর্যাদার অসাধ্য। বলেও ছিলাম তাকে সেকথা যদি সঠিক উচ্চারণ না হয়-ভুল মন্ত্রে নির্ভুল বিয়ে কী করে হবে? বাপ সে কথায়

বিশেষ কর্পপাত করল না। অংবং সংস্কৃত মন্ত্র তুলে হলেও - ঠিক। পরের দিন শুনলাম কেউ একজন সেই খাতার লেখা পড়েছে। তখন তাকে ছুয়ে বসেছিল বামুনের এক মেয়ে। তার যে ছেলে নেই। বামুন ঘরের পুত্র সন্তানের পৈতে হয়। গলার পৈতেতেই বামুনদের সাক্ষা দেয়। মেয়ের তো পৈতে হয় না, তাহলে সে কী করে বামুন হয়?

আমরা লেখায় বক্তৃতায় কথাপোকথনে বলে থাকি বামুনরা আমাদের অজ্ঞে বলে অপমান করে ঠকায়। সেই যে কথায় বলে-তলোয়ার চালালে গলা কেটে যায় সে জন্য একা তলোয়ার দেখা নয়, গলার ও রোষ আছে কারণ সে কেটে যায়। বামুনরা আমাদের ঠকিয়ে নেয় ঠকাতে পারে কারণ আমরা ঠকতে চাই। তা না হলে ঠকাবে কী করে। আমরা তাদের মাথায় তুলে নাচি তাই তারা মাথায় লাগি মারতে সুযোগ পায়।

পারালকোট তথা বাস্তার জেলার আদিবাসী গোন্দ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা অজ্ঞত সামাজিক বিচার ব্যবস্থা আছে সেখানে কেউ যদি কাউকে জুতো দিয়ে মারে যে মার খাবে তারই সাজা জরিমানা হবে। এটা কেন? জিজ্ঞাসা করেছিলাম একজন গ্রাম্য মোড়লকে সে বেচারার মারও খেল আবার জরিমানাও দেবে?

বলেছিল সে জুতো কে পারে দেয়? বাবু লোকেরা তো? আদিবাসী-সেই লোকটার অত কাছে গেল কেন? গেল বলেই তো জুতো মারতে পারল। জুতো তো বন্দুকের গুলি নয় যে দূর থেকে মারবে। তাই এই সাজা।

এখন অবশ্য কিছু কিছু আদিবাসী ও জুতো পারে দেয়। যে কালে দুই নিয়ম তৈরি হয়েছিল সে কালে তাদের পা ছিল খালি। সময় বদলে গেছে। বদলারনি সামাজিক বিধান। জুতো পরা আদিবাসীও তাদের চোখে আর আদিবাসী নেই। কিন্তু মূল যে বিষয় তা হচ্ছে সামাজিক নীতি নিয়ম বিধান। তারা তাদের সমাজে-সমাজে শত্রুদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখার যে কার্যকার পথ পদ্ধতি গ্রহণ করতে পেরেছে ব্রাহ্মণদের নৈকট্য থেকে আমরা আমাদের জন্য এখন কোন কঠোর বিধান সাজা জরিমানা প্রণয়ন করতে পারি না কেন?

যে যত গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে আছে তাকে আগাতে হলে খাকাটা তত জোরে দিতে হয়। যে ভুগছে কঠিন অসুখে মিষ্টি মধুর হোমিওপ্যাথি গুলিতে যে রোগ সারাবার নয় তাকে তো তেতো কড়া এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা না দিয়ে কোন উপায় নেই। দরকার হলে অপারেশান টেবিলে ফেলে চেঁড়াই ফাড়াই রক্তপাত করতে হবে। পারালকোটে আমার মা মারা যান। আমি তখন সেখানেই ছিলাম। আমার ছোটভাই যথারীতি মায়ের মুখাঙ্গী গলার কাছা-ধরা ধারণ করল। আমি যে কিছু করিনি। এগারদিন পরে শ্রাব্দে কাপসীর সেই বুড়ো বামুনকেও ডেকে নিয়ে এল। আমি বললাম এই সব আমার কোন বিশ্বাস নেই। আমি এ সব করব না। এই বামুন মন্ত্র পড়বে তবে মা স্বর্গে যাবে সে সারা জীবন যা করেছে তাতে তার স্বর্গে যাবার ছাড়পত্র মিলবে না, এই যদি হয়-তবে তার স্বর্গে যাবার দরকার নেই।

আগেই বলেছি পারালকোটে বামুন কায়েত খুব বেশি নেই, সব নমো। সেদিন যারা আমাকে বামুনের পায়ে প্রণাম এবং প্রণামী দিতে চাপ দিয়েছিল সামাজিক বয়কট অর্থাৎ একঘরে করার ধমকি দিচ্ছিল তারা কেউ উচ্চবর্ণ নয় সব আমার স্বজাতি স্বজন। এই এরই ঘরে ঘরে হরিচাঁদ গুরচাঁদের ছবি বাঁধিয়ে রেখেছে। মাঝে মাঝে হরি লীলামৃত পাঠ শোনে, বছরে একবার ঠাকুর নগর যায়। কী শিখল তা হলে মতুরা ধর্ম থেকে?

এরা তো অতি সাধারণ শিক্ষা দীক্ষাহীন মানুষ। হাজার বছর ধরে ব্রাহ্মণ-উচ্চবর্ণের পায়ে মাথা রগড়ানোর অভ্যাস। সে অভ্যাস কী করে ত্যাগ করে? বিশেষ করে যখন দেখে পড়ালেখা জানা শিক্ষিত নমো তারাও বামুনের পদলেহন করে চলেছে।

সেটা দশ বারো বছর আগের কথা একদিন নমো সমাজের এক বৃদ্ধ বিশিষ্ট মানুষের বাড়ি গেছি। বললেন তিনি আমি আর বেশিদিন বাঁচব না তার আগে নমোদের একটা মহাসম্মেলন করতে চাই। সেই কবে গুরচাঁদ ঠাকুর করে ছিলেন তারপর আর হয়নি। এবার একটা হওয়া দরকার।

কয়েক মাস ধরে তার প্রস্তাবটি চলল। একদিন এসে গেল সেই শুভক্ষণ। আমি সে সম্মেলনে যেতে পারিনি কারণ ডেলিগেট ফি খার্ব হয়ে ছিল পাঁচশত টাকা। যা তখন আমার এক মাসের মাইনে। সে টাকা দিয়ে দিলে সারামাস খাব কী। তবে একটা দিন আমাদের জন্য একটা প্রকাশ্য অনুষ্ঠান ছিল। চাইলে মাঠে বসে মাঝে উপবিষ্ট চকচকে দলিত নেতা দেখে নয়ন সার্থক করতে পারতাম। অমৃত বাণী শ্রবন করে জীবন ধন্য করতে পারতাম। কিন্তু যেতে মানের সায় পাইনি। কারণ? কারণ এই মহাসম্মেলনও সেই চিরচরিত বামুন-বন্দনা দিয়ে সূচনা করা হয়েছে। সম্মেলন অজ্ঞে অস্পৃশ্য ছোটজাত নমোদের - আর তার সভাপতি এক চক্রবর্তী মহোদয়। আমাদের সমাজ শিরোমণির নিজেদের সমাজে আর কোন বোধ্য ব্যক্তি বুজেই পাননি।

এতক্ষন ধরে যা কিছু লিখলাম শুই দণ্ডকারণ্য যা এই বাংলা দেশ যেখানে আমাদের যত নিম্নবর্ণ রয়েছে হাতে গোনা দু পাঁচজন বাদে আর সবার মনে জিনে চেতনা চিন্তায় ভুতের জন্য ভয় আর ব্রাহ্মণের জন্য যে ভক্তি সমীহ অধুজা সিমেন্টের মত জমটি বেঁধে গেছে তা পেরিয়ার, ফুলে, আবেদনকার গুরচাঁদ এই সব হাতুড়ির আঘাতেও ভাঙছে না।

বাবা সাহেব সম্ভবত: এই রকম একটা কথা বলেছিলেন যে দাস যদি একবার বুঝতে পারে সে শৃঙ্খলিত সে শৃঙ্খল ভেঙে ফেলবে। তিনি বলেননি যে দাস শেকলকে গহনা ভেবে আসে ধারণ করে আর মুক্তি কী ভাবে সম্ভব! সেই যেমন আদিম সমাজে পরাজিত গোষ্ঠির নারীদের ধরে এনে বিজয়ী গোষ্ঠি তাদের হাতে গায়ে গলায় কোমরে শেকল বেঁধে রাখত, তখন যে শেকল ছিল লোহা পরে যা পরিবর্তীত হয়েছে সোনা রূপায়। আজ যে মেয়ের গলায় হাতে শেকল বেড়ি না থাকে সে নিজেকে বড় অভাগা ভাবে সেই রকম যে ব্রাহ্মণ্য বিধান একদা নিম্নবর্ণ মানুষকে ধর্মীয় শোষণের শেকলে বেঁধে ফেলার জন্য জোর করে চালিয়ে দেওয়া হয়েছিল আজ তা সে সানন্দে বহন করে বেড়াচ্ছে। যে লোকটা তার স্বজাতি প্রতি- বেশি না

থেকে থাকলেও এক মুঠো ভাত দেবে না সেই পুন্নের লোভে পায়ে ধরে আনা বামুন নিয়ে এসে ভোজন এবং ভোজন দক্ষিণা দিয়ে থাকে। ভাবে মহা পুণ্য সঞ্চয় হল।

এই মানসিক দৈন্য-দাসত্ব মুৰ্খতা থেকে কীভাবে কোন অর্থে কে তাদের রক্ষা করবে?

একটা ডিমে তা দিলে সেটা ফুটে বাচ্চা বের হয় কারণ ডিমের মধ্যে প্রাণ হবার উপাদান থাকে। যদি সেটা না থাকে মহা তা দিলেও কিছু হবার নয়। আবার যখন সেই তরল পদার্থটা প্রাণ হয় সে তার ছোট্ট চোঁট দিয়ে সেই আবদ্ধ করে থাকা খোলসে চোকর মারে, খোলস ভেঙে বাইরে বের হবার আশ্রয় চেষ্টা করে। তার সেই চোকরের শব্দ পেয়ে তায়ে বসা পাখি মা সে-ও চোঁট চালায়। খোলস ভেঙে বাইরে আসে ছোট্ট প্রাণ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রাণ হবার উপাদান এবং মুক্ত দুনিয়ার আসবার উদ্যম আর ছিল বলেই সে সামান্য একটু সহযোগিতা পেয়েই সফল হতে পেরেছে। যে মানুষের সেই উপাদান নেই উদ্যম উদ্যোগ নেই সে কী করে “মানুষ” হবে। ফার জন্ম যেমন গলা কটানোর জন্য তার জন্ম পরের গোলাম হয়ে থাকার জন্য। কে তার ভবিষ্যৎ বদলাবে! যেদিন তার নিজের উদ্যম জাগবে শত হাত সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসবে। আর সে উড়ে বেড়াবে অসীম আকাশে মুক্ত বিহঙ্গ হয়ে।

কোথায় যেন শুনেছিলাম “যদি তুমি কোন কিছু মনে প্রাণে কামনা করো তাহলে পৃথিবীর সব শুভশক্তি সেটা তোমার কাছে পৌঁছে দিতে তৎপর হয়ে উঠবে।” আমি এই কথাটার সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখি। এই যে মানুষ আজ মানুষ হয়েছে সে একান্তই তার নিজেরই চেষ্টায়। যদি তা না করত আজও এক গাছ থেকে আর এক গাছে লাফিয়ে বেড়াত।

তাই যে মানুষ দাসত্বের শেকল ভেঙে স্বাধীন-স্বাবলম্বী হতে চায় তাকেই উদ্যোগ নিতে হবে। নেতা গুরু গোসাইদের মুখ চেয়ে বসে থাকলে তার জীবন যে অন্ধকার গুহায় পড়ে আছে তা থেকে মুক্তি মিলাবে না। হাজার হাজার বছর ধরে এই মানব সমাজের ব্রান করতে সুন্দর করতে কত মহাপুরুষ তো এসে গেল তবু কোন পরিবর্তন হল না। কেন? ভক্তাররা বলে থাকেন যে মানুষ একবার বাঁচবার আশা পরিত্যাগ করে দেয়, কোন ওসুখেই আর তাকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। আমাদের নিম্নবর্ণ নিরক্ষর নির্বোধ মানুষেরা ও বদ্ধমূল ধারণা করে বসে আছে এই অবস্থা বদলাবে না। এ আমার পূর্ব জন্মের কৃতকর্মের ফলে হচ্ছে। যদি বদলায় বদলাবে ভগবানের দয়ায়। সেই ভগবানকে সম্বোধন করতে পূজাপাঠ দিতে ছাড়ছে কেউ বামুন ঠাকুরের গুরু গোসাইয়ের। এক ভুল থেকে জড়িয়ে যাচ্ছে আর এক ভুলের ফাঁদে। মহাপুরুষেরাও ব্যর্থ হয়ে গেছে এই মোহ থেকে মানুষকে মুক্ত করে আনতে।

আমি তবুও আশা হারাইনি।

রবীন্দ্র-গীতা ‘তত্ত্বনির্মিত’ উড়োজাহাজ

আশীষ লাহিড়ী

প্রযুক্তি আর বিজ্ঞানকে প্রথম থেকেই আলাদা করে দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯২৫ সালে তার রচনায় আধুনিক প্রযুক্তি-যন্ত্রের ‘আশীর্বাদ’-এর অনুরোধ দেখে বিস্মিত ও অধুনি হয়েছিলেন রবীন্দ্র-অনুরাগী বিজ্ঞানী-লেখক হ্যাভলক এলিস। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে সমর্থন করেছিলেন এই বলে যে প্রযুক্তির মধ্যে সৌন্দর্য নেই, তাই তো সৃজনশিল্পের উদ্দীপনা জাগায় না। তখন অমিয় চক্রবর্তী তখন রবীন্দ্রনাথের প্রযুক্তি-বিমুখ বিজ্ঞান অবগাহনকে সমর্থন করে লিখেছিলেন, বিজ্ঞানকে এরকম করে দেখাতে কে পেরেছে— যাতে চিন্তা, কল্পনা, অনুবৃত্তির বিচিত্র ধারা এক অপক্লপ সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে এসে চরম ব্যঞ্জনা লাভ করেছে? আমি ঠিক (এলিসকে) বলতে চাই যে আপনার (রবীন্দ্রনাথের) কবিতায় শহর বা রাস্তা বা রেলগাড়ীর বর্ণনা খুঁজতে গিয়ে উনি ভুল করেছেন।

কিন্তু বছর পঞ্চাশ পর মনে হয় অমিয় চক্রবর্তীর ধারণা বদলেছিল। প্রযুক্তির ফসল এমোয়েন কিংবা জাহাজ শুধুই রবীন্দ্রনাথ কবিতা বহুসভ্যতার বহিঃপ্রকাশ, তা মানুষের কর্মশক্তিকে রুদ্ধ করে, এ কথা ঠিক মনে হয়নি তাঁর। ১৯৭৬-৭৭ নরেশ গুহকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন তিনি ‘কিন্তু পেনে বসে আমরা কফিও খাই, কবিতাও লিখি, নির্ভিত্ত অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে বিজলি-রঙের পেন-পাখার মেঘচ্ছায়া নীলাস্তরে লক্ষ্য করি। সূর্যাস্ত, সূর্যোদয়, ন্যপিত নক্ষত্রাকাশ এমোয়েন নবতর মূর্তি নেয়...’। ২ তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের লেখায় ‘যন্ত্রপাতির প্রত্যক্ষ পরিচয়’ বিশেষ না থাকার কারণ ‘বোধ হয় টেকনলজির প্রথম অধ্যায় যে কলকারখানা, দানব-শহর, এবং সংহারী-যুগের অতিকার নির্মম বিলাস তিনি দেখেছিলেন তার প্রতি বিরুদ্ধতা তাঁকে সমস্ত টেকনিকাল ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সন্ধিহান করেছিল।’ এছাড়া এই ‘খাদ্যবিক্রমতা’র মূলে ছিল ‘বিদেশীদের হাতে যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার— লক্ষ লোক ধারণার বৈজ্ঞানিক বিধি’। ৩

কিন্তু এর সম্পূর্ণ আলাদা একটা মাত্রাও ছিল, সেটাকে বিপুল তাত্ত্বিক ও নৈতিক মাত্রা বলা চলে। ১৯৩২ সালে পারস্যে (ইরানে) গিয়ে, পৃথিবীর মাটি থেকে অনেক উচুতে, ‘যেখানে মরীচী সঙ্গে পক্ষ ইন্দ্রিয়ের যোগ সংকীর্ণ, সেখানে ‘বায়ুতরী’ থেকে বোমা ফেলে মানুষ মারার নৃশংস প্রযুক্তি-সাক্ষ্য দেখে; ‘ব্রিটিশদের আকাশকৌজে’র ‘স্ট্রীটন ধর্মযাজক’দের কাছে পারস্যের ‘কোন শেখদের গ্রামে তারা প্রতিদিন বোমা বর্ষণ’ করেছে তার হঠাৎ কিরিস্তি শুনে, তাঁর মনে হোয়াল এই ‘এমন অবস্থার’ কথাটার তাৎপর্য দূরপ্রসারিত। বাস্তবিক, দূর থেকে ‘রিমোট’ পৃষ্ঠা টিপে কিংবা অনেক উচু থেকে বোমা ফেলে অনেক মানুষ মারার এই প্রক্রিয়ার একটা ‘পাণ্ডা’ হল লক্ষ্যবদ্ধ থেকে হত্যাকারীর নৈর্ব্যক্তিক দূরত্ব; কাকে মারছি তার মুখ দেখতে

হচ্ছে না। আপসা হয়ে আসা সেই বাস্তবতা আনে এক ধরনের দার্শনিক নির্লিপ্ততা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এ প্রক্রিয়া খুব কার্যকর হয়েছিল; যার চরম পরিনতি হিরোশিমা ও নাগাসাকির ধ্বংসকান্ড। রবীন্দ্রনাথের সৌভাগ্য, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির সে 'সাক্ষ্য' (অনেকে যাকে গীতানুরাগী 'ওপেনহাইমারের পাপ' বলেন) তাঁকে দেখতে হয়নি। 'অস্ত্রশস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ও বিকলির্দেশের ব্যাপারে' ইলেকট্রিক বোতাম টোপা দূর-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রয়োগের তাৎপর্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অনেক পরে জে ডি বার্নাল লিখেছিলেন, এর 'আসল উদ্দেশ্য হল সাক্ষ্য সংঘর্ষের ক্ষেত্র থেকে মানুষের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি থেকে আরও দূরে সরিয়ে আনা। ... ক্রিয়া ও তার পরিণামের মধ্যে দূরত্বটা খুব বেশি হওয়ার আধুনিক যুদ্ধপ্রক্রিয়া দারিদ্রজ্ঞানহীনতাকেই প্রণয় দেয়। আগেকার যুদ্ধের সচেতন নিষ্ঠুরতার সঙ্গেই পান্না দেয় আধুনিক যুদ্ধের এই নির্বিকার দারিদ্রজ্ঞানহীনতা। আজকের বোতাম টোপা যুদ্ধপ্রক্রিয়ার কল্যাণে সুবুদ্ধিসম্পন্ন, আপাত সুসভ্য কোনও ব্যক্তির পক্ষেও অন্যায়সেই চরম বীভৎস মারণযন্ত্রের আয়োজন করা সম্ভব— যার ফলাফল তিনি অকুস্থলে স্বচক্ষে দেখতে পান না।' ৫ ইদানীং কালে ইরাক যুদ্ধে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বীভৎস 'সাক্ষ্য' এ কথার সত্যতার প্রমাণ। মানুষ নিখনের প্রত্যক্ষ ভয়াবহতা থেকে নিধনকারীকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে যুদ্ধপ্রক্রিয়া যে একটা গুণগত পার্থক্য দেখা দিয়েছিল, সেটা রবীন্দ্রনাথ অশ্রান্ত প্রত্যয়ে খরচে পেয়েছিলেন। এরোপ্লেন জিনিসটাকে তিনি সেই মারণ-অনুষঙ্গে দেখেছিলেন। তাঁর কাছে প্রগাটা নিছক হিংসা-অহিংসার নয়, হণ-নিধন করে মানুষের মন কী করে নরেন্দ্র মোদীর মতো নির্বিকার থাকতে পারে।

পাশ্চাত্য হননবিদ্যা যারা জানে না তাদের মানবসত্তা আজ পশ্চিমের অস্ত্রীদের কাছে ক্রমশই অত্যন্ত আপসা হয়ে আসছে।

এই আধুনিক, দূর-নিয়ন্ত্রিত যুদ্ধপ্রক্রিয়ার (যার প্রায় কিছুই তিনি দেখে যাননি) নির্বিকার দারিদ্রজ্ঞানহীনতার পিছনে যে-মন কাজ করে; কিংবা বলা যায়, সেইমন যেভাবে এই দানবিকতার যৌক্তিকতা খুঁজে নেয়, তার দার্শনিক সমাপ্তরাল তিনি খুঁজে পান ভগবদ্গীতায় উপস্থাপিত ক্রীকৃষ্ণর যুক্তিতে।

গীতা-রবীন্দ্রনাথের দোলাচল

গীতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দোলাচল অবশ্য নতুন নয়। গীতার যা গ্রাণ, সেই আশ্বাস অবিদ্বন্দ্ব-তত্ত্ব সম্পর্কিত উপদেশ নিয়েই প্রাণ ফুলেছিলেন অনেক কাল আগে ১৯০৮ সালে। স্বদেশী আন্দোলনের খরতা থেকে সরে আসার বছর তিনেক পরে তাঁর মনে হয়েছিল গীতার দর্শন আসলে যেকোনো মূল্যে কার্যসিদ্ধির সংকীর্ণ সাময়িক দর্শন। গীতা মানবসত্তাকে, মানুষের ভালোমন্দের বোধকে, এককথায় মানবিক নৈতিকতাকে, সম্পূর্ণ আপসা করে দেওয়ার তাৎক্ষণিক কেজো ক্রোরোফর্ম মাত্র, ক্রোরোফর্ম-এর মতোই ফলপায়ক। স্বদেশী বিপ্লবীদের

হিংসাশ্রয়িতার তত্ত্ব-প্রেরণা হিসাবে গীতার ভূমিকা তাঁর কাছে অজানা ছিল না। ৩১ মে ১৯০৮ অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখেছিলেন, 'অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবার জন্যে আশ্বাস অনধরই সম্বন্ধে যে উপদেশ আছে তার মধ্যেও বিশুদ্ধ সত্যের সরলতা নেই।' ৬

কিন্তু এর ঠিক দুবছর পরে, ১৯১০ সালের ২৩ মে তিনি লেখেন :-

এতকাল এত হজুগের মধ্যেও আমি গীতা পড়িনি— কারণ তখন আমার পড়ার সময় হয়নি, এখন সময় বুঝেই সময়ের কর্তা আমার হাতে এই বইখানি ফুলে দিয়েছেন। তার সঙ্গে যোগমুক্ত হবার জন্যে মনকে যে একটি অতি গভীর শান্তি ও সামঞ্জস্যের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে তার সত্যতা বুঝতে পারছি। ... এই যে সামঞ্জস্য এ তো বইয়ের জিনিস নয়— নিজের অন্তরের মধ্যে সমস্ত হৃদয়ের অতীত লোকে অধিরোহণ করতে হবে— ভিতরকার সমস্ত বিরোধ নিঃশেষে না মটোলে নয়, এই জন্যেই বইয়ের বাথার ঘাঁরা পদে পদে তার পরীক্ষার প্রয়োজন হচ্ছে। স্বপ্নর কবে এই পরীক্ষা থেকে আমাকে উত্তীর্ণ করবেন? কবে তিনি আমার সমস্ত ভাঙাকে জোড়া দিয়ে নেবেন?

তাঁর কাছে গীতা এখন আর তাৎক্ষণিক কার্যকারের ক্রোরোফর্ম নয়, তার 'চিরন্তন' মূল্যের সম্বন্ধে তিনি পেরেছেন। আঘাত-সংঘাত থেকে সরে এসে 'অতি গভীর শান্তি ও সামঞ্জস্য' লাভের চির-প্রতিষ্ঠিত পথ হিসেবেই ('অরবী গীতাগিরি' 'দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো, গভীর শান্তি এ যে') এখন তিনি গীতার বাণীতে অভিক্ষেপিত। 'এতকাল এত হজুগ' কথার তাৎপর্য কী? চিঠিলেখা ১৯১০-এ। অরবিন্দ পোদ্দার লক্ষ করেছেন, স্বদেশী নেতারা ঐ সময়ে একের পর এক অনেকেই আত্মমুখ অন্য সুরে গান গেয়েছেন। '১৯০৯ সালে কালাপার থেকে মুক্তিলাভের পর অরবিন্দ ঘোষ জনসমষ্টিতে বিমুঢ় এবং দেশের সর্বত্র একটা অস্বস্তিকর নিঃশব্দতা দেখতে পান। দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর এই মানসিক বোধ আর কিছুই নয়, প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে বিনায় গ্রহণ ও পরিশেষে অধ্যাত্ম সাধনায় নিমগ্ন হওয়ার পূর্বাভাস মাত্র।' অনুরূপভাবে 'বিপিনচন্দ্র পাল ইংল্যান্ডে পাড়ি দেবার ছাড়পত্র গ্রহণ করেন, এবং সেখানে ১৯১১ সনে যোগদান করেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন সমমর্যাদা সহ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারই হলো ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার সর্বোত্তম সমাধান।' ৮ ১৯১০ সালের বিখ্যাত 'জগোবন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথও গীতা উদ্ধৃত করে বললেন—

ইন্দ্রিয়গণকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়ে থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, আবার মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, আর বুদ্ধির চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ তা হচ্ছেন তিনি। ... এই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠকে সকলের মধ্যেই বোধের দ্বারা অনুভব করা ভারতবর্ষের সাধনা। ৯ তাই ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা। ... সেই অনুশাসনকে আজ যদি আমরা বিশ্বস্ত না হই, আমাদের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষাকে সেই অনুশাসনের যদি অনুগত করি, তবেই আমাদের আত্মা বিরাটের মধ্যে আপনার স্বাধীনতা লাভ করবে এবং কোনো সাময়িক বাস্তব অবস্থা আমাদের সেই স্বাধীনতাকে বিলুপ্ত করতে পারবে না। ১০

এই পরিস্থিতিতে বিচার করলে 'সময় বুকেই সময়ের কর্তা আমার হাতে এই বই তুলে দিয়েছেন' এই ঘোষনার মোহমুক্তি তাৎপর্য পরিষ্কার হয়ে যায়।

কিন্তু 'সময়ের কর্তার' এই সময়োপযোগী আবির্ভাব সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর স্থায়ী শান্তির প্রলেপ লাগাতে পারেনি। কেননা এখানে সত্য কেবল এটুকুই যে সংশয় থেকে 'শান্তি ও সামঞ্জস্য' পৌঁছানোর আগ্রহ সাধনা করছেন তিনি; বাকি সমস্তটুকুই আকাঙ্ক্ষা, যা ভবিষ্যৎকালে পূর্ণ হবে বলে তাঁর আশা। সে আশা পূর্ণ হয়েছিল কি? বিশ্বাসে জোড়া লেগেছিল কি? বোধহয় কোনোদিনই লাগেনি। ১৯১৯ সালে প্রগাঢ় গীতা-গান্ধিজী এবং চিন্তরঞ্জন দাশ উভয়েই যেভাবে সরকারি দমননীতির কেজো পোহাই জালিয়ানওয়ালাবাগ-হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ থেকে বিরত থাকেন, সেটা হতবাক করে রাজা থেকে খেজুর অবসৃত কবি রবীন্দ্রনাথকে। চিন্তরঞ্জন দাশকে তিনি এমন প্রস্তাবও দিয়েছিলেন যে সময়লানে প্রতিবাদ সভা ডাকা হোক, রবীন্দ্রনাথ নিজে সভাপতিত্ব করবেন। তিনি জানতে সেটা করলে কারাবাস অবধারিত। তবু রাজনীতি-জগতের ভবি ভোলেননি। নিঃফলাকাজ্জ্বলীনতার আদর্শকে কত সুবিধাবাদী রূপ দেওয়া যায়, তার এই করুণ পরিচয় প্রতিবাদে উদ্ভুদ্ধ করেছিল কবিকে।

তাই ১৯০৮ সালে গীতা সঙ্ঘে ব্যক্ত সংশয় যে অন্তর্বর্তী ভক্তিপূর্ব পেরিয়ে ১৯৩২ আরো তীক্ষ্ণ, আরো দ্বিধাহীন বিক্রমবর্ষা ভাষ্যরূপ নিয়ে ফিরে আসবে, তার মধ্যে আশা কিছু নেই। ইরানে উড়োজাহাজ থেকে নীচের মানুষদের ওপর ব্রিটিশ বোম্বার্লর 'এফিশিয়েন্ট বোম্বার্লিং নির্বিকার অমানবিকতার কথা বলার পরেই তিনি বলেন—

গীতায় প্রচারিত তত্ত্বোপদেশও এই রকমের উড়ো জাহাজ — অর্জুনের কৃপাকাতর মন সে এমন দুরলোকে নিয়ে গেল, সেখানে থেকে দেখলে মারেই বা কে, মারেই-বা কে, কেই আপন, কেই-বা পর। বাস্তবকে আবৃত করবার এমন অনেক তত্ত্বনির্মিত উড়োজাহাজ মানুষের অন্ত্রশালায় আছে, মানুষের সাম্রাজ্যনীতিতে, সমাজনীতিতে, ধর্মনীতিতে। সেখান থেকে যাদের উপর মার নামে তাদের সম্বন্ধে সান্তনাবাক্য এই যে, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

স্পষ্টত, সরল কোন নয়, সুস্থ এমনকি কখনো কখনো রীতিমতো স্থূল কোণ থেকে গীতার দর্শনকে বিচার করার এই ধারাটা তাঁর মনের গহনে বরাবরই রয়ে গিয়েছিল। তবু হিন্দু দার্শনিক প্রণবর সারাংশের বলে যা বহুজনমান্য, তাকে নিছক বোমা-ক্রিষ্টদের মন ভোলা 'সান্তনাবাক্য' বলেন তিনি। বোম্বার্লদের মানবিকতা-বিজ্ঞিন্ন নির্লিপ্ততার তত্ত্ব আখ্যা দেওয়া ফলত যেচে ধর্মপ্রান হিন্দু ভারতবাসীর দেওয়া কলঙ্ক মাথা পেতে নিতে এতটুকু বিধাযিত তাঁর মন।

পরিচয় :-

- ১) নরেশ গুহ, সম্পা, কবির চিঠি কবিকে, প্যাপিরাস, কলকাতা ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ৫২।
- ২) নরেশ গুহ, সম্পা, প্রমথ চৌধুরীকে লেখা অমিয় চক্রবর্তীর পত্রাবলী, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ২০০০, পৃষ্ঠা ৩৩।
- ৩) ঐ, পৃষ্ঠা ৩২।
- ৪) রবীন্দ্র রচনাবলী, শতবার্ষিকী সংস্করণ, প ব সরকার, ১০৭৫৪।
- ৫) জে ডি বার্গাল, ইতিহাসে বিজ্ঞান (অনু. আশীষ লাহিড়ী), আনন্দ, কলকাতা ২০০৫, পৃষ্ঠা ৪৭২।
- ৬) রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী (সম্পা), ভক্ত ও কবি অজিতকুমার চক্রবর্তী-রবীন্দ্রনাথ পত্রবিনিময়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ২০০৭, পৃষ্ঠা ২৪।
- ৭) রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী (সম্পা), ভক্ত ও কবি পৃষ্ঠা ৬২।
- ৮) অরবিন্দ পোদ্দার, রবীন্দ্রনাথ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, প্রত্যয় (১৯৮২), কলকাতা ২০১২, পৃষ্ঠা ১৪০।
- ৯) রবীন্দ্র রচনাবলী, ১১৬০২-৩।
- ১০) রবীন্দ্র রচনাবলী, ১১৬০৬।
- ১১) রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০৭৫৪।

বিবেকানন্দর আর্থভাবনা

কনিষ্ঠ চৌধুরী

(১)

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে প্রায় সারা ভারতে হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী একটি শক্তিশালী প্রবাহের আবির্ভাব ঘটেছিল। ভারতের রাজধানী কলকাতাও তার থেকে মুক্ত ছিল না। ভূদেব-বঙ্কিমের পাশাপাশি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভূমিকাটি ছিল গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। বৈষ্ণব ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, আর্থধর্ম, ভারতীয়ত্ব নিয়ে যে উন্মাদনার আবির্ভাব ঘটেছিল উনিশ শতাব্দীর বাহিরে তার অন্যতম প্রধান কারিগর ছিলেন দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮১৪-১৮৮৩)। সারা জীবন ধরে তিনি বৈদিক হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেছিলেন। পাশ্চাত্য প্রভাবের তীব্র ছিলেন তীব্র বিরোধী। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'আর্থসমাজ'—এর লক্ষ্যই ছিল বৈদিক সমাজে প্রত্যাবর্তন। এ ছিল ইতিহাসের দিক থেকে পিছু হটা। বিবেকানন্দের চলাচল ছিল এপথেই। যদিও তার কথা কিস্কিৎ ভিন্ন ভঙ্গীমায়। কিন্তু মূল ভাবনাটি প্রায় একই রকম অর্থাৎ আর্থ ধর্ম ও জাতি শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন।

বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে 'ভারতের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক বক্তৃতায় বলেছিলেন, "সমগ্র ভারত আর্থময়, এখানে অপর কোনো জাতি নেই।" (২০১২:৫:১৪৫)। শুধু এইটুকু বলে যদি ধামতেন, তাহলে সমস্যাটা অপেক্ষাকৃত কম হত। কিন্তু তিনি তা না করে আরও বহু কথা বহু স্থানে বলেছেন, যা জন্ম দিয়েছে বহুবিধ সমস্যার, অকারণ জটিলতার এবং অবশ্যই অস্বিরোধিতার। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশিত হয়েছে।

১) আর্থগণ (জাতি অর্থে) বহিরাগত। (২০১২:৪:২০১)।

২) আর্থগণ (জাতি অর্থে) বহিরাগত নয়, ভারতের আদি বাসিন্দা। (২০১২:৬:১৬৪)

৩) আর্থরা বহিরাগত না ভারতের আদি বাসিন্দা তা জানা আর সম্ভব নয়।

(২০১২:৬:২৪)। তা জানা না গেলেও কোন ক্ষতি নেই কারণ ভারতবাসী প্রকৃত অর্থেই আর্থ। এখানে আর্থ ছাড়া অন্য কোন জাতি নেই। (২০১২:৫:১৪৫)।

(২)

বিবেকানন্দর এই ধারণা গড়ে ওঠার একটা প্রেক্ষাপট আছে। তাঁর আর্থভাবনার শিকড়টি রয়েছে উনিশ শতকে 'প্রাচ্যদেশীয় নবজাগরণ' এবং ভারতীয় দ্বিখন্ডিত সংস্কৃতি, রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক ভাবধারার মধ্যে। আঠারো শতকের শেষের দিকে বঙ্গদেশ সহ গোটা ভারতে ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানির ঔপনিবেশিক আধিপত্য স্থাপনের কাজটি যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে শুরু হওয়ায় কোম্পানির অফিসার (শাসক) দের প্রয়োজন পড়েছিল ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির

অনুসন্ধান ও চর্চা। এর পিছনে কারণগুলি হল : প্রথমত, প্রায় অজ্ঞাত এই সভ্যতার শাসক হিসাবে শাসিতদের সংস্কৃতি জানার কৌতূহল। দ্বিতীয়ত, ঔপনিবেশের ইতিহাস না জানা থাকলে সমাজের উপর দৃঢ় আধিপত্য স্থাপন করা কঠিন। তাই সেখানকার ইতিহাস যেমন জানতে হবে তেমনি ইতিহাস খুঁজে বের করে নিজেনের প্রয়োজন মতো গড়ে নিতে হবে। আরও সুস্পষ্টভাবে সাহাজ্যবিস্তারের হাতিয়ার হিসাবে প্রয়োজন পড়লো ঔপনিবেশিক সমাজকে জানার, ইতিহাস চর্চা করার।

টীকা : ১। উনিশ শতকে সমগ্র ইউরোপে এক দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে প্রাচ্যকে জানতে পারলে পুনরায় এক নবজাগরণের ঢেউ আসবে এবং নবজাগরণের সে জানে নব দিশা উন্মোচিত হবে।

Scholar, R. 1984 (translated). *The Oriental Renaissance : Europe's Rediscovery of India and the East, 1680-1880*. New York : Columbia University Press.

থাপার কর্তৃক উল্লেখিত, থাপার, রেমিলা, 2011:5

এইভাবে জ্ঞান নিরূপিত হল ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে। (থাপার, ২০১১:৩)।

প্রাচ্য সংক্রান্ত এই আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পায় যখন আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের শুরুতে একগুচ্ছ প্রাচ্য গবেষণা ও অনুবাদ গ্রন্থ ইউরোপীয় চিন্তাবিদদের হাতে পৌঁছায়। শুরুতেই যার নাম করতে হয় তিনি হলেন উইলিয়াম জোন্স (১৭৪৬-১৭৯৪)। ষোলো শতকের এক ইতালীয় বণিক ফিলিপ সাসেটি দাবী করেন যে, সংস্কৃত ও ইউরোপের কয়েকটি ভাষার মধ্যে বেশ কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। (থাপার, ২০১১:৩)। এই জাতীয় দাবী উইলিয়াম জোন্স ও তাঁর সহযোগীদের যথেষ্ট উৎসাহিত করে। উইলিয়াম জোন্স লক্ষ্য করেছিলেন যে গ্রীক-রোমান দেব-দেবীদের সাথে হিন্দু দেব-দেবীদের এক সমান্তরাল সম্পর্ক রয়েছে। এই পর্যবেক্ষণ বাইবেল ও হিন্দু পৌরাণিক আখ্যানের এক তুলনামূলক আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। তিনি গুরুত্ব দিতে শুরু করেন বিভিন্ন ভাষার তুলনামূলক পাঠের উপর। এই প্রসঙ্গে জোন্স যে সিদ্ধান্তে আসেন তা হল: "সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনত্ব যাই হোক না কেন সংস্কৃতের গঠন অপূর্ব, গ্রিক ভাষার তুলনায় সংস্কৃত অনেক বেশি নিখুঁত, ল্যাটিনের চেয়ে শব্দ প্রাচুর্য অনেক বেশি, আর এই দুই ভাষার চেয়েও পরিশীলিত। তবুও ক্রিম্যার মূল ও ব্যাকরণগত গঠনের ক্ষেত্রে দুটি ভাষার সঙ্গেই সংস্কৃতের এমন গভীর সাদৃশ্য বর্তমানে এতটাই তীব্র যে এরা এমন কোনো সাধারণ উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছে তা সম্ভবত এখন যার আর অস্তিত্ব নেই—একথা বিশ্বাস না করে কোনো ভাষাতাত্ত্বিকের পক্ষে এই তিন ভাষার বিচার করা সম্ভব নয়। এতটা জোরালো না হলেও একই কারণে অনুমান করা যায় গথিক ও কেন্টিক ভাষার ভিন্নরীতির বাক-ধারার সংমিশ্রণ ঘটলেও উভয়ের উৎস সংস্কৃতের সঙ্গে অভিন্ন। যদি

পারসিকের প্রাচীনত্ব সম্পর্কিত কোনো কোনো প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হয়, তবে প্রাচীন পারসিকের একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।” (জোপ। ২০১১:২৭)।

বিভিন্ন ভাষার এই তুলনামূলক আলোচনা ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভাষাতত্ত্বের ক্রমবিকাশ ঘটায়। উনিশ শতকের শুরুতেই বৈদিক ধর্মগ্রন্থগুলি ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের হাতে আসতে শুরু করে। এর ফলে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চা আরও উৎসাহিত হয়। এই ভাষাতত্ত্ব চর্চার মধ্যে দিয়ে পণ্ডিতবর্গ যে ধারণায় পৌছাতে চেষ্টা করেন তা হল— এই ভাষাগুলি (সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন, পারসিক) একটি আদিভাষা সজ্জাত। এই ধারণার প্রচেষ্টা তাঁদের আবার জাতি ধারণা গঠনের দিকে প্রানীত করেছিল। অর্থাৎ ভাষাতাত্ত্বিক চর্চার অঙ্গনে ‘আর্য’ শব্দটির বহুল ব্যবহার জাতি ধারণার সাথে সংযুক্তির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। “ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে উদ্ভূত অন্য ভাষা যে সব গোষ্ঠীর কথা ভাষা তাদের প্রথম দিকে অন্য নামকরণ হলেও ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ‘আর্য’ নামে অভিহিত করাই যুক্তি সংগত বলে মনে হয়। ... ভাষাতাত্ত্বিকদের কাছে ‘আর্য’ একপ্রকার ভাষা এবং এর অর্থ ‘An Aryan-Speaking Person’ অথবা ‘আর্যভাষার কথা বলতে অভ্যস্ত ব্যক্তি’ (ধাপার। ২০১১:৫)। ‘আর্য’ শব্দটির ক্রমাগত ব্যবহার পরবর্তীকালে জাতি ধারণার সাথে সংযুক্ত হয়ে পড়ে।

উনিশ শতকে ইউরোপে বিশেষ করে জার্মানীতে নিজেদের উৎস ও আত্মপরিচয় জানার জন্যে এক ধরনের আগ্রহ তৈরী হয়। এই আগ্রহ জন্ম দেয় ‘আর্য ভাষা’ থেকে ‘আর্য জাতি’র ধারণার রূপান্তর। আর্যগণকে দুইভাগে বিভক্ত করা হল— এশিয় এবং ইউরোপীয়। এশিয় আর্যগণের আদি বাসভূমি যেমন মধ্য এশিয়া, তেমনি ইউরোপীয় আর্যগণের উদ্ভব উত্তর ইউরোপে (ধাপার। ২০১১:৭)।

ভারতীয় আর্য ধারণা গঠনের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ চিন্তাবিদ ম্যাক্স মুলারের (১৮২০-১৯০০) একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। তিনি বৈদিক সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে ভারতীয় সভ্যতাকে বিচার করেছিলেন। তাঁর মতে, ঋগ্বেদ ছিল ইন্দো-ইউরোপীয়দের প্রাচীনতম স্তর এবং তাই পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম সাহিত্য (পূর্বোক্ত : ৪)। তাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী, আর্যদের আদি বাসভূমি ছিল মধ্য এশিয়ার কোন স্থানে, যেখান থেকে আর্যভাষী মানব গোষ্ঠী দুই দিকে ছড়িয়ে যায় (Max Muller. 1862, 1883, 1888)। এদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী ইউরোপে পৌছায় এবং অন্য আর একটি গোষ্ঠী চলে যায় ইরানে। এই ইরানীয় গোষ্ঠীর বিভাজিত একটি অংশ আবার ভারতে আগমন করে। ম্যাক্স মুলার এইভাবে ভাষা ও জাতির সমীকরণ করে, শেষ পর্যন্ত বাংলাকে আর্যভাষা এবং বাঙালীদের আর্য বলেও দাবী করেন। ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে রামমোহন রায় সম্পর্কে তিনি বলেছেন, “রামমোহন রায় আর্যজাতির দক্ষিণপূর্ব শাখার মানুষ এবং

আর্যভাষা বাংলা, তাঁর মাতৃভাষা... রামমোহন রায়ের ইংল্যান্ডে অভ্যাগমন যেন আর্যজাতির দুই মহৎ শাখার মধ্যে মিলন ঘটাল, যারা নিজেদের এক উৎস, এক ভাষা, এবং এক বিশ্বাস ভূলে এককাল পৃথকভাবে কাটিয়েছে (ম্যাক্স মুলার ১৮৮৪:১১)।

ইউরোপে আর্য উৎপত্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করার ফলে ইউরোপীয় ও ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যবর্তী সেমিটিক জাতিগোষ্ঠীর মানুষ ও তাদের ভাষা ব্যতিল হয়ে যায়। ম্যাক্স মুলারের মতে, ভারতীয় সভ্যতার গঠন প্রক্রিয়ায় সেমিটিক জাতির বহির্ভূত হওয়ার অর্থ পরবর্তীকালে ইসলামীয় প্রভাবের অন্তর্ভুক্তি না হওয়া। ম্যাক্স মুলার ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনকে অত্যাচারী বলে বর্ণনা করলেও কেন যে এই শাসন অত্যাচারী তার কোন ব্যাখ্যা দেন নি। কিন্তু তাঁর এই উক্তি প্রায়শ ব্রিটিশ পণ্ডিতবর্গ ব্যবহার করতেন। তারা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন যে, নিপীড়নকারী মুসলিম শাসনের হাত থেকে হিন্দুগণ যে রেহাই পেয়েছে এবং পরিবর্তে হিতৈষী ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষে স্থান করে নিয়েছে সে জন্য আশা করা যায় হিন্দুরা তাঁদের উপযুক্ত সমঝদার হবে (এলিয়ট এবং ডসন I, xxii)। এই তত্ত্বের প্রেক্ষাপটে ভাষা ও জাতির সমীকরণ মূলত দারী। আর্যদের জয়লাভের অর্থ একদিকে যেমন ইন্দো-আর্য ভাষার জয়, তেমনি অপরদিকে বিশিষ্ট আর্য সভ্যতার সফল অনুপ্রবেশ (ধাপার ২০১১:৯)।

ম্যাক্স মুলারের এই বর্হিদেশীয় জাতিতত্ত্বকে কেশবচন্দ্র সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, বালগঙ্গাধর তিলক, ভূদেব মুখোপাধ্যায় আর্যধারণা গ্রহণ করেছিলেন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। কেশবচন্দ্র সেন একসময় মন্তব্য করেছিলেন যে, “...ইংরাজ জাতির ভারতবর্ষে আগমনের ফলে আমরা যেন দুই বিচ্ছিন্ন ভ্রাতার মিলন দেখতে পাই, যারা সুপ্রাচীন আর্যজাতির অন্তর্গত দুই পৃথক পরিবারের উত্তরাধিকার” (ধাপার কর্তৃক উদ্ধৃত ২০১১:১৪)। উপনিবেশিকগণ ও ভারতীয় সমাজে উচ্চকোটির মানুষের মধ্যে মৌলিক উৎপত্তির এই তত্ত্ব এক দৃঢ় সংযোগ স্থাপন করে।

বালগঙ্গাধর তিলক ম্যাক্স মুলারের উপর যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান হলেও, তিনি ভাষাতত্ত্ব অপেক্ষা জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিলকের দাবী অনুযায়ী, বৈদিক আর্যগণের পূর্বপুরুষগণ এবং বেদ-এর বিষয়বস্তুর উৎপত্তি প্রাচীনকালে খ্রিষ্টপূর্ব ১০,০০০ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৮০০০ অব্দ নাগাদ তাদের আদি বাসভূমি উত্তর মেরু অঞ্চলে। তিলকের এই দাবী সম্পর্কে মাধব এম দেশপাণ্ডের মন্তব্যটি এখানে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ:

“তিলক নির্ণীত বেদ-এর সময়পর্ব এবং বৈদিক আর্যগণের পূর্বপুরুষ বিষয়ক তাঁর মতামত যদি মেনে নেওয়া হয়, তবে এটাও মানতে হবে যে, ইন্দো-আর্য শাখা অপেক্ষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর, সংস্কৃত ব্যতিরেকে, অন্যান্য ভাষা তুলনায় যথেষ্ট নবীন। এই সিদ্ধান্তের ফলে ঔপনিবেশিক পশ্চিমী আর্যগণের ভ্রাতৃত্বরূপ ভারতীয় আর্যগণ যে প্রকৃতপক্ষে তদপেক্ষা

প্রবীন তা প্রমাণিত হয় যা আবার জাতীয় গর্ব বৃদ্ধির সুযোগ দান করে। তিলক কিন্তু কিভাবে ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর সকল ভাষার উৎসস্থল সংস্কৃত ভাষা বলে মনে করেছেন তার কোন সুসংবদ্ধ ব্যাখ্যা দেন নি। স্পষ্টত না জানলেও সমস্ত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে সংস্কৃত ভাষাই যে প্রাচীনতম তা তিলক দাবি করেছেন এবং এর ফলে সংস্কৃত ভাষাই সমস্ত ভাষার সম্ভাব্য জননীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়” (দেশপাণ্ডে ২০১১:৯২)।

উনিশ শতকের শেষভাগে যে জাতীয়তাবাদের আর্থভাব ঘটেছিল, এই দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে তা সুন্দরভাবে খাপ খেয়ে যায়। অর্থাৎ আর্থভাষা থেকে আর্থজাতির সমীকরণ এবং সংস্কৃতকে সমস্তভাষার জননী হিসেবে দেখা। আরও সুনির্দিষ্ট করে বলা যায় যে, উনিশ শতকীয় মধ্যবিস্তৃত শ্রেণীর মধ্যেই এই ভাবনা সবচেয়ে প্রসারিত, বিকশিত ও গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। কারণ তা ছিল তাদের সামাজিক অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। হ্রত সমাজ বদলের স্বপ্নে তারা তাদের আত্ম পরিচয়ের সন্ধান চালিয়েছেন। খুঁজছিলেন তাদের সামাজিক অবস্থানের বৈধতা। এবং তা পেয়েও গেলেন প্রাচীনযুগের ইতিহাসের মধ্যে। দয়ানন্দ সরস্বতী, নারায়ণ পাগবী (১৮৯৩) এবং বিবেকানন্দর রচনায় ও বক্তৃতায় উঠেছিল সুপ্রাচীন অতীতের কথা, আর্থজাতির ভারতীয় উৎস অনুসন্ধান, বৈদিক যুগের গরিমা এবং সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠত্বের কথা।

দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮১৪-১৮৮৩) এই ভাবনা দ্বারা ভাবিত হয়েই তৈরী করলেন ‘আর্থসমাজ’। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বৈদিক সমাজে ফিরে যাওয়া। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দর সাথে তাঁর মতের কিছুটা সাদৃশ্য দেখা যায়। তিনি মনে করতেন বেদ রচয়িতা আর্থগণ তিব্বত থেকে ভারতে এসে পৌঁছায়। বর্তমান উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ হলেন আর্থ। তিনি বিশ্বাস করতেন— বেদ সর্বপ্রকার জ্ঞান, এমন কি আধুনিক বিজ্ঞানেরও জনক। আর্থদের জাতিগত এবং ভাষাগত শুদ্ধতার উপর তিনি বিশেষ জোর দেন এবং আর্থসমাজকে ‘আর্থজাতির সমাজ’ বলে বর্ণনা করেন। আর্থগণ উচ্চবর্ণভূক্ত। দলিতগণ এই ব্যবস্থার অন্তর্গত ছিল না— যদিও তারা চাইলে ‘তচ্ছি’ নামক ক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের উচ্চবর্ণে অন্তর্ভুক্ত করা হত। প্রকৃতপক্ষে এই ‘তচ্ছি’ ক্রিয়ার ভাবনা উচ্চবর্ণের মানুষের ঘৃণার এক বহিঃপ্রকাশমাত্র (খোপার ২০১১:১৪-১৫)।

ভারতে সমস্ত রকমের পাশ্চাত্য প্রভাবের তিনি ছিলেন তীব্র বিরোধী। ব্রাহ্ম আন্দোলনের তিনি তীব্র সমালোচক ছিলেন। কারণ এই আন্দোলনটি ছিল পাশ্চাত্য ধ্যান ধারণার দ্বারা প্রভাবিত। ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষামূলক সাহিত্যে খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, নানক, চৈতন্য এবং মহম্মদের স্থান ছিল। তাঁর মতে— এ সবই ভারতের অর্থাৎ ‘আর্থবর্তের’ ঐতিহ্য বিরোধী।

এই ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিভঙ্গী ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর আধুনিক জ্ঞানচেতনা এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে যে নবতর চেতনার নির্মাণ করে তার প্রতিফলন দেখা যায়

শ্রদ্ধাকের সমসাময়িক নারায়ণ পাগবীর রচনায়। তিলক যখন বৈদিক আর্থগণের আদিবাসভূমি আর্কটিক বা উত্তর মেরু অঞ্চলে বলে দাবী করেছেন, তখন পাগবী দাবী করেছেন, আর্থগণের আদি বাসস্থান ছিল আর্থবর্তেই— যদিও আর্থবর্তে বসবাসকারী আর্থগণের একটি শাখা সুমেরু অঞ্চলে অভিবাসন করলেও শেবাধি তারা পুনরায় ভারতে প্রত্যাবর্তন করে বলে তিনি মনে করতেন। আর্থবর্তই আর্থগণের আদিবাসভূমি— এই বিশ্বাসে পাগবী, আর্থগণ যে ভারতে বহিরাগত জাতি সে ধারণার বিপক্ষে সওয়াল করেন। তাই স্বাভাবিক ভাবেই তিনি দাবী করেন যে, আর্থবর্ত থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আর্থগণ ছড়িয়ে পড়ে এবং তাই সংস্কৃত ভাষাই পৃথিবীর সমস্ত ভাষার মাতৃস্বরূপ।

পাগবীর ‘ভারতীয় সাম্রাজ্য’ (১৮৯৩) নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় বন্ধ হল ‘দ্য আর্থান পিপল অ্যান্ড দ্য ওয়েলথ অফ দেয়ার ইনটেলিজেন্স’। এই রচনায় তিনি দাবী করেন যে, মনুষ্য প্রজাতির সর্বপ্রধান গ্রন্থ হল বেদ এবং শুধু আর্থগণের নয়, উত্তর ভারতে যে সমগ্র মনুষ্য প্রজাতির আদিবাসভূমি ছিল, বেদ সেই ধারণাকে পুষ্ট করে (পাগবী ১৮৯৩:২। দেশপাণ্ডে কর্তৃক উদ্ধৃত ২০১১:৯৩)। ‘ভারতীয় সাম্রাজ্য’ (১৯০০)-র নবম খণ্ডে তিনি ঘোষণা করেন, ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে আর্থবর্তই হল সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তিস্থল এবং সংস্কৃতই সমস্ত আর্থভাষার মাতৃস্বরূপ। সমস্ত ভাষা, যথা— মারাতী, হিন্দি, বাংলা, গুজরাতি, ইরানীয়, গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান, ইংরাজী ও পোলিশ ভাষার জন্ম সংস্কৃত ভাষা থেকে (পাগবী, ১৯০০:১৪। দেশপাণ্ডে কর্তৃক উদ্ধৃত ২০১১:৯৪)। তিনি দেখান যে, প্রকৃত আর্থগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা নিজস্ব ধর্ম ও জাতি ত্যাগপূর্বক আদি বাসভূমি ছেড়ে চলে যায়, যার ফলে আর্থভাষার বিভিন্ন শাখার উৎপত্তি ঘটে (পূর্বোক্ত: ১৬, পূর্বোক্ত: ৯৪)। লক্ষ্য করার বিষয় হলো, তাঁর এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি কোন ভাষা বা প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনা বা গবেষণা নয়, বরং তিনি প্রায় সম্পূর্ণভাবেই স্মৃতি ও পুরাণের উপর নির্ভর করেছিলেন।

১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে মাদাম ব্রুভাঙ্কি ও কর্ণেল ওলকট ‘থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি’র প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রুভাঙ্কি ও ওলকট আর্থ শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা প্রচার করার পাশাপাশি এটাও বলতে থাকেন যে, আর্থগণ হল আধুনিক হিন্দুদের পূর্বপুরুষ, ভারতবর্ষের দেশজ মানুষ এবং ইউরোপীয় সভ্যতার জনক (খোপার ২০১১:১৫)। ভারতবর্ষ সম্পর্কে এই ধারণা জার্মান রোমানটিসিজমের প্রাথমিক চিন্তার ফসল। একদিকে প্রাচ্য ধর্মের এক বলয় এবং অন্যদিকে তার সঙ্গে ভারতীয় ধর্মচেতনা ও ইউরোপের বস্তুবাদের মধ্যের দোলাচল এই অধ্যাদ্বন্দ্ব বা থিয়োসফির উত্থানে সহায়ক হয় (পূর্বোক্ত)।

এইভাবে আত্মপরিচয় বোঝার প্রচেষ্টাটি আর্থ খাপামির কানাগলিতে হারিয়ে যায়। ভাষা গোষ্ঠীকে ব্রাহ্মভাবে উপজাতি হিসেবে চিহ্নিত করা এবং প্রাচীন ভারত সম্পর্কে বিশেষ করে

দেশ ও সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে মোহাম্মদ জাতীয়তাবাদের ধারণার সার্থে মিলেমিশে এক বিচিত্র ধারণার জন্ম দেয়। যাকে সুদীর্ঘ কুমার আবামি বলে চিহ্নিত করেছিলেন। এ যাপানি থেকে কেশব সেনের মত বিবেকানন্দও মুক্ত হতে পারেননি। আর তার ফলে বিবেকানন্দ পাগবীর মতই আর্থদের নেশজ বলে চিহ্নিত করেছিলেন এবং বেলকে আমি সাহিত্যের শিরোপা দিয়েছিলেন। এই সিদ্ধান্ত ও ধারণাগুলির পিছনে কেন ভাবতাত্ত্বিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রশ্ন উপস্থিত করার তাগিদ বিবেকানন্দ অনুভব করেননি। পাগবীর মতই তার ব্যাখ্যা বিশেষণে বেল, পুরাণ, স্মৃতি ইত্যাদিই ছিল একমাত্র উৎস। বিবর্তিত বস্তু সময়ে উপস্থিত হবে। উনিশ শতকের বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) ম্যাক্স মুলারকে অনুসরণ করে আর্থজাতির আদি নিবাস, ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তা এইরকম:

“প্রথমতঃ, আর্থ্য জাতিদের দুইটি প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি ভারতবর্ষভিত্তিযুগে, অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্বে দিকে এবং আর একটি ইউরোপের অভিমুখে অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম দিকে। এই দুইটি প্রবাহের সংযোগস্থল, আসিয়া [এশিয়া] মহাদেশ।”

“দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীনতম কালের সভ্যদেশসমূহ আসিয়া [এশিয়া] খন্ডেই অবস্থিত। আর্থ্য ভাষাসমূহের মধ্যে যথেষ্টের ভাষাই সর্বাধিক প্রাচীনতম। সুতরাং আসিয়া [এশিয়া] যত্নের মধ্যে, এবং স্বদেশের জন্মস্থান পঞ্জাব প্রদেশ হইতে অনতিদূরে কেনও প্রদেশে আর্থজাতির আদিম বাসস্থান হওয়াই সম্ভব।”

“তৃতীয়তঃ, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে মধ্য আসিয়া [এশিয়া] হইতে যার বার অনেক পরাক্রম জাতি উদ্ভূত হইয়া ইউরোপ মহাদেশে আক্রমণ করিয়া ফেলে। দ্বিতীয় চতুর্দশ শতাব্দীর হুণজাতি ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মোংগল জাতি তাহার উদাহরণ স্থল। অতএব, প্রাচীনকালেও আর্থগণ মধ্য আসিয়া [এশিয়া] হইতে উদ্ভূত হইয়া ইউরোপ বিজয় করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয়।”

“চতুর্থতঃ, যদি ইউরোপ, বিশেষতঃ স্ক্যান্ডিনেভিয়া হইতে আর্থজাতির উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে, আর্থ্য ভাষাসমূহের সমুদ্র সঞ্চরীর বহুসংখ্যক সাধারণ শব্দ পাওয়া হইত। এই সকল ভাষায় পশ্চিমবিশেষ বা পাকিস্থিবেশ সাধারণ নাম যাওয়া যায়, কিন্তু এই সকল ভাষায় সমুদ্র বা জলচর জীবের সাধারণ নাম যাওয়া যায় না।” (দত্ত, রমেশচন্দ্র, ২০০১: ৫২)

ম্যাক্স মুলারের এই ভাষা ও জাতিবেদ এক করে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিটি রমেশচন্দ্র দত্ত গ্রহণ করলেও, প্রাচীন বৈদিক আর্থদের সম্পর্কে তিনি কোন দৃষ্টান্ত না দেখিয়ে জড়িয়ে পড়েননি বা

আবেগ দ্বারা পরিচালিত হয়ে প্রাচীন অতীত ইতিহাস চর্চা করেননি। এখানেই বিবেকানন্দের সাথে তাঁর চিন্তাগত পার্থক্য। রমেশচন্দ্র দত্ত ভারত ইতিহাসচর্চা করেছিলেন যুক্তিবাদের ভিত্তিতে, নিম্নোক্তভাবে। এখানেই তাঁর কাজের সার্বজনীন ও সাফল্য। যদিও বেশ কিছু ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্তগুলি ঐতিহাসিক কালগত কারণে সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ তখনও মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার উৎখান হয়নি। প্রাগর্ভ এই সভ্যতার অবিস্মার ভারতের ইতিহাস চর্চায় এক নতুন দিশ উন্মোচিত হয়। রমেশচন্দ্র দত্তের যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর উপর ভরসা রেখে বলা যায় যে, তাঁর সময়ের মধ্যে কিছু সভ্যতার অবিস্মার সম্ভব হলে, তাঁর চর্চা আরও বেশি সম্পূর্ণতা লাভ করতো।

উনিশ শতকের এই আর্থ ধারণা উন্নত হিন্দু জাতীয়তাবাদের বনিয়াদ হিসেবে কাজ করেছিল। এই ধারণাকে কেন্দ্র করে আর্থজাতি ধারণাটি এক ধরনের গোড়ামি পূর্ণ চিন্তাধারা। যার হাত ধরেই পরবর্তীকালে যে জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয় সেখানে হিন্দু ছাড়া বাকী সকলের ক্ষেত্রেই চলে exclusion প্রক্রিয়া। যা সেকুলার জাতীয়তাবাদ পাড়ে তাঁর ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুি, বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, তিলক, অরবিন্দ প্রমুখ হলেন এর প্রধান করিগর। এই পর্বের আর্থ ধারণা সংক্রান্ত গোড়ামির সমালোচনা করে সুদীর্ঘ কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন:—

“আমাদের দেশের একটি বিশিষ্ট মত যা শিক্ষিত, অর্থ-শিক্ষিত অধিকাংশ লোককে অভিভূত করে আছে, সেটার নাম দেওয়া হয়েছে ‘আর্থ্যমি’, এই জিনিসটি অতি হালের, গত শতাব্দীর [ভিনিশ শতকে] ভাবতত্ত্ব আর প্রকৃততত্ত্ব আলোচনার এর উদ্ভব, রাজার জাতের সঙ্গে জাতিতত্ত্ব কল্পনার পূর্বে, পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে সাফল্য লাভের আশায় এর প্রসার।... আমাদের হিন্দু সভ্যতায় যে একটা মিশ্র ব্যাপার, তা সর্ববাসিন্দুত্ব। নামের মোহে পড়ে হিন্দু সভ্যতা গড়তে অন্যের সাহায্যকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করলে চলবে না। রামেশচন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীরা এই প্রকার বিচারের সারবত্তা যথার্থ উপলব্ধি করেছেন।” (২০০৪: ৭)। রবীন্দ্রনাথ এই ‘আর্থ্যমি’র ধারণা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। ‘রামেশী সমাজ’-এ তিনি লিখেছেন: “ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াই আর্থগণের সহিত এখানকার আদিম অধিবাসীদের তুমুল বিরোধ বধিয়াছিল। এই বিরোধে আর্থগণ জয়ী হইলেন, কিন্তু অন্যের আদিম অস্ট্রেলিয়ান বা আমেরিকান গণের মতো উৎসাহিত হইল না; তাহারা আর্থ উপনিবেশ হইতে বহিষ্কৃত হইল না; তাহারা আপনাদের আচার বিচারের সমস্ত পার্থক্য সাথেও একটি সমাজতন্ত্রের [সমাজব্যবস্থা] মধ্যে স্থান পাইল। তাহাদিগকে লইয়া আর্থ সমাজ বিচিত্র হইল।” (রামেশচন্দ্র, ১৯০২ বাংলা, ২: ৬৩৮.)

ভারতীয় ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ ও সভ্যতা যে আর্থ ও অন্যের মিশ্রণের ফল— রবীন্দ্রনাথ তা দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করেছেন। এবং এরই পাশাপাশি ‘আর্থ্যমি’ সম্পর্কে শ্রোতাদের সূত্রে বলেছেন:

“সেই প্রকল বেগবান সভ্যতাকে আজ আমরা নিতান্ত নিরীহ নির্বিরোধ নির্ভিকার নিরাপদ

নির্জীবভাবে কল্পনা করে নিয়ে বলছি, আমরা সেই সভ্যজাতি, আমরা সেই আধ্যাত্মিক আর্থ, আমরা কেবল জপতপ করব, মলাদলি করব; সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করে, বিভিন্ন জাতিকে অস্পৃশ্য শ্রেণীভুক্ত করে, আমরা সেই মহৎ প্রাচীন হিন্দুনােমের সার্থকতা সাধন করব।” (রচনাবলী, ১৪০২ বাংলা ২:৫০৭)।

মাত্র ২৭ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন—

মোক্ষমূলার বলেছে, ‘আর্থ’

সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য,

মোরা বলে করেছে ধর্ম,

আরামে পড়েছি শুয়ে।

মনু নাকি ছিল আধ্যাত্মিক

আমরাও তাই, করিয়াছি ঠিক,

এ যে নাহি বলে দিক্ তারে দিক্

শাপ দিই পহিতে ছুয়ে।

বঙ্গবীর, ১৮৮৮।

‘আর্থ’ সম্পর্কে উনিশ শতকীর ভাবনাটি কিভাবে ভাষা থেকে জাতি ধারণায় পৌঁছালে এবং জাতীয়তাবাদের সাথে যুক্ত হয়ে কিভাবে একটি উদ্ভাদনা বা ব্যাপামিতে পরিণত হল তারই একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এখানে উপস্থিত করা হল। এবার দেখা হবে ‘আর্থ’ সম্পর্কে বিবেকানন্দের মতটি ঠিক কি ছিল।

(৩)

‘আর্থ ব্যাপামির’ জন্মদাতা ম্যাক্স মুলার সম্পর্কে বিবেকানন্দ বিরট শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করতেন। ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে বিবেকানন্দ ম্যাক্স মুলার সম্পর্কে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করে লিখেছেন, “অধ্যাপক ম্যাক্স মুলার একজন অসাধারণ ব্যক্তি। ... আমি তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে গিয়াছিলাম” (২০১২:১০:১১৪)। “ভারতের উপর তাঁহার কী অনুরাগ! যদি আমার সে অনুরাগের শতাংশের একাংশও থাকিত, তাহা হইলে আমি ধন্য হইতাম। এই অসাধারণ মনবী পঞ্চাশ বা ততোধিক বৎসর ধরিয়া ভারতীয় চিন্তা রাজ্যে বাস ও বিচরণ করিয়াছেন, পরম আগ্রহ ও হৃদয়ের ভালবাসার সহিত সংস্কৃত সাহিত্যরূপ অনন্ত অরশ্যের আলো ও ছায়ার বিনিময় পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, শেষে ঐ সকল তাঁহার হৃদয়ে বসিয়া গিয়াছে এবং তাঁহার সমগ্র সত্য উহার রঙ ধরিয়া দিয়াছে” (পূর্বোক্ত:১১৫)। বিবেকানন্দ যদি এইটুকু বলে ধামতেন তাহলেও তার একটা অর্থ দাঁড়াতে। ম্যাক্স মুলার বিবেকানন্দের গুরু রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী সম্পর্কে বই লিখেছেন। ম্যাক্স মুলারের বইটিই

১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন—

এই প্রবন্ধেই (ভারত বন্ধু অধ্যাপক ম্যাক্স মুলার, ১৮৯৬) তিনি ম্যাক্স মুলারকে বেদান্তে বিশ্বাসী একজন হিসাবে ঘোষণা করেছেন। তাঁর ভাষায়: “ম্যাক্স মুলার একজন যোর বৈপ্লবিক। তিনি ব্যক্তিবিকি বেদান্ত-রূপ রাগিনীর নানা স্বর বিস্তারের ভিতর প্রধান সুরটিকে ধরিয়াছেন” (পূর্বোক্ত:১১৫)। ১৮৯৫-এর মে মাসে ম্যাক্স মুলার সম্পর্কে এতটা উচ্ছাস তাঁর ছিল না। কারণ সে সময়ে ম্যাক্স মুলার রামকৃষ্ণের উপর কোন বই বা প্রবন্ধ লেখেননি। তাছাড়া বিবেকানন্দের সাথেও তাঁর তখনও ব্যক্তিগত পরিচয় হয় নি। তাই বিবেকানন্দ হেল ভাগ্নীগণকে চিঠিতে দ্বিধাহীনভাবে লিখতে পারেন: “অধ্যাপক ম্যাক্স মুলার তাঁর হিন্দু ধর্ম বিষয়ক রচনা সমূহের শেষভাগে ক্ষতিকর একটি মন্তব্য না দিয়ে ক্ষান্ত হন না” (১৯৭৭:৩২৯)। কয়েকমাসের মধ্যেই ম্যাক্স মুলারের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত আলাপ হওয়ায়, বিবেকানন্দ তাঁকে ‘ক্ষয়িকর লোক’ বর্ণনা করেছেন (১৯৭৭:৪৫৯)।

যাইহোক, এটা স্পষ্ট যে তিনি ম্যাক্স মুলারের রচনাবলী এবং মতের সাথে যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন। এবং তিনি যে ম্যাক্স মুলারের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন, সেটা তাঁর ভাবনাটি আলোচনা করলেই বোঝা যায়। ম্যাক্স মুলারের আর্থডাক্স ও জাতির সমীকরণ তিনি প্রায় অন্ধভাবে গ্রহণ করলেও, স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গীতে প্রয়োজনের অগিদে সে ধারণাকেও পরিত্যাগ করেছেন। নিজের মতো করে আর্থ ধারণাটিকে গড়ে তোলেন। এ ধারণার পিছনে ভাষাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের সমর্থন থাক বা না থাক তাতে কিছু আসে যায় না।

ম্যাক্স মুলারের মতো বিবেকানন্দ আর্থ ভাষা-গোষ্ঠীর মানুষকে জাতি হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। অতঃপর তিনি আরও চরম ও উগ্র সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর কাছে ‘পৃথিবীর ইতিহাসের প্রাচীনতম জাতি হল আর্থ। শুধু তাই নয়, এই আর্থরা হল ‘ভারতীয় আর্থ’ (২০১২:১০:৬২)। বিবেকানন্দের এই মন্তব্য থেকে তিনটি বিষয় নিঃসৃত হয়:

১) আর্থ ভাষাগোষ্ঠী ও আর্থ জাতির মধ্যে সমীকরণ করা হল।

২) ভারতীয় আর্থ বলতে তিনি হিন্দুদের পূর্বপুরুষকেই বুঝিয়েছেন।

৩) ভারতীয় আর্থগণ (বা হিন্দুগণ) হলেন পৃথিবীর ইতিহাসে আবির্ভূত জাতি সমূহের মধ্যে প্রাচীনতম।

বিবেকানন্দ যে ম্যাক্স মুলারের ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আর্থ ভাষা ও আর্থ জাতির সমীকরণকে গ্রহণ করেছিলেন, সেই ম্যাক্স মুলারই ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ভাষা ও জাতির মধ্যকার সম্পর্কে অস্বীকার করেন Auld Lang Syne (1898) নামক রচনায়। তিনি বলেন: “বৈজ্ঞানিক ভাষার জাতি অর্থে আর্থ শব্দের ব্যবহার অনুপযুক্ত। এই শব্দের অর্থ ভাষা এক ভাষা ব্যতিরেকে অন্য কিছুই হতে পারে না” (থাপার কর্তৃক উদ্ধৃত ২০১১:৪)। ম্যাক্স মুলার তাঁর পুরানো মত থেকে সরে এসেছিলেন খানিকটা বাধ্য হয়েই। কারণ তাঁর আর্থ জাতির ধারণা ইউরোপীয় চিন্তাবিদ ও পণ্ডিতদের দ্বারা প্রচলিতভাবে সমালোচিত হয়েছিল। তাই উপায়ান্তর না দেখেই তাঁর এই পশ্চাত্তাপসারণ। বিবেকানন্দ কি ম্যাক্স মুলারের এই মত পরিবর্তন জানতেন না? জানাটাই স্বাভাবিক। কারণ ততদিনে উভয়ের মধ্যে খনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরী হয়ে গেছে। ম্যাক্স মুলারের এই মত পরিবর্তন বিবেকানন্দকে সম্ভবত প্রভাবিত করতে পারেনি। কারণ তিনি আর্থ জাতি সংক্রান্ত ধারণাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন একেবারে সিংহলীদেব দেশে।

বিবেকানন্দের আর্থ ধারণা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে দুটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা প্রয়োজন। প্রথমত, তাঁর মতের স্বকিরোষিতা। অর্থাৎ একই বিষয়ে তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয়ত, বিবেকানন্দের সমসাময়িক এবং পরবর্তীকালের আর্থ সংক্রান্ত গবেষণা তাঁর মতের সীমাবদ্ধতাগুলিকেই চিহ্নিত করে।

১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ‘পৃথিবীর ইতিহাসে আর্থদের প্রাচীনতম জাতি’ (২০১২:১০:৬২) বলে চিহ্নিত করলেও, ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ‘তামিল জাতির’ সভ্যতাকে সর্বপ্রাচীন বলে চিহ্নিত করেছেন। ‘পরিব্রাজক’-এ লিখেছেন:—

“মাত্রাজ সেই ‘তামিল’ জাতির আবাস, যাদের সভ্যতা সর্বপ্রাচীন, যাদের ‘সুমে’ নামক শাখা ‘ইউফ্রেটিস’ তীরে প্রকাশ সভ্যতা বিস্তার অতি প্রাচীনকালে করেছিল, যাদের জ্যোতিষ, ধর্মকথা, নীতি, আচার প্রভৃতি অসিরি বাবিল সভ্যতার ভিত্তি, যাদের পুরাণ সংগ্রহ বাইবেলের মূল, যাদের আর এক শাখা মালাবার উপকূল হয়ে অদ্বুত মিসরি সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল, যাদের কাছে আর্থরা অনেক বিষয় ঋণী” (২০১২:৬:৬৭)।

এই ‘পরিব্রাজক’ (১৮৯৯)-এ তিনি আবার ‘তামিল’ শব্দের ব্যবহার না করে ‘দ্রাবিড়’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাদের নৃতাত্ত্বিক বর্ণনাও দিয়েছেন:

“রঙ কালো, কিন্তু সোজা চুল, সোজা নাক, সোজা কালো চোখ— প্রাচীন মিসর, প্রাচীন বাবিলোনীয়রা বাস করত এবং অধুনা ভারতময়— বিশেষ করে দক্ষিণ দেশে বাস করে; ইউরোপেও এক-আধ জায়গায় চিহ্ন পাওয়া যায়— এ এক জাতি। এদের পারিভাষিক নাম

দ্রাবিড়” (২০১২:৬:৮৭-৮৮)।

আর্থদের বর্ণনায় বলেছেন:

“... যারা সংস্কৃতের সদৃশ ভাষা কয়, সোজা নাক মুখ চোখ, রঙ সাপা, চুল কালো বা কটা, চোখ কালো বা নীল, এদের নাম আরিয়ান” (পূর্বোক্ত:৮৮)।

এরপর তিনি যে সিদ্ধান্তে এসেছেন তা হল:

“বর্তমান সমস্ত জাতিই এই সকল জাতির এই সকল জাতির [নেগ্রিটো, মোঙ্গোলয়েড, দ্রাবিড়, সেমিটিক, আর্থ ইত্যাদি] নমিশ্রণে উৎপন্ন” (পূর্বোক্ত)।

অর্থাৎ ১৮৯৭-এ বলা “সমগ্র ভারত আর্থময়, এখানে অপর কোন জাতি নেই” (২০১২:৫:১৪৫)— ধারণাকে তিনি পরিত্যাগ করলেন।

‘পরিব্রাজক’ (১৮৯৯)-এ তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আর্থ ও দ্রাবিড়দের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক পার্থক্য করলেও ‘আর্থ ও তামিল’ প্রবন্ধে তা করেননি। তাঁর মতে আর্থ ও দ্রাবিড়দের মধ্যে শুধুমাত্র ভাষাগত প্রভেদ আছে, নৃতাত্ত্বিক পার্থক্য নেই। তাঁর ভাষায়:

“আর্থ ও দ্রাবিড়— এই বিভাগ কেবল ভাষাতাত্ত্বিক বিভাগমাত্র, করোটি তত্ত্বগত (craniological) বিভাগ নহে, সে ধরণের বিভাগের পক্ষে কোন দৃঢ় যুক্তিই নাই” (২০১২:৫:২৯৬)।

তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এই প্রবন্ধে বলেছেন:

“ভাষাতাত্ত্বিক ‘আর্থ’ ও ‘তামিল’ এই শব্দ দুইটির নিহিত তাৎপর্য যাহাই হউক না কেন, এমন কি যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, ভারতীয়দের এই দুটি বিশিষ্ট শাখা ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্ত পার হইতে আসিয়াছিল, তবু অতি প্রাচীনকাল হইতে এই বিভাগ ভাষাতত্ত্বগত— রক্তগত নহে” (পূর্বোক্ত)।

বিবেকানন্দের উখানে দক্ষিণ ভারতের ও তামিল জনগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ফলে, তাদের প্রতি একটি কৃতজ্ঞতাবোধ তাঁর সবসময়ই কাজ করেছিল। ‘কলকাতা জন্ম দিয়েছে বিবেকানন্দের, কিন্তু মাত্রাজ আবিষ্কার করেছে তাকে’। (হিন্দু পত্রিকা। বসু, শঙ্করী, ২০০৯:৫:৩৪৮)।

অন্যান্য স্থানে তিনি তামিল / দ্রাবিড়দের পৃথক জাতি হিসাবে, আর্থদের থেকে স্বতন্ত্র ভাষা গোষ্ঠী হিসেবে দেখালেও দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে কখনই তিনি এই পার্থক্যকে স্বীকার করেননি। বরং তামিল / দ্রাবিড়দেরকে আর্থ প্রতিপন্ন করারই চেষ্টা করেছেন। কে. সুন্দরম আয়ার তাঁর স্মৃতি কথায় জানিয়েছেন:

“অধ্যাপক সুন্দরম পিয়ারিসের একটি মন্তব্যে স্বামীজী বিরক্ত হয়ে ছিলেন। অধ্যাপক বলেছিলেন— ‘দ্রাবিড়’ জাতির লোক হিসেবে তিনি নিজেকে হিন্দু সমাজের বহির্ভূত মনে করেন। পরে স্বামীজী বলেছিলেন, অধ্যাপক পিয়ারি পণ্ডিত, যে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই,

কিন্তু জাতি বর্ণের সংকীর্ণতার কাছে বিনা বিচারে তিনি নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছেন” (২০১২:৬২)।

অর্থাৎ পিঙ্গলি-এর বক্তব্য তাঁর কাছে দুটি দিক থেকে আপত্তিকর— (১) দ্রাবিড়রা আর্য নয়, পৃথক জাতি এবং (২) দ্রাবিড়রা হিন্দু নয়। বিবেকানন্দের কাছে দ্রাবিড়রা আর্য এবং অবশ্যই হিন্দু। ‘আর্য ও তামিল’ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন,

“... আমাদের শাস্ত্রসমূহে ‘আর্য’ শব্দটি যে অর্থে দেখিতে পাই— যাহা দ্বারা এই বিপুল জনসম্মুখে ‘হিন্দু’ নামে অভিহিত করা হয়— সেই অর্থটিই আমরা গ্রহণ করিতেছি। এ কথা সব হিন্দুর সম্মুখেই প্রযোজ্য যে, এই আর্যজাতি সংস্কৃত ও তামিল এই দুই ভাষাভাষীদের সম্মিশ্রণে গঠিত। কয়েকটি ক্ষুদ্রত্মে যে শূদ্রদিগকে এই অভিধা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহা দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, ঐ শূদ্রেরা এখনও নবগত শিক্ষার্থী মাত্র, ভবিষ্যতে উত্তরাণ্ড আর্যজাতিতে পরিণত হইবে” (২০১২:৫:২৯৮)।

বিবেকানন্দ্রের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বলা বক্তব্যের মধ্যে স্ববিরোধিতার জালে জড়িয়ে পড়েছেন বারংবার—

প্রথমত, কোথাও তিনি আর্যদের প্রাচীনতম জাতি (২০১২:১০:৬২) বললেও অন্যত্র তামিলদের প্রাচীনতম জাতি (২০১২:৬:৬৭) বলে অভিহিত করেছেন।

দ্বিতীয়ত, কখনও আর্য ও দ্রাবিড়দের একই নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীভুক্ত (২০১২:৫:২৯৬) বলে অভিহিত করলেও, অন্য স্থানে তাদের ভিন্ন নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের কথা (২০১২:৬:৮৭-৮৮) বলেছেন।

তৃতীয়ত, ভারতবর্ষ আর্যময় (মিশ্রিত জাতি নয়) এখানে অন্য কোনো জাতি নেই বলে ঘোষণা করেও তিনি দেখিয়েছেন বর্তমানে কোনো জাতিই অবিমিশ্র জাতি নয় (২০১২:৬:৮৮) এবং আর্য জাতি ‘সংস্কৃত ও তামিল’ এই দুই ভাষাভাষীদের সমন্বয়ে গঠিত (২০১২:৫:২৯৮)।

চতুর্থত, তিনি আর্যদের হিন্দু বলে অভিহিত করেছেন, আবার একই সাথে ‘আর্য ও ‘তামিল’দের মধ্যে ভিন্নতা দেখিয়েও তামিল/দ্রাবিড়দের হিন্দু বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন। বিবেকানন্দ্রের আর্য ফর্মুলাটি এইরকম—

আর্য = হিন্দু

হিন্দু = সংস্কৃতভাষী + তামিলভাষী

সুতরাং তামিলগণও আর্য জাতিভুক্ত।

তাঁর এ হেন সিদ্ধান্তটি অন্য একটি সিদ্ধান্ত থেকে নস্যাত হয়ে যায়। এটি হল “দ্রাবিড়রা মধ্য-এশিয়ার এক অনার্য জাতি— আর্যদের পূর্বেই তারা ভারতে এসেছিল, আর দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়রাই সব চেয়ে সভ্য ছিল” (২০১২:৪:২০১)। বিবেকানন্দ্রের শেষ উদ্ধৃতি থেকে যা নিঃসৃত হল তা এইরকম—

প্রথমত, দ্রাবিড় শব্দটি তিনি জাতিবাচক অর্থে ব্যবহার করলেন, অর্থাৎ দ্রাবিড় জাতির অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিলেন।

দ্বিতীয়ত, দ্রাবিড়দের অনার্য হিসেবে চিহ্নিত করলেন।

তৃতীয়ত, দ্রাবিড়দের বিদেশাগত হিসেবে দেখালেন।

চতুর্থত, দ্রাবিড়দের আর্যপূর্ব জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন।

তিনি শুধু তামিলদের নয়, সিংহলীদের ও আর্য হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। ৩ জানুয়ারী, ১৮৯৭-তে মেরীকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলেছিলেন:

“সিংহলীরা দ্রাবিড়জাতি নয়— খাঁটি আর্য। প্রায় ৮০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে বাংলাদেশ থেকে সিংহলে উপনিবেশ স্থাপিত হয় এবং সেইসময় থেকে তারা তাদের পরিষ্কার ইতিহাস রেখেছে” (১৯৭৭:৫২১)।

তিনি এমন সিদ্ধান্ত কিতাবে করলেন বা বোধগম্য হয় না। বিশেষ করে তাঁরই বর্ণনা থেকে আর্যদের যে ছবি আমরা পাই তা সিংহলীদের সাথে একেবারেই মেলে না। অর্থাৎ তাঁরা সংস্কৃত সদৃশ ভাষার কথা বলে না, তাদের সোজা নাক মুখ চোখ, গায়ের রং সাদা, চুল কালো বা কটা, চোখ কালো বা নীল (২০১২:৬:৮৮) নয়।

(৪)

বিবেকানন্দ্রকে অনুসরণ করে আর্য কাকে বলে, আর্যরা কারা, তারা কোথা থেকে এলো তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি কি ইত্যাদি প্রশ্নের যদি উত্তর খুঁজতে হয় তাহলে সরাসরি তাঁর রচনাবলীর সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় তাঁর ধারণাটি ঠিক কি ছিল তা বোকা যাবে না।

আত্মানুসন্ধানের রত ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতই বিবেকানন্দ্র আর্থ্যমিক আত্মপরিচয়ের সাথে যুক্ত করেছিলেন। বাঙালী সহ সমগ্র ভারতবাসীকে আর্য হিসেবে দেখে একধরনের জাতিগত কৌলিন্যের দাবি জানিয়েছিলেন। এবং তা প্রকাশও করেছিলেন আমেরিকায় সাদা চামড়াদের সামনে। উৎস যেহেতু আর্যজাতি তাই আমেরিকা বা ইউরোপের সাদা চামড়ার প্রভুদের থেকে ভারতবাসী কিছু কম নয়— এই ধরনের ছদ্ম জাতীয়তাবাদী গরিমা তাঁকে গ্রাস করেছিল। তাই তিনি নির্বিধায় ঘোষণা করেন যে আমেরিকার সাদা চামড়ার অধিবাসী ও ভারতের কালো মানুষেরা একই বংশোদ্ভূত আর্যবংশোদ্ভূত। ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৪-এ বলেন, “... আমরা [আমেরিকার স্বৈতকার ও ভারতীয় হিন্দুরা] সকলেই একটি সাধারণ সূত্র— আর্যজাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছি” (২০১২:১০:১৯)। ১৭ ডিসেম্বর, ১৮৯৪-এ আমেরিকায় অন্য একটি ভাষণে বলেন যে, আমেরিকাবাসী এবং হিন্দুরা একই আর্যজাতির বংশধর। (Burke 2006:2:406)।

নিজেদের অর্থাৎ ভারতীয় হিন্দুদের ভারতীয় হিন্দুদের আর্থ বলার ক্ষেত্রে তিনি কারণ নির্দেশ করেছেন। এবং তা করতে গিয়ে একটি সংজ্ঞায় উপনীত হয়েছেন: "We call ourselves the Aryan race" (Burke, 2006:2:417)। অর্থাৎ আমরা নিজেদেরকে আর্থজাতি বলে ডাকি। তাই আমরা আর্থ। এই আর্থকে উত্তরে বিবেকানন্দ বা বলেন তার সাথে ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব বা প্রত্নতত্ত্বের কোন যোগই নেই। তাঁর উত্তরটি হল: "He is a man whose birth is through religion. This is a peculiar subject, perhaps, in this country, but the idea is that a man must be born through religion, through prayers" (Burke, 2006:2:417)। বাংলা করলে দাঁড়াবে, আর্থ হল সেই মানুষ যে ধর্মের মাধ্যমে দিয়ে, প্রার্থনার মধ্য দিয়ে জন্মায়। এই বক্তব্যেই তিনি বলেছেন যে, একটি শিশুর বঙ্গগত জন্মের মধ্যে দিয়ে আর্থ হয় না, আর্থকে জন্মতে হয় আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়ে (পূর্বোক্ত)। বিবেকানন্দের সমসাময়িক চিন্তাবিদগণও এ ধরনের আর্থ ধারণাকে সমর্থন করেন নি। পরবর্তী পর্বের ঐতিহাসিক, ভাষাতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকগণও আর্থ কে বা কারা এ প্রশ্নের উত্তরে এই ধরনের অসম্ভব সংজ্ঞাকে কখনই প্রত্যয় দেন নি।

তিনি তিনটি সভ্যতা সহ প্রায় সব সভ্যতার একটি জাতিগত উৎসের কথা বলেছেন— তা হল আর্থজাতি। এই তিনটি সভ্যতা হল— রোমান, গ্রীক ও হিন্দু সভ্যতা (পূর্বোক্ত: ৪২০)। এই আর্থদের আদি বাসস্থান কোথায়? এরা কি বাইরে থেকে ভারতে এসেছিল না ভারতবর্ষই তাদের আদি বাসভূমি? এই সব প্রশ্নের উত্তরে বিবেকানন্দের বক্তব্য চূড়ান্ত রকমের অবিরোধী ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি "ভারতে ভূমির প্রথম বিজ্ঞতা" হিসেবে আর্থগণকে চিহ্নিত (২০১২:১০:৪৬৪) করেই খামেননি, তাদের উদারতা ও সহিষ্ণুতার প্রশংসা করে দেখান যে আর্থরা "দেশের [ভারতের] তৎকালীন অধিবাসীদিগকে নিশ্চিহ্ন করিবার চেষ্টা করেন নাই" (পূর্বোক্ত)। "উত্তর ভারতের অধিবাসী আর্থেরা দক্ষিণাঞ্চলের অনার্যগণের উপর নিজেদের আচার-ব্যবহার জোর করিয়া চাপাইবার চেষ্টা করেন নাই, তবে অনার্যেরা আর্থদের অনেক ঐতিহ্যবাহী ধীরে ধীরে নিজেই গ্রহণ করে" (পূর্বোক্ত)। আর্থরা যে বহিরাগত সে কথার সমর্থন পাওয়া যায় তাঁর অন্যান্য বক্তব্যেও। যেমন—

"আকাশচুম্বী হিমালয় পর্বতমালার পাদদেশে বিস্তীর্ণ সমতলভূমিতে আর্থগণ আসিয়া বসবাস করেন। এখনও পর্যন্ত ভারতে তাঁহাদের বংশধর খাটি ব্রাহ্মণজাতি বিদ্যমান"। (২০১২:১০:২৯)।

"আর্থগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া ভারতের গ্রীষ্মপ্রধান আবহাওয়ায় অবিরাম কর্ম করিতে সমর্থ হইল না; সুতরাং তাহারা চিন্তাশীল ও অন্তর্মুখ হইয়া ধর্মের উন্নতি সাধন করিল" (পূর্বোক্ত: ১২৮)।

"দ্রাবিড়ীরা মধ্য এশিয়ার এক অনার্য জাতি। আর্থদের পূর্বেই তারা ভারতে এসেছিল..." (২০১২:৪:২০১)।

"প্রাচীন নথিপত্র অনুসারে আর্থদের বাসভূমি ছিল তুর্কিস্থান, পাকিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম তিব্বতের মধ্যবর্তী দেশে" (২০১২:৫:২৮৮)।

বিবেকানন্দের বক্তব্য থেকে এ পর্যন্ত যা দেখা গেল তা হচ্ছে, দ্রাবিড়দের মত আর্থরাও বহিরাগত, বিদেশী এবং ভারতে বসবাসকারী আর্থরা হলেন হিন্দু (২০১২:৫:২৯৮)। এই হিন্দুদেরই আবার তিনি মূল ভারতবাসী বলে চিহ্নিত করেছেন ইংল্যান্ডে প্রদত্ত একটি ভাষণে, ৭ মে ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে। (Vivekananda, 2008:vol IX:249. The Complete Works.)। এই বক্তব্যে এমন সিদ্ধান্ত শুরুতে করলেও পরবর্তী অংশে আর্থ সংক্রান্ত একটি ভাষা ও নৃতাত্ত্বিক আলোচনার উত্থাপন করে এমন সিদ্ধান্তে এসেছেন যাতে করে শ্রোতা ও পাঠকের হতভম্ব হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

জোল, ম্যাক্স মুলার ও জার্মান ভাষাতাত্ত্বিকদের আলোচনার উল্লেখ করে তিনি দেখিয়েছেন যে সংস্কৃত ও সকল ইউরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। প্রাচীন ভাষাগুলির মধ্যে গ্রীক ভাষার সাথে সাদৃশ্য পূর্বেই বেশি। এর পরেই আসে লিথুনিয়ান ভাষার কথা। যার সাথে সংস্কৃতের তাৎপর্যপূর্ণ মিল রয়েছে। এর মধ্য থেকে যে তত্ত্বটি গড়ে ওঠে তা হল প্রাচীনকালে একটি জাতি ছিল, যে জাতির সদস্যরা নিজেদের আর্থ বলে অভিহিত করত। এদেরই ভাষা ছিল সংস্কৃত। এই তত্ত্ব অনুযায়ী এই আর্থদের আদি বাসভূমি ছিল মধ্য এশিয়ায়। এই জাতি পরবর্তীকালে বহু শাখায় বিভক্ত হয়ে ইউরোপ, পারস্য প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের নিজস্ব ভাষাও গড়ে ওঠে একই সাথে। বিবেকানন্দ এই তত্ত্ব উত্থাপনের পর স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে এ মত এখনও প্রমাণিত হয়নি। কারণ এ তত্ত্ব বহু ক্ষেত্রেই সমস্যাশীর্ণ। যেমন, এই তত্ত্ব যদি সঠিক হয় তাহলে ভারতের মানুষেরা কালো এবং ইউরোপীয়ানরা সাদা হয় কি করে? এই ধরনের বহু সমস্যাই অমীমাংসিত রয়ে গেছে (পূর্বোক্ত: ২৫০-৫১)। তিনি কিন্তু দুটি বিষয়ে নিশ্চিত তা হল—

প্রথমত, ইউরোপ ও উত্তর ভারতের মানুষেরা যে ভাষায় কথা বলে তা একই ভাষার ভিন্ন ভিন্ন শাখা (পূর্বোক্ত: ২৫১)।

দ্বিতীয়ত, আর্থভাষাগুলির মধ্যে সর্বপ্রাচীন হল সংস্কৃত ভাষা। আর্থজাতির যে প্রশাখা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতো তারাই প্রথম সভ্যতা স্বপ্ন করেছিল এবং প্রথম গ্রন্থ ও সাহিত্য রচনা করেছিল (পূর্বোক্ত)। তাঁর আন্দাজ অনুযায়ী এই সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্যের সূচনা হয়েছিল ৮০০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দে (পূর্বোক্ত)।

বর্তমান প্রবন্ধে তিনি আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। প্রথমটি হল, মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয়রা আর্থ নয়। তাদের সভ্যতা ইউরোপীয়দের থেকেও প্রাচীন।

যদিও কোন কোন দিক থেকে মিশরীয়রা আর্যদের সমকালীন ছিল। পদ্ম, বাদর এবং চন্দন গাছের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ভারতীয় আর্যদের সাথে তিনি মিশরীয় সভ্যতার সাদৃশ্য খোঁজার চেষ্টা করেছেন (পূর্বোক্ত: ২৫২)। এর পরেই তিনি মিশরীয়দের আর্যদের তুলনায় খুবই প্রাচীন বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু একই সাথে দেখান যে, তারা হিন্দুদের থেকে প্রাচীন নন (...the Egyptians— were much older than the Aryans, except the Hindus.) (পূর্বোক্ত)।

জীবনের শেষ পর্বে তিনি লিখেছিলেন ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’ (১৩০৬-০৮ বাংলা)। এখানে কিন্তু এই আর্যদের বিশেষ থেকে আসার ধারণাটিকে তিনি পুরোপুরি ত্যাগ করেছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের আর্থতত্ত্বের সমালোচনা করে বলেছেন যে, “আর্যরা কোথা হতে উড়ে এসে ভারতের ‘বুনোদের’ ঘেরে-কেটে জমি ছিনিয়ে বাস করলেন— ওসব আত্মশ্রমিকের কথা। আমাদের পণ্ডিতরাও দেখছি সে গোয়ে গোঁ— আবার ঐ সব বিরাপ মিথ্যা ছেলেপুলেদের শোনানো হচ্ছে। এ অতি অন্যায়” (২০১২: ৬: ১৬৩)। “কোন বেদে কোন সূক্তে, কোথায় দেখছি যে, আর্যরা কোন বিদেশ থেকে এদেশে এসেছে? কোথায় পাচ্ছি যে, তাঁরা বুনোদের ঘেরে-কেটে ফেলেছেন? খামকা আত্মশ্রমিকের দরকারটা কি?” (পূর্বোক্ত: ১৬৪)।

বিবেকানন্দর এই ধারণা ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে মাস্ত্রাজে ‘ভারতের ভবিষ্যৎ’ নামক ভাষণে আরও বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে তিনি বলেন:—

“প্রত্নতাত্ত্বিকগণ স্বয়ং দেখিয়া থাকেন যে, ভারত কৃষ্ণচক্ষু আদিম জাতিসমূহে পরিপূর্ণ ছিল— উজ্জ্বলবর্ণ আর্যগণ আসিয়া সেখানে বাস করিলেন; তাঁহারা কোথা হইতে যে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিলেন, তাহা ঈশ্বরই জানেন। কাহারও কাহারও মতে মধ্য-তীক্ষ্ণ হইতে, আবার কেহ কেহ বলেন মধ্য এশিয়া হইতে। অনেক স্বদেশ-প্রেমিক ইংরেজ আছেন, যাঁহারা মনে করেন— আর্যগণ সকলেই হিরণ্যকেশ ছিলেন। অপরে আবার নিজ নিজ পছন্দমত তীক্ষ্ণদিককে কৃষ্ণকেশ বলিয়া স্থির করেন। লেখকের নিজের চুল কালো হইলে তিনি আর্যগণকেও কৃষ্ণকেশ করিয়া বসেন। আর্যগণ সুইজারল্যান্ডের হ্রদগুলির তীরে বাস করিতেন— সম্প্রতি এরূপ প্রমাণ করিবারও চেষ্টা হইয়াছে। তাঁহারা সকলে মিলিয়া যদি এই সব মতামতের সঙ্গে সেখানেই ডুবিয়া মরিতেন, তাহা হইলেও আমি দুঃখিত হইতাম না। আজকাল কেহ কেহ বলেন, আর্যগণ উত্তরমেরু নিবাসী ছিলেন। আর্যগণ ও তাঁহাদের বাসভূমির উপর ভগবানের আশীর্বাদ বর্ষিত হইক। আমাদের শাস্ত্রে এই সকল বিষয়ের কোন প্রমাণ আছে কিনা যদি অনুসন্ধান করা যায়, তবে দেখিতে পাইবে— আমাদের শাস্ত্রে ইহার সমর্থক কোন বাক্য নাই; এমন কোন বাক্য নাই, যাহাতে আর্যগণকে ভারতের বাহিরে কোন স্থানের অধিবাসী মনে করা যাইতে পারে; আর আফগানিস্থান প্রাচীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শূত্রজাতি যে সকলেই অনার্য এবং তাহারা যে বহুসংখ্যক ছিল, এ-সব কথাও সম্পূর্ণ

আযৌক্তিক। সে সময়ে সামান্য কয়েকজন উপনিবেশকারী আর্যের পক্ষে শত সহস্র অনার্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বাস করাই অসম্ভব হইত। উহার পাঁচ মিনিটে আর্যদের চটনির মতো খইয়া ফেলিত (২০১২: ৫: ১৪৬)।

আর্থ সংক্রান্ত যে ধারণা বিবেকানন্দর বাণী, রচনা ও চিঠিপত্রে পাওয়া যায় তার উপর ভিত্তি করে পাঠকের পক্ষে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তাহলে আর্থপ্রশ্ন সম্পর্কে বিবেকানন্দর মতটি ঠিক কি ছিল? নাকি তাঁর কোন মতই নেই? বস্তুত আর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে যে গভীর অনুসন্ধানের প্রয়োজন ছিল এবং তার জন্য যে সময় দেওয়া দরকার ছিল তার কোনোটিই বিবেকানন্দর ছিলনা। আরও দুটি সমস্যা এখানে ঘুত ছিল প্রথমটি হল— সমসাময়িক কালের ঔপনিবেশিক ক্ষমতা-কাঠামোর স্বার্থরক্ষাকারী ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের ক্ষতিকর মতবাদ ও চিন্তা ভাবনার প্রবল প্রভাব, এবং দ্বিতীয়ত, প্রাগার্ঘ্য সভ্যতা হিসেবে হরপ্পা সভ্যতার অস্তিত্ব তখনও পর্যন্ত অনাবিস্কৃত থাকা।

(৫)

বিবেকানন্দ বিশেষজ্ঞ শঙ্করীপ্রসাদ বসু (২০০৯) আর্থ ও তামিল প্রসঙ্গে বিবেকানন্দর বক্তব্য আলোচনা করতে গিয়ে একদেশদর্শীভাবে দেখিয়েছেন যে, বিবেকানন্দর মতে আর্যরা বহিরাগত নয়, আর্য ও তামিলরা সদৃশ ইত্যাদি। একই সাথে এও বলেছেন যে, “তাঁর [বিবেকানন্দর] যুক্তির অংশ কতদূর গ্রাহ্য তা ঐতিহাসিক-প্রত্নতাত্ত্বিক-নৃতাত্ত্বিকগণ বিচার করবেন” (২০০৯: ৫: ৩৫৪)। আধুনিক কালের আর্থ সংক্রান্ত যে গবেষণা সে সম্পর্কে শঙ্করীবাবু যথেষ্ট সচেতন হওয়া সত্ত্বেও, সত্যত্রে সে প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গেছেন। হয়তো এই কারণেই যে, আর্থ সংক্রান্ত আধুনিক গবেষণাগুলি আর যাই হোক বিবেকানন্দর আর্থ ধারণাকে কখনই সমর্থন করবে না। এবং সেই কারণে সে আলোচনা থেকে শঙ্করীবাবু নিজেকে দূরে রেখেছেন। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দর পরস্পর বিরোধী বক্তব্যগুলিও তাঁর নজর এড়িয়েছে। তাই তিনি এক্ষেত্রে তাঁর পছন্দ মত উদ্ধৃতিগুলিকেই লেখায় স্থান দিয়েছেন এবং ঐতিহাসিক-নৃতাত্ত্বিকদের হাতে বিবেকানন্দর আর্থ ধারণা সম্পর্কিত বিচারের ভার ছেড়ে দিতে চেয়ে ভারমুক্ত হতে চেয়েছেন।

এখন এটা দেখার বিষয় হল আর্থ ধারণা সম্পর্কে আধুনিক গবেষণালব্ধ জ্ঞানটি কি? জোপ ও ম্যাক্স মুলারের প্রভাবিত বিবেকানন্দ আর্থকে জাতি হিসেবে দেখালেও জোপ ‘আর্থ’ শব্দটিকে জাতিবাচক হিসেবে ব্যবহার করেন নি। ম্যাক্স মুলার প্রথম দিকে আর্থ ভাষার সাথে জাতি ধারণার যোগাযোগ ঘটালেও— পরবর্তী সময়ে এ ধারণার বিরুদ্ধে আপত্তি উঠতে থাকে ফলে তিনি তাঁর মত প্রবর্তন করেন। অর্থাৎ ভাষা এক হলেও জাতিও যে এক হবে এর কোন

মানে নেই। মাস্ক মূল্যের আর্থ ভাষা-জাতি সমীক্ষার পরে বিরুদ্ধ মত প্রবল হয়ে উঠলে, তিনি একতরফার বাধ্য হয়েই তাঁর পুরানো মত প্রত্যাহার করে নেন এবং বলেন যে, আমি আর্থ আর্থে একটি মনুষ্যজাতিকে বুঝি না, একটা ভাষাকেই বুঝি (ভৌমিক, সৃজনকুমার কর্তৃক উদ্ধৃত ২০১০:১৭)।

বিবেকানন্দের যাত্রা ছিল বিপরীত মুখী। জোপ একটি আদি ভাষার কথা বলেছিলেন, তার বিভিন্ন শাখার মধ্যে সংস্কৃতকে অন্যতম হিসেবে দেখেছিলেন। মাস্ক মূল্যের আর্থ ভাষা থেকে শুরু করে জাতি ধারণার পৌছিয়েছিলেন। বিবেকানন্দের শুরু কিন্তু আর্থজাতি থেকে। তার থেকে তিনি আর্থভাষা বা সংস্কৃত ভাষায় পৌছান। এবং শেষে গভীর বিশ্বাসের সাথে আর্থজাতি ধারণার সাথে হিন্দুত্বকে মিশিয়ে দেন। মাস্ক মূল্যের পরবর্তীকালে যে নিজের মতের পরিবর্তন করেছিলেন, বিবেকানন্দ 'ভুলেও' কিন্তু তা একবারও উচ্চারণ করেন নি। শঙ্করাচার্যের পরামর্শমত আধুনিক কালের গবেষকরা আর্থ ধারণাকে যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তা যদি আলোচনা করা হয় তাহলে বিবেকানন্দের বক্তব্যটির মূল্য নিকরপন করা সম্ভব হবে।

(৬)

বর্তমান পরে দুটি বিবরণ নিয়ে কথা হবে— ১. সিদ্ধু সভ্যতা ও ২. আর্থ সভ্যতা। এখানে সেবার চেষ্টা করা হবে যে অনার্য সভ্যতা হিসেবে সিদ্ধু সভ্যতার চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যগুলি কি ছিল। ভারতীয় সভ্যতার গঠনে সেই উপাদানগুলি যে এখন প্রবলভাবে বর্তমান— তারও একটি সাক্ষিগুণ পাঠ এখানে উপস্থাপিত হবে। দ্বিতীয় অংশে আর্থ ভাষা-ভাবী মানুষের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল, আর্থ শব্দের অর্থগুলি কি কি এবং তারা বহিরাগত না ভারতীয়— ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হবে।

সিদ্ধু সভ্যতা

উনিশ শতকের (এবং বিশ শতকের প্রথম দিকের) 'আর্থমী' উদ্ভাদনা বেশ কিছু পরিমানে প্রসার সামনে এসে পড়ে সিদ্ধু সভ্যতার (বা হরপ্পা সভ্যতার) আবিষ্কারের (১৯২২-২৩ খ্রিষ্টাব্দে) ফলে। বিবেকানন্দের জীবদ্দশাতে এ আবিষ্কার ঘটলে তাঁর মতটা কি দাঁড়াতে তা খানিকটা আশ্চর্য করা গেলেও যে সম্পর্কে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। কারণ সে মন্তব্য হয়ে পড়বে খানিকটা অন্ধকারের দিকে ঝপ। বরং এটা সেবার চেষ্টা করা যেতে পারে যে, সিদ্ধু সভ্যতার আবিষ্কার কোন কোন প্রসঙ্গে সামনে নিয়ে আসলে, কিভাবে ভারতের ইতিহাস চর্চার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করলে এবং 'আর্থমী' নামক উদ্ভাদনাকে বাধা দিল।

সিদ্ধু সভ্যতা ছিল পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির সবচেয়ে বিস্তৃত ও ব্যাপক। ভারত, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের আধুনিক রাষ্ট্রগুলিতে অবস্থিত সিন্ধু, মাহান, বালুচিস্তান,

শাঞ্জার, হরিয়ানা, উত্তর রাজস্থান, কাথিয়াওয়ার, কচ্ছ এবং কাশ্মীরে সিদ্ধু বা হরপ্পা সভ্যতার অসংখ্য এলাকা আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯২২-২৩ খ্রিষ্টাব্দে সিদ্ধু সভ্যতার আবিষ্কারের কাল বেশ চিহ্নিত করা হলেও এই সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছিল এরও প্রায় একশ বছর আগে। ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ চার্লস ম্যাসন পশ্চিম পাঞ্জাবের দ্রাক্ষন মন্দির গোমারি এবং বর্তমান সাহিবওয়াল জেলার হরপ্পার এর প্রথম নিদর্শন আবিষ্কার করেন। তিনি এই স্থানটিকে কোন দুর্গাঙ্গীর ধ্বংসাবশেষ বলে মনে করেন। ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে জ্যাকসনহার্ডার বার্নস স্থানটি পরিদর্শন করেন। তিনিও ম্যাসনের মতই মনে করেছিলেন এটা কোন দুর্গাঙ্গীর ধ্বংসাবশেষ। কিন্তু দুজনের মধ্যে কেউই স্থানটির সূত্রাত্মক সম্পর্কে কোন ধারণা দিতে পারেননি। এখানে প্রথম প্রত্নতাত্ত্বিক ধনকার্য শুরু হয় ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে। নেতৃত্বে ছিলেন সে সময়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম। কানিংহাম এই অঞ্চলে ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার ধনকার্য চালান। উৎখানের মধ্য দিয়ে তিনি যে নিদর্শনগুলি পেয়েছিলেন তার উপর একটি বিবরণ তৈরী করেন, যা প্রকাশিত হয় ১৮৭২-৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রতিবেদনে।

এর ৫০ বছর পর ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় ও দয়ারাম সাহানী সিদ্ধু প্রদেশের লারকানা জেলার মাহেঞ্জদারো ও হরপ্পা নামক প্রত্নস্থল দুটি আবিষ্কার করেন। তখন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা ছিলেন স্যার জন মার্শাল। এই অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক ধনকার্য চলে ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দ অবধি। এর পরেও বহুস্থানে এই ধনকার্য চলে এবং এই গবেষণার মধ্য দিয়ে আবিষ্কার হয় প্রাগাথ সিদ্ধু সভ্যতার— যার ভৌগোলিক নিবৃত্তি ছিল ৫০০০০০ বর্গমাইল (ছত্রবর্তী, রূপবর্তী, ২০০৭:৪৯)। এই উৎখানের ধারাতেই আবিষ্কৃত হয়ে পড়ে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতাটি— মেহেরগড় সভ্যতা।

মানবোত্তীহাস পর্যালোচনার তিনটি প্রস্তরযুগের সন্ধান যাওয়া যায়— আদি, মধ্য ও নব্য প্রস্তর যুগ। নব্যপ্রস্তর যুগে কৃষির উন্মেষ ভারতীয় উপমহাদেশে এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করলো। বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত মেহেরগড় প্রত্নস্থল এই নতুন পরিস্থিতির সাক্ষ্য বহন করে। ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে মেহেরগড় ধনকার্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিক ব্র্যাসোয়া জারিজের নেতৃত্বে আর. অগাচিন, আর. মিলো, এল. কনস্টানটিনি, এম. লেচিভিলিয়ার, জি.এল. পসীল প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ মেহেরগড় সভ্যতা আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মেহেরগড় প্রাচীনতম পর্বের কাল নিশ্চিত হয় খ্রিষ্টপূর্ব ৭০০০ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ সময়সীমায়। এই পূর্ব কৃষির বিকাশের পাশাপাশি পণ্ডপালনও শুরু হতে দেখা যায়। পাথরের অস্ত্রের সন্ধানও মোল, এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে উপমহাদেশের আদিমতম শস্যভাতার নির্মাণ এই সময়েই ঘটে। মেহেরগড়ের দ্বিতীয় পর্ব (৫০০০ খ্রিঃপূঃ

থেকে ৪০০০ খ্রিঃপূঃ) তলাবস্ত্র ও বীজ তৈল নিষ্কাশনের মতো ঘটনাটি ঘটে। আর্থভাব ঘটে কাস্তের, অলঙ্কার শিল্পের এবং কুমোরের চাকের। মেহেরগড় সভ্যতার তৃতীয় পর্বে (৪৩০০ খ্রিঃপূঃ-৩৮০০ খ্রিঃপূঃ) কুমোরের চাকের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়ে যায়। এবং পাত্রগুলি ছিল চূর্ণীতে পোড়ানো। পাত্রের গায়ে অলংকার ও নক্সার বৃদ্ধি ঘটে। তামার খাতুর ব্যবহার শুরু হয়। শুরু হয় নামমুদ্রা বা সীলমোহরের প্রচলন। এগুলি প্রশাসনিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজেই মুখ্যত লাগে। অর্থাৎ এই পর্বে এসে সাদামাটা গ্রামীণ কৃষি প্রধান জীবনের থেকেও জটিলতর সমাজব্যবস্থার আর্থভাব ঘটেছিল। মেহেরগড়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে পাওয়া অসংখ্য কঙ্কালের দাঁতগুলির গভীর অধ্যয়নে দেখা গেছে যে, ভারতবর্ষের এই ‘আদি কুবকদের’ সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার মানুষদের চেয়ে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার, জনসমষ্টির বেশি সাদৃশ্য ছিল (হাবিব ২০০৮:৫৮)। তৃতীয় পর্বে যে শিল্পের নিদর্শন মেলে সেগুলিতে অনার্য প্রভাবই লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে তাদের সমাধিগুলির নিদর্শন এখানে উল্লেখ্য (পূর্বোক্ত:৬৪)। এটি ছিল প্রাক-হরপ্পাযুগের সমাজ-সংস্কৃতি (চক্রবর্তী, রণবীর, ২০০৭: প্রথমখণ্ড:৪৫-৪৬)। হরপ্পা সভ্যতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল এই মেহেরগড় সভ্যতাই। অন্য ভাষায় মেহেরগড় সভ্যতার ধারাবাহিক বিকাশের ফলই ছিল হরপ্পা সভ্যতা।

হরপ্পা সভ্যতার সময়কালটি হল খ্রিঃপূঃ ৩০০০ থেকে ১৭০০ খ্রিঃপূঃ পর্যন্ত। সিদ্ধ উপত্যকায় পাওয়া মানুষের কঙ্কাল ও কেরাটি পরীক্ষা করে চারটি ভিন্ন জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব অনুমান করা হয়। জনগোষ্ঠীগুলি হল প্রোটো-অস্ট্রালয়েড, মেডিটেরেনিয়ান, মোঙ্গোলয়েড ও আয়ো-দিনারিক। প্রোটো-অস্ট্রালয়েড বলতে সাধারণত কোল ও মুন্ডাদের বোঝায়। এরই সংস্কৃত সাহিত্যের নিষাদ। হাবিভুরাই মেডিটেরেনিয়ান। গোল্ড, কুই এবং ওঁরাওগণ এদের মধ্যে পড়েন। যাদের দেহগঠন চিনাদের মতো তারাই মোঙ্গোলয়েড। আয়ো-দিনারিকগণও অনার্য। যে সকল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হরপ্পা ও মহেঞ্জদারো সহ সিদ্ধ সভ্যতার অন্যান্য স্থানে পাওয়া গেছে সেখান থেকেও এই সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, এই সভ্যতা ছিল একটি প্রাগার্য সভ্যতা (দ্রষ্টব্য রত্নাগর ২০০৩ হাবিব ২০০৪, সুর ১৯৯৫, কোশাথি ১৯৫৬, ১৯৭২)।

অতুল সুরের (১৯৯৫) আলোচনা থেকে পাওয়া যায় সিদ্ধ সভ্যতা ছিল পুরোপুরি একটি প্রাগার্য সভ্যতা। শুধু তাই নয় তিনি এও মন্তব্য করেছেন যে, “হিন্দু সভ্যতার গঠনের মূলে বারো আনা ভাগ হচ্ছে প্রাগার্য উপাদান, আর মাত্র চার আনা ভাগ আর্থ সভ্যতার আবরণে মণ্ডিত (সুর, ১৯৯৮:১২)।

বস্তুত পক্ষে সিদ্ধ সভ্যতার সাথে আর্থ সভ্যতার কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য রয়ে গেছে—

প্রথমত, সিদ্ধ সভ্যতার অধিবাসীরা ছিলেন শিল্প-উপাসক ও মাতৃ-উপাসক। কিন্তু আর্থদের

দেবতার মূলত পুরুষ।

দ্বিতীয়ত, সিদ্ধ সভ্যতার ঘোড়ার কোন কঙ্কাল পাওয়া যায়নি। অন্য দিকে আর্থদের কাছে ঘোড়াই ছিল শ্রেষ্ঠ জন্তু।

তৃতীয়ত, সিদ্ধবাসীরা ছিলেন নগরবাসী। আর্থরা নগর নির্মাণ করতে জানতেন না। বরং তারা নগর ধ্বংস করতেন। সেই কারণেই ইন্দ্রকে ‘পুরন্দর’ (নগর/বাঁধ ধ্বংসকারী) হিসেবে অভিহিত করা হত।

চতুর্থত, সিদ্ধ সভ্যতায় মৃতদের সমাধিস্থ করা হত। কিন্তু আর্থরা মৃত ব্যক্তিকে দাহ করতেন। পঞ্চমত, সিদ্ধবাসীরা ভাষার লিখিতরূপ ছিল। কিন্তু আর্থদের তা ছিল না। তাই ওরা বেদকে মুখস্থ করতো। বেদকে কলা হত ‘স্মৃতি’ ও ‘ঋতি’।

ষষ্ঠত, সিদ্ধসভ্যতা ছিল কৃষিভিত্তিক। কিন্তু আর্থরা ছিলেন যাবাবর পশুপালক। সপ্তমত, নৃতাত্ত্বিক নিক থেকেও উভয়ের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য ছিল।

অতুল সুরের (১৯৯৫)-র মতে, “সিদ্ধসভ্যতার লোকেরা এক উন্নত বৈজ্ঞানিক সভ্যতার ধারক ছিল। অপরপক্ষে আর্থরা ছিল বর্বরজাতি” (১৯৯৫:৮৫)।

আর্থপ্রশ্ন

এবারে আসা যাক আর্থ প্রশ্ন নিয়ে সাম্প্রতিক গবেষণার ফলগুলি সম্পর্কে। বিবেকানন্দের শ্রদ্ধেয় ভাষাবিদ ম্যাক্স মুলার এবং উনিশ শতকের রমেশ দত্ত আর্থদের বহিরাগত হিসাবেই চিহ্নিত করেছিলেন। গোটা বিশ শতক জুড়ে আর্থ সংক্রান্ত গবেষণার মধ্যে দিয়ে যা বেরিয়ে এসেছে, তা বিবেকানন্দের মতের পক্ষে স্বস্তিদায়ক নয়। শুধু তাই নয় বিশেষজ্ঞদের মতামত বৈদিক আর্থগরিমার ধারণাটিকে প্রায় পুরোপুরিই বাতিল করে দেয়। সিদ্ধ সভ্যতার আবিষ্কার যেমন দেখায় ভারতে বৈদিক আর্থ সভ্যতার থেকেও বহু প্রাচীন মেহেরগড় ও হরপ্পা সভ্যতা এদেশে ছিল, তেমনি আর্থ সংক্রান্ত গবেষণা দেখায় যে ভারতবর্ষ কখনই বিবেকানন্দ কথিত ‘আর্থময়’ নয়। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রোমিলা থাপারের পর্যবেক্ষণটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ:

“ভারতে যদি কোন সময় বিশুদ্ধ আর্থ জাতি থেকেও থাকে, তা হলে তাদের ‘বিশুদ্ধতা’ বেশিদিন টিকিয়ে রাখার সম্ভাবনা সুদূরপর্যন্ত। এমন কোন জাতি যে বর্তমান যুগ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে, একথা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। বিজ্ঞানসন্মত জীববিদ্যা আজ আর একথা স্বীকার করে না যে, কোন ‘বিশুদ্ধ’ জাতি অপরিবর্তিতভাবে টিকে থাকতে পারে— ইতিহাসে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রনের ফলে জাতিগত ‘বিশুদ্ধতা’ ক্রমেই হ্রাস পায়” (১৯৮৫:২৯)।

ফলে বিবেকানন্দ যখন বলেন, “আকাশচুম্বী হিমালয় পর্বতমালার পাদদেশে বিস্তীর্ণ সমতলভূমিতে আর্থগণ আসিয়া বসবাস করেন। এখনও পর্যন্ত ভারতে তাঁহাদের বংশধর

খাঁটি ব্রাহ্মণ জাতি বিদ্যমান" (২০১২:১০:২৯)। সেই ধারণা অর্থহীন ধারণায় পরিণত হয়। বস্তুতপক্ষে এই ধরণের আজগুবি ধারণা উনিশ শতকের প্রধান চিন্তাবিদদের রচনাত্তেও পাওয়া যায়। বিশেষ করে এই খাঁটি আর্থতত্ত্ব ও ব্রাহ্মণতত্ত্বের ধারণাটি।

‘আর্থ’ শব্দটির অর্থ

‘আর্থ’ শব্দটি অধিকাংশ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় না পাওয়া গেলেও কয়েকটিতে যাওয়া যায়। দুটি প্রাচীন গ্রন্থ ‘ঋগ্বেদ’ ও ‘আবেস্তা’-তে ‘আর্থ’ শব্দটির ব্যবহার আছে। ‘আর্থ’ শব্দকেন্দ্রিক সব যুক্তিতর্ক বিচার করে ও, জেমেরেনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, এই শব্দটি ইন্দো-ইউরোপীয় নয়, নিকট প্রাচ্যের, সম্ভবত: উগরির মত ভাষা থেকে গৃহীত শব্দ, যার অর্থ হল ‘আর্থীয়’ অথবা ‘সঙ্গী’। হিটাইট ভাষায়ও ‘আর্থ’ শব্দটির অর্থ ‘আর্থীয়’ বা ‘বন্ধু’। আবার ‘ইরান’ শব্দটি ‘আর্থ’ শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত (শর্মা, রামশরণ ১৯৯৭:১০)। অধ্যাপক শর্মার মনে হয়েছে, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ‘আর্থ’ শব্দটির অর্থ ‘প্রভু’ বা ‘অভিজাত’ শ্রেণীর ব্যক্তি হলেও, সব ক্ষেত্রেই ‘আর্থ’ শব্দটি এই অর্থ বহন করতো না। ফিনিশিয় ভাষায় ‘ওরজ’ শব্দটির অর্থ ‘দাস’। এই ‘ওরজ’ শব্দটির উৎপন্ন হয়েছে ‘আর্থ’ শব্দ থেকে (পূর্বোক্ত)।

ঋগ্বেদে ইন্দ্র উপাসকদের আর্থ বলা হত। যখন এই গ্রন্থে একদিকে আর্থ আর অন্যদিকে দাস ও দস্যুদের মধ্যে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, তখন প্রথমোক্তদের স্বদেশী ও দ্বিতীয়কে বিদেশী বিবেচনা করা হয় নি। এই যুদ্ধ হয়েছে দুটি সংস্কৃতির মধ্যে— ব্রতপালনকারী ও ব্রত পালনকারী নয় (অব্রত বা অন্যব্রত) এমন মানব গোষ্ঠীদের মধ্যে। সে সময়ে ভারতকে একদেশ বা জাতির দৃষ্টিতে দেখা হয় নি (শর্মা, ১৯৯৭:১০)।

গায়ের রঙের (বর্ণের) ভিত্তিতে ঋগ্বেদে কতকগুলি সূক্তে আর্থদের একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীরূপে দেখানো হয়েছে। আর্থদের শব্দদের কালো (কৃষ্ণবর্ণ) বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আর্থদের বলা হয়েছে মানুষী প্রজা, যারা অগ্নি-বৈশ্বানরের পূজা করত এবং কখনও কখনও কৃষ্ণবর্ণ মানুষদের গৃহে গৃহে আগুন জ্বালিয়ে দিত। কথিত আছে, আর্থদেবতা সোম কৃষ্ণবর্ণ লোকদের হত্যা করতেন। এও বলা হয়েছে, তিনি কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং ৫০,০০০ ‘কৃষ্ণ’ (বর্ণ)কে নিহত করেছিলেন। বিশ্বাস করা হয়, তিনি অসুরের কৃষ্ণচর্ম অপসারিত করেছিলেন। ঋগ্বেদে ‘আর্থ’ শব্দের সব উল্লেখ জাতি বা বর্ণ অর্থে গ্রহণ করা যায় না। মূল ‘অর’ থেকে নিস্পন্ন এই শব্দটির অর্থ হল ‘পাওয়া’। আবেস্তায় ‘আর্থ’ শব্দের অর্থ প্রভু অথবা অভিজাতকুলের ব্যক্তি, এবং এই অর্থে ঋগ্বেদের কতকগুলি উল্লেখের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (শর্মা ১৯৯৭:১১)।

ঋগ্বেদে জাতিগত দিক থেকে কয়েকটি মিশ্র গোষ্ঠী দেখা যায়। দশজন রাজা বা বিশপতি বিখ্যাত ‘দশ রাজার যুদ্ধে’ অংশ নিয়েছিলেন। নামের তালিকা থেকে জানা যায়, প্রত্যেকে যুযুধান পক্ষে আর্থ ও অনার্থ, উভয়ই ছিল। পরে, যারা সম্মানিত ও উচ্চপর্যায়ভুক্ত অথবা অভিজাত কুলোদ্ভূত, তাঁরা আর্থ নামে পরিচিত হন। পরবর্তী বৈদিক ও বৈদিকোত্তর কালে ‘আর্থ’ শব্দটির দ্বারা উচ্চতর তিনবর্ণকে বোঝাত, যাদের ‘বিজ’ নামেও অভিহিত করা হয়। শূদ্রদের কখনই আর্থদের পর্যায়ভুক্ত করা হয়নি। আর্থদের স্বাধীন বলে মনে করা হত। অপরদিকে, শূদ্ররা স্বাধীন ছিল না (শর্মা ১৯৯৭:১১)।

আর্থ → আর্থদ্রম বা আর্থভাব

↓

শূদ্র

↓

দাস

আর্থপ্রাণ শূদ্রকে দাস পর্যায়ে অধঃপতিত করা যেত না—

আর্থদ্রম— এক নাগরিক স্বাধীনতাকে বোঝাত। যে শূদ্রদের পিতা-মাতা আর্থ তাঁরা স্বাধীন বলে গণ্য হতেন। গুপ্তযুগ পর্যন্ত তাঁদের সংখ্যা বেশি ছিল না, পাবর্তীকালে তাঁরা সংখ্যাধিক্যতা অর্জন করলে, ব্রাহ্মণসহ উচ্চতর শ্রেণী তাদের অনার্থ বিবেচনা করত।

‘আর্থ’ শব্দটি তাই কখনই জাতিবাচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। এটা একটা ভাষাবাচক শব্দ মাত্র। ঐতিহাসিক ভি.ভি. কোশাঙ্গীও এই মতই প্রকাশ করে বলেছেন যে, ‘আর্থ’ শব্দটিকে ‘জাতি’ অর্থে ব্যবহার করলে তা হাস্যকর হয়ে দাঁড়াবে। প্রকৃতপক্ষে তারা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতো এবং নিজেদের ‘আর্থ’ বলে অভিহিত করতো। এখানে নৃতত্ত্বগত সাদৃশ্য ছিল না। অতুল সুরের পর্যবেক্ষণটিও সন্দেহ: “আর্থ ভাষাভাষী জাতিগণের মধ্যে কোনরূপ নৃতাত্ত্বিক ও আবয়বিক সাদৃশ্য ছিল না” (সুর, ১৯৯৮:১০)।

১. ফিনল্যান্ডবাসী তাদের প্রতিবেশী ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্থদের পদানত করেছিল, তখন তারা নিজেদের ভাষায় ‘ওরজ’ শব্দটি দাসকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করতো (শর্মা, রামশরণ, ১৯৯৭:১০)।

আর্থদের ভারতে আগমন

হিন্দুধর্মীদের বাদ দিলে বর্তমানে প্রায় সকল ঐতিহাসিকগণই একথা স্বীকার করে নিয়েছেন যে আর্থরা বহিরাগত। অতুল সুর সুস্পষ্টভাবেই আর্থদের বহিরাগত হিসেবে

চিহ্নিত করেছেন। কোশাম্বীর মতটিও অনুরূপ (Kosambi, ১৯৭২:৭৬)। পার্সিভাল স্পীয়ারও আৰ্যদের বহিরাগত ও আক্রমণকারী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এদের একটি শাখা ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে ১৫০০ খ্রিঃপূঃ প্রবেশ করে (Spear 1961:31)। রুশ ঐতিহাসিকগণ দেখিয়েছেন, আৰ্যদের আদি বাসভূমি ছিল মধ্য এশিয়ায় বা দক্ষিণ রাশিয়ার স্কেপভূমিতে (আন্তোনেভা, বোনগার্দ-লেভিন-কতোভস্কি ১৯৮৬:৪১)। আরও অনেকে এই ধারাতাই মত প্রকাশ করে কয়েকটি যুক্তি উত্থাপন করেছেন—

১. আৰ্যদের আদি বাসভূমি ভারতবর্ষ— এই মতের সপক্ষে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায় না। বরং এরই বিপরীতে আৰ্যদের ভারতে আগমনের বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। রামশরণ শর্মা (২০০৩) এই প্রত্নস্থলগুলিকে নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন:

“উপমহাদেশে আৰ্যদের আগমনের পর্যায় বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে উত্তর বালুচিস্তানে কোব নদীর পারে পেরিয়ানো খুন্ডি, বোলান গিরিপথের কাছে পিরাক, গোমস উপত্যকায় গোমাল গিরিপথের কাছে ওমলা এবং অন্যান্য কবরস্থান এবং সোয়াত উপত্যকায় গান্ধার কবরক্ষেত্র” (২০০৩:৪১)।

২. আবেগ দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিবেকানন্দের বক্তব্য ছিল আৰ্যদের সভ্যতা আড়াই হাজার বছর পূর্বের (২০১২:৪:১৮৯)। এবং আৰ্যদের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ সমপরিমাণ প্রাচীন। যদিও অন্যত্র তিনি তাকে আরও প্রাচীন বলতে চেয়েছেন। কিন্তু কোথাও আবার বেলকে সৃষ্টির সন-তারিখ নির্ণীত হতে পারে বলে তিনি মনেই করেন না। তাঁর মতে বেদ অনাদি-অনন্ত (বিবেকানন্দ ২০১২:৫:১১)। আধুনিক ঐতিহাসিকরা কিন্তু বেদের যে কাল নির্ণয় করেছেন তা বিবেকানন্দের থেকে ভিন্ন। তাদের মতে, স্বধেদ খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ১০০০-এর মধ্যে রচিত (হাবিব ও ঠাকুর ২০০৬:২)।

৩. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর ভৌগলিক অবস্থান ভারতবর্ষ যে আৰ্যদের আদিবাসস্থান তার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। বিবেকানন্দের কাছে এসব সাক্ষ্য-টাক্ষ্য সব ‘আহাম্মকের কথা’ (২০১২:৬:১৬৩)।

৪. আৰ্যদের ঘোড়ার ও লোহার ব্যবহার সিদ্ধবাসীদের জানা ছিল না। ঘোড়া, লোহার অস্ত্র এবং রথ প্রাণাৰ্থ সভ্যতাকে ধ্বংস করতে সাহায্য করেছিল।

৫. বিবেকানন্দের মতে, আৰ্যরা ভারতের বাইরে থেকে কেবল আসেনি, তারা এদেশীয় বুনোদের মেয়ে কেটে জমি জিনিয়ে নিয়ে বাস করতে শুরু করে— এসব সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা (২০১২:৬:১৬৩)। বেসেও এমন ধরনের কথা কোথাও নেই যে আৰ্যরা বুনোদের মেয়ে কেটে ধ্বংস করেছে (পূর্বোক্ত :১৬৪)। এর বিপরীতে অতুল সুর বেদ থেকে উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, আৰ্যরা ছিল যোদ্ধার জাত। সিদ্ধ সভ্যতার বণিকদের ঐশ্বর্য ও ধনদৌলত তাদের ইর্ষান্বিত করেছিল। তাই তারা সিদ্ধ সভ্যতাকে ধ্বংস করতে উদ্যোগী হয়েছিল। নগর

ধ্বংসকারী ইন্দ্রকে তাই বেদে পুরন্দর বলা হয়েছে (সুর ১৯৯৫:৮৯-৯০ এবং ১৯৯৮:১৬)। অর্থাৎ বিবেকানন্দ কথিত ‘আৰ্যেরা অতি দয়াল ছিলেন’ (২০১২:৬:১৬৪)। তা বোধহয় খুব একটা সত্য নয়।

(৭)

বিবেকানন্দ ছিলেন উনিশ শতকীয় বাঙালী সমাজে গড়ে ওঠা দ্বিতীয় আৰ্যভাবনা তথা হিন্দুভাবনার এক সার্থক প্রতিনিধি। তাত্ত্বিকতা দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ফলে যখন যেমন তথ্য পেয়েছেন তখন সে রকমই সিদ্ধান্ত করেছেন। ফলে তার ভাবনাচিন্তাটি হয়ে পড়েছে স্ববিরোধিতার এক অনন্য উদাহরণ। কিন্তু এক গোঁ থেকে তিনি কখনই সরে আসেননি তা হল ‘ভারত আৰ্যময়, এখানে আর কোন জাতি নেই’ আধুনিক কালে গবেষণা কিন্তু প্রমাণ করেছে এইরকম অবিমিশ্র জাতি সম্ভব নয়। তাঁর ভাবনার দ্বিতীয় সমস্যা হল তিনি ভাষা ও জাতিকে সমার্থক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ভারতের বহু বিচিত্র ও বহুবিধভক্ত সমাজকে একটি এককের বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তাই তার কাছে জাতি সমস্যার সমাধান ছিল আৰ্যজাতির ধারণা। তা যে নিদারুণভাবে বর্ণব্যবস্থা ও বৈষম্যমূলক সমাজের সংরক্ষণেই কাজ করে তা কি তিনি বুঝেছিলেন?

গ্রন্থপঞ্জী:—

আন্তোনেভা, বে., বোনগার্দ-লেভিন, গ্রি., কতোভস্কি, গ্রি. ১৯৮৬। ভারতবর্ষের ঐতিহাস। মন্মো:প্রগতি প্রকাশন।

আয়ার, কে, সুন্দরম। ২০১২। স্মৃতির আলোয় বিবেকানন্দ। স্বামীজীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গুণগাহিগণ। ২০১২। স্মৃতির আলোয় বিবেকানন্দ। ভাষান্তর স্বরাজ মজুমদার ও মিতা মজুমদার। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়।

গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপকুমার। ২০০০। ভারত ইতিহাসের সন্ধান। কলকাতা: সাহিত্যলোক। চক্রবর্তী, রূপবীরা। ২০০৭। ভারত-ইতিহাসের আদিপর্ব। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: ওরিয়েন্টাল লংম্যান।

চট্টোপাধ্যায়, শ্রী সুনীতিকুমার। ২০০৪। সাংস্কৃতিকী। খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। জোন্স, উইলিয়াম। ২০১১। এশিয়া: মানব ও প্রকৃতি। অনুবাদ— অমিতা চক্রবর্তী। কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ১৪০২ বাংলা। রবীন্দ্র রচনাবলী। খণ্ড ২, ৬, কলিকাতা: বিশ্বভারতী। প্রবন্ধ: ‘এদেশী সমাজ’।

- থাপার, রোমিলা। ১৯৮৫। পূর্বকাল ও পূর্বধারণা। অনুবাদ- ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়। নয়াদিল্লি: ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া।
- থাপার, রোমিলা, কনোয়ার, দেশপাণ্ডে, রত্নাগর। ২০১১। ভারতবর্ষ: ঐতিহাসিক সূচনা ও আর্থধারণা। অনুবাদ- আখীরা বসু চক্রবর্তী। নয়াদিল্লি: ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া।
- দত্ত, রমেশচন্দ্র। ২০০১। প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাস। কলকাতা: দীপায়ন।
- দেশপাণ্ডে। ২০১১। হাবিব, ইরফান। ২০০৪। সিদ্ধুসভ্যতা। ভাষান্তর- কাবেরী বসু। কলকাতা: এন.বি.এ. প্রাণলিঃ।
- বসু, শঙ্করপ্রসাদ। ২০০৯। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ। পঞ্চমখণ্ড। কলকাতা: মন্ডল বুক হাউস।
- বিবেকানন্দ, স্বামী। ১৯৭৭। পত্রাবলী। কলিকাতা: উদ্বোধন।
- বিবেকানন্দ, স্বামী। ২০১২। বাণী ও রচনা। কলকাতা: উদ্বোধন। দশখণ্ডে সম্পূর্ণ।
- ডৌমিক, সুহাসকুমার। ২০১০। আর্থরহস্য। কলকাতা: মনককিরা।
- রত্নাগর, শিরিন। ২০০৩। হরম্মা সভ্যতার সন্ধানে। ভাষান্তর- কাবেরী বসু। কলকাতা: এন.বি.এ. প্রাণলিঃ।
- শর্মা, রামশরণ। ১৯৯৭। আর্থদের অনুসন্ধান। অনুবাদ- ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়। কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিসার্স।
- শর্মা, রামশরণ। ২০০৩। আর্থদের ভারতে আগমন। অনুবাদ- গৌতম নিয়োগী। কলকাতা: ওরিয়েন্টাল লংমান।
- সুর, ড. অতুল। ১৯৯৫। সিদ্ধুসভ্যতার স্বরূপ ও সমস্যা। কলিকাতা: উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির।
- সুর, ড. অতুল। ১৯৯৮। হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য। কলকাতা: সাহিত্যলোক।
- সেন, সুকোমল। ২০০০। ভারতের সভ্যতা ও সমাজবিকাশে ধর্ম শ্রেণী ও জাতিভেদ। কলকাতা: ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড।
- হাবিব, ইরফান; ঠাকুর, বিজয় কুমার। ২০০৬। বৈদিক সভ্যতা। ভাষান্তর- কাবেরী বসু। কলকাতা: এন.বি.এ. প্রাণলিঃ।
- হাবিব, ইরফান। ২০০৮। প্রাক-ঐতিহাস। ভাষান্তর- কাবেরী বসু। কলকাতা: এন.বি.এ. প্রাণলিঃ।

- The Complete Works of Swami Vivekananda. 2008. Vol- IX. Kolkata : Advaita Ashrama.
- Burke, Marie Louise. 2006. Vol-2. Swami Vivekananda in the west : New Discoveries- His Prophetic Mission, Part two. Kolkata : Advaita Ashrama.
- Kosambi, D.D. 1956. An Introduction to the study of Indian History. Bombay : Popular Book Depot.
- Kosambi, D.D. 1972. The Culture and Civilisation of Ancient India. New Delhi : Vikas Publishing House Pvt. Ltd.
- Muller, Max. 1862, 1883, 1888. রোমিলা থাপার (২০১১) কর্তৃক ব্যবহৃত ও উদ্ধৃত।
- Spear, Persial. 1961. India- A Modern History. The University of Michigan Press, USA.

ভারতের তপসিলি জাতি – উপজাতির সংরক্ষণের চ্যালেঞ্জ

সুনীল কুমার রায়

২০১১ খ্রিষ্টাব্দের জনগণনার রিপোর্ট অনুসারে জনসংখ্যার ১৬% তপসিলি জাতি এবং ৯% তপসিলি উপজাতিবর্গের মানুষ। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের জনগণনার এঁরা ছিলেন যথাক্রমে ১৫% এবং ৬%। দ্রুত ক্রমাবনত অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে তপসিলি জাতিবর্গের মানুষেরা তাঁদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে আটটি দশমবার্ষিক জনগণনার শেষেও জাতীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে কার্বত আটক রেখে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমাজতাত্ত্বিক বিধিকে যে ভুল প্রমাণ করে দিয়েছেন তা বিশ্বাস করা কঠিন। বাস্তবত তা সত্য নয়। তপসিলি জাতি-উপজাতির সংরক্ষণের সুযোগ যাতে প্রসারিত না-করতে হয় সেই প্রচেষ্টাই ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের জনগণনার রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে। বেসরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে ভারতের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি মানুষ তপসিলি জাতি-উপজাতিগুলির অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁদের জনসংখ্যা চীনব্যতীত পৃথিবীর আর যে কোন দেশের মোট জনসংখ্যার থেকে অনেক বেশি। ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার চালকদের অবজ্ঞা, প্রতারণা, হিংস্রতা এবং দস্যুতার শিকার এই বিপুল সংখ্যক মানুষের দুর্বিষহ জীবনের ধানিমা কি সরকারি জনগণনার কারচুপিতে চাপা থাকে?

—না থাকে না। তাই তো তাঁদের গৃহহীনতা, ক্ষুধাকাতরতা, অপুষ্টি, রোগব্যাদি, চিকিৎসাহীনতা, অনাহারমৃত্যু, শিশু ও প্রসূতিমৃত্যু সারা পৃথিবীর, কলঙ্কের প্রতীক হয়ে উঠেছে। ভারতের মত এমন বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ বিশাল দেশের প্রত্যক্ষ শ্রমশক্তির এত দীন-হীন অবস্থা কেন হল? বিশেষত সংরক্ষণের সুযোগপ্রাপ্ত এই সন্তানগুলোর তো সেই কবে সর্বতোভাবে অগ্রসর হয়ে উঠে সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে বিদায় জানানোর কথা ছিল। কেন তা না-হয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত ফল ফলে গেল? নিম্নি কেন্দ্রিক গবেষণা সংস্থা The Centre for Budget and Governance Accountability বা সংক্ষেপে CBGA এই প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক উত্তর অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন। এই সংস্থার গবেষকদের অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে, ১৯৮০-এর দশকের সূচনাকাল পর্যন্ত তপসিলি জাতি-উপজাতিসমূহের সমূহের উন্নয়নের খাতে ব্যয়বরাদ্দের কোন নির্ধারিত নীতি না-থাকায় উপযুক্ত পরিমাণে অর্থের সংস্থানই ছিল না বলে তাঁদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ কোন উদ্যোগও ছিল না। তাই তখন কেন্দ্রীয় সরকার তপসিলি জাতি ও উপজাতিগুলির জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে প্রাপ্য বাজেট বরাদ্দের অংশ ভাগ তাঁদের উন্নয়নের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে ব্যয় করার নীতিটি নির্ধারণ করেন। ঠিক হয় যে, অতঃপর প্রতিটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রক তপসিলি জাতিগুলির জন্য The Special Component Plan (SCP) এবং তপসিলি উপজাতিগুলির জন্য The Tribal Sub-Plan (TSP) তৈরী করে সেই ব্যয়-বরাদ্দের অর্থ বাধ্যতামূলকভাবে খরচা করবেন।

অত্যন্ত বেদনাদায়ক সত্য হল এই যে, গত তিনদশক ধরে দেশীয় সরকার সেই নীতি কার্যকর করেন নি এবং সেই দুর্গত মানুষদের প্রাপ্য অর্থ তাঁদের উন্নয়নে খরচ করা দূরে থাক, অর্ধেকও বরাদ্দই করেন নি। ["Putting two key central government policies related to dalits and tribals under the scanner, CBGA researchers found that these have remained on paper. These policies are the Special Component Plan (SCP) for scheduled castes and the Tribal Sub-Plan (TSP) for scheduled tribals. Started there decades ago, they made it mandatory for central government ministries and department to earmark a fixed share of thier spending for dalits and tribals in proportion to the population. This meant that each agency needed to exclusively spend 16% of their funds on dalits and 9% on tribals." -- The Times of India, Kolkata, 15.03.2012, p14]

গবেষকগণ তপসিলি জাতি ও উপজাতিগুলির অগণিত মানুষকে অমানবিক স্তরের জীবনযাত্রায় নিষ্ক্ষেপ করার দায়ে ক্ষমতাস্বত্বের সব রাজনৈতিক নেতাকেই অভিযুক্ত করেছেন এবং এই প্রসঙ্গে তাঁদের প্রতারণা এবং দস্যুতার পর্যায়ে ফেলেছেন।

এই গবেষকদের বিশ্লেষিত তথ্যাবলি থেকে জানা যাচ্ছে যে, কেবলমাত্র ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ অর্থবর্ষেই সরকারি হিসাবে গণিত তপসিলি জাতি ও উপজাতির মানুষেরা সরকারি হিসাবে প্রাপ্য প্রায় আশি হাজার কোটি টাকা থেকে প্রবঞ্চিত হয়েছেন।

অর্থাৎ এই গবেষণার ফলাফল নিম্নোক্ত নির্মম সত্য বিষয়গুলিকে আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরছে—

(১) স্বাধীনতার পর থেকে ভারতের শাসক দলগুলি কখনই তপসিলি জাতি-উপজাতিগুলির মানুষদের উন্নয়নে আগ্রহী ছিলেন না।

(২) সাংবিধানিক শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে ঐ পশ্চাদপদ জাতিগুলির উন্নয়নের জন্য তাঁদের জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে প্রাপ্য অংশের বেশিরভাগই তাঁদের উন্নয়নে ব্যয়িত না হয়ে অর্থনৈতিকভাবে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের পোষণে ব্যয়িত হয়ে চলেছে। তার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে (৩) হাতসর্বশ্রম তপসিলি জাতি-উপজাতিগুলি তাঁদের ন্যায় প্রাপ্য থেকে পারাধারিকভাবে বঞ্চিত হয়ে ক্রমশ অধঃপতিত জীবনযাত্রায় পর্যবসিত হচ্ছেন।

এ যে মারাত্মক ব্যাপার! আজ পর্যন্ত প্রায় সকলেই জানেন যে, অ-তপসিলি জনগণের প্রাপ্য বাজেট বরাদ্দের অংশভাগ থেকে বেশ কিছু পরিমাণে টাকা কেটে নিয়ে তা তপসিলি জাতি-উপজাতিগুলির মানুষদের প্রাপ্য অংশভাগের সঙ্গে জুড়ে পাওয়া ব্যয়বরাদ্দের টাকায়

শেখোক্ত মানুষদের পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে তোলার জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাটি প্রচলিত রয়েছে আর সেই জন্যই তো উদারমনা ভ্রাতৃলোকেরা এমন একটি মহৎ প্রয়াসে নিজেদেরও অবদান করে ভেবে যথেষ্ট তৃপ্তিবোধ করতেন এবং হিংসুটে ভ্রাতৃলোকেরা হিংসের জ্বলেপুড়ে যেতেন। এখন তো বোঝা যাচ্ছে যে, সর্বসাধারণের জন্য এই কথাটি আদৌ সত্য নয়, বরং সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনাটিই সত্য অর্থাৎ নিম্নে রিক্ত তপসিলি জাতি-উপজাতিগুলির প্রাপ্য এক বড় অংশের টাকায় বস্ত্রত পুষ্টি হয়ে চলেছেন উচ্চ ও মধ্যবিত্ত ভ্রাতৃলোকেরা।

অনেকে বিষয়টির সত্যতায় সংশয় প্রকাশ করছেন। তাঁদের কাছে একান্ত অনুরোধ, পুরোনো তথ্যের কথাটা ছেড়ে দিন, এবারের বাজেটে দেখুন তপসিলি জাতি ও উপজাতিগুলির জন্য যথাক্রমে ১৬% এবং ৯% টাকা ব্যয়-বরাদ্দ ধার্য হয়েছে কিনা; দেখবেন, তা ধার্য হয়নি এবং রিক্ততম তপসিলি উপজাতিগুলিই কেবল ২৩ হাজার কোটি টাকা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

আমরা নিশ্চিত, বিবেকবান ভ্রাতৃলোকেরা সমাজের পশ্চাৎপদ অংশের মানুষের প্রতি এমন জঘন্য প্রতারণার শরিক হতে চান না; শুধু এর আগে বিষয়টি তলিয়ে দেখেন নি বলে কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন নি। স্বাভাবিক কারণে তাই প্রশ্ন জাগে—

বিষয়টিকে বিশিষ্টজনেরা ইতিপূর্বে গুরুত্ব দিয়ে ভেবে দেখেন নি কেন? তাঁদের না-ভাবার কারণ এই যে, তাঁরা একটু আগে উল্লেখ করা ধারণাটি পোষণ করতেন। বস্ত্রত সেটি ছিল শিল্পবিপ্লবের ইউরোপীয় সংরক্ষণের ধারণা। অব্যবহিত পরবর্তীকালের কলে-কারখানার উৎপন্ন বিপুল পরিমানের পণ্যের বাজার তৈরীর স্বার্থে বৃহৎ রাষ্ট্রের এবং ক্রমবর্ধমান ক্রয়ক্ষমতা সম্পন্ন অধিক সংখ্যক ক্রেতার প্রয়োজন মেটানোর জন্য তখন ইউরোপে জাতিরাষ্ট্রের (যেমন ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ড মিলে ইউনাইটেড কিংডম) এবং সেই জাতিরাষ্ট্রের অনগ্রসরদের সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়েছিল। উপযুক্ত পরিকল্পনা সার্থকভাবে রূপায়নের ফলে সেখানে অবিলম্বে সংরক্ষণের প্রয়োজন শেষ হয়ে গিয়েছিল। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার যেসব দেশে বহুজাতিক জাতিগত বৈষম্য বিদ্যমান ভারতের মত সংরক্ষণ ব্যবস্থা সেসব দেশে এখনও চলছে। সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে জাপানেও।

ভারতে আধুনিক সংরক্ষণের প্রবর্তন ঘটেছিল ব্রিটিশ আমলে তবে তা পূর্বের ইউরোপীয় উদ্দেশ্যে নয়। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশরা এদেশের পশ্চাৎপদ অংশের নিপীড়িত মানুষদের রাষ্ট্রশাসনের কার্যকরী ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে রাখার উদ্দেশ্যেই সংরক্ষিত করেছিলেন ভারতবাসীদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা অর্পণ করার উদ্যোগপূর্বে The Government of India Act 1935-এ এদেশের নিপীড়িত মানুষদের তপসিলি জাতিবর্গ (Scheduled Castes) এবং তপসিলি উপজাতিবর্গ (Scheduled Tribes) নামে অভিহিত করে তাঁদের জন্য যথাক্রমে ১৫% এবং ৬% সরকারি চাকরি এবং যৌথ নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক

প্রতিনিধিত্বের আইনি স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের রাজত্বের সূচনায় তাঁরা যে কৃষক ও অরণ্যবাসীদের জমি ও অরণ্য কেড়ে নিয়ে জমিদার ও করদরাজাদের উপটোকন দিয়েছিলেন তা অলঙ্ঘনীয় করে রেখে চ্যবিত্ত কৃষক ও অরণ্যবাসীদের প্রতারণাকে চিরস্থায়ী করে দিয়েছিলেন।

একথা স্বীকার না করে কোন উপায় নেই যে, আইনে (১৯৩৫) স্বীকৃত সেই সংখ্যক চাকুরি ব্রিটিশ আমলে তপসিলি জাতি ও উপজাতিগুলির মানুষেরা কোন দিনই পাননি এবং নির্বাচনে তাঁদের যেসব রাজনৈতিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁরা, দু'একটি বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া, কখনও নিপীড়িত মানুষদের স্বার্থরক্ষায় দৃষ্টদৃমিকা পালনও করতে পারেন নি। তার ফলে ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতা ব্রিটিশদের হাত থেকে স্বাধীনতার নামে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রীদের হাতে অর্পিত হওয়ায় তপসিলি জাতি-উপজাতিরা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসক-শোষকদের পরিবর্তে ব্রাহ্মণ্য সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতায় দেশীয় পুঁজিপতিদের অতিলোভাভুর শোষণ-শাসনের শিকার হয়েছেন। সুতরাং তাঁদের জীবনমানের ক্রমাধোগতি কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। তাঁরা স্বাধীন ভারতের সংবিধানেও তপসিলি জাতি-উপজাতিবর্গের আখ্যা এবং সংরক্ষণ ব্রিটিশ আমলের উত্তরাধিকাররূপেই পেয়েছিলেন।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনা কমিটির চেয়ারম্যান “ড. আম্বেদকর নিজে সংরক্ষণের বিরোধী ছিলেন, তিনি এটাকে নির্ভরশীল হয়ে থাকার একটা যন্ত্র হিসাবে গণ্য করেছিলেন; কিন্তু সংবিধান যখন রচনা হয় তখন জওহরলাল নেহেরু ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা তাঁকে ১০ বছরের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা বলবৎ রাখার কথা বলে রাজী করান।” (দলিতদের জন্য সংরক্ষণে আপত্তি ছিল আম্বেদকরের-কুলদীপ নায়ার)। ড. আম্বেদকর তখন কী বুঝেছিলেন অথবা চেয়েছিলেন তার কোনো রেকর্ড আমাদের হাতে নেই তবে ইতিহাসের শিক্ষা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, শিল্পবিপ্লবোত্তর ইউরোপীয় ধারার সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির বাস্তবায়ন ব্যতিরেকে বিরাট সংখ্যক পশ্চাৎপদ ভারতবাসীর স্বাধীন মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। আর আমরা আরও জানি যে, ভারতের সংবিধানের নির্ধারক নীতিসমূহের (The Directive Principles) তালিকায় সেই কর্মসূচি প্রসঙ্গে কোন উল্লেখই নেই। এতে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, ব্রিটিশের উপযুক্ত তালিমপ্রাপ্ত নেহেরুজিরা এই বিপুল সংখ্যক মানুষকে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রী শাসক-শোষকগুলির উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকার বা না থাকার অধিকারটিই দিতে চাননি, তাঁদের তপসিলি জাতি ও উপজাতিরূপে সংরক্ষিত অবস্থায় নির্ভরশীল হয়ে থাকতে বাধ্য করেছিলেন। তার ফল হয়েছে এই যে, মাত্র ৬৫ বছরের নিরঙ্কুশ শোষণে ব্রাহ্মণ্য শাসককুল প্রত্যক্ষ শ্রমজীবী মানুষদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে নিজেদের ঘনিষ্ঠ চারটি পরিবারকে পৃথিবীর ১০ টি বিশাল ধনীপরিবারের মধ্যে স্থান করে দিয়েছেন আর পেটোয় কত কত পরিবারকে হিসাব বর্হিভূত আয়ের অধিকারী করে বিদেশী ব্যাঙ্ক টাকার পাহাড় জমানোর সুযোগ করে

দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। শুধু গণতন্ত্রের ভড়ৎকু বজায় রাখার জন্য যে রাষ্ট্রীয় হিসাব-নিকাশ না থাকলে নয় তার নিরিখে তপসিলি জাতি-উপজাতিগুলির মানুষদের বর্তমান হীনতা জীবনাবসানের চিত্র দেখে নেওয়া যাক।

পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, তপসিলি জাতি-উপজাতির মাত্র ২০.২ শতাংশ মানুষে খাওয়া-পরাই নিশ্চরতা আছে। কিন্তু ৭৯.৮ শতাংশ মানুষের নুন আনতে পাত্তা ফুরিয়ে যায়। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে চাষি কৃষক ও অরণ্যবাসী তো শ্রমকুশল, আত্মবিশ্বাসী ও স্বনির্ভর। তাই তাঁদের এমন করুণ অবস্থা হওয়ার কথা নয়। ব্রিটিশ শাসনের শুরুতে (১৭৬৯-৭০ খ্রি:) বাংলার ছিয়াত্তরের (১১৭৬ বঙ্গাব্দে) মন্বন্তরেও তাঁরা বিকল্প সংগ্রহ করে বেঁচে ছিলেন। তখনও চাষের জমি, অরণ্য এবং জলাভূমি তাঁদের অধিকারে ছিল বলে বিকল্প খাদ্য উৎপাদন এবং সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে তাঁদের কোন বাধা ছিল না। তাই তাঁরা তুড়ি মেয়ে সেই ভয়াবহ মন্বন্তরকে পার করে দিয়েছিলেন। জমির অধিকারহারা চাষি এবং অরণ্যের অধিকারহারা উপজাতি এখন ক্ষেতমজুর এবং জনমজুর। গত কয়েক বছরে সেই মজুরের কাজের সুযোগ কেমন ছিল তা একটু দেখে নিলেই শ্রমনিপুণ মানুষদের দুরবস্থার কারণটা মিলবে।

ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের স্বীকৃতি থেকে জানা গেল যে, সাম্রাজ্যবাদের চূড়ামণি আমেরিকার ব্যাঙ্ক ল্যাটে ওঠার দায়ভার বহনের ইজারাদার এই সরকার তার প্রায় পুরো দায়ভাগই তার পোষিত চোরকারবারি, রক্তবেরঙের মাফিয়া, ধনী কৃষক এবং পুঁজিপতিদের উপর না-চাপিয়ে সমাজের পঞ্চাংগদ অংশের মানুষদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের উন্নয়নের জন্য ব্যয়-বরাদ্দের টাকায় সরকার আমেরিকার মন্দার আঘাত সামলে দিয়ে কৃতি লাভ করেছেন। আর তার ফলে টাকার অভাবে নিরন্ন মানুষদের কাজের সুযোগটিই উড়ে গেছে বলে ফিখের জ্বালা মিটানোর জন্য এক টুকরো রুটিও তাঁদের জোটেনি রোগ-অপুষ্টি-অনাহারে যাঁরা অশক্ত হয়ে পড়েছেন তাঁরা মৃত্যুগহ্বরে মুখখুঁড়ে পড়েছেন এই অপমৃত্যুর তালিকার শীর্ষে রয়েছেন তপসিলি জাতি-উপজাতির নারীরা।

সদ্যপ্রকাশিত The Human Development Report 2013 অনুসারে বহুমাত্রিক দারিদ্রসূচকের (Multiple Poverty Index) বিচারেও তাঁরাই সর্বাধিক প্রবঞ্চিত। ["Gender inequality in India among the worst in the world," The Times of India, Kolkata, March 18, 2013]

এই সরকার চোরকারবারি, মুনাক্ষাখোর মহাজন এবং নানা ধরনের মাফিয়াদের কীভাবে পোষণ করে চলেছেন তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ না-দিলে চলে না।

বাস্তব অবস্থা যখন এমনই ভয়াবহ তখন সরকারি নির্লজ্জ প্রচার কিন্তু তুঙ্গে যে ক্ষুধার বিরুদ্ধে প্রবল যুদ্ধ চলছে! তাহলে কি কয়েকি স্বার্থের ধ্বংসধারী লোভাতুর ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রীদের লোভের ক্ষুধা মিটানোর জন্য সরকার প্রবল বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছেন?

— সম্ভবত, হ্যাঁ। তথ্যাবলির ভিত্তিতে অন্য কোন উত্তর মেলা ভার।

এবার তপসিলি জাতি ও উপজাতিগুলির যেসব মেধাবী সন্তান হিমালয়তুল্য প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে গ্রাজুয়েট, পোস্টগ্রাজুয়েট, পি.এইচ.ডি., এম.বি.এ. ইত্যাদি উচ্চতম ডিগ্রী অর্জন করেছেন তাঁদের কর্মসংস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করা বিশেষ প্রয়োজন।

রূঢ় সত্য এই যে, তাঁরা কর্মহীন, বেকার এবং তাঁদের নিজেদের এবং তাঁদের পরিবারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠেছে। ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রীয় নির্দেশে চালিত শিল্পোদ্যোগ, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা ইত্যাদিতে চিরকাল তাঁরা অবান্ত্রিত ছিলেন এবং এখনও অবান্ত্রিতই রয়েছেন তাঁরা কেটা নির্ধারিত সংরক্ষিত সরকারি পদেই কেবল অনন্ত টালবাহানার শেষে কালোভদ্রে দু'চারজন চাকরি পেতেন। এখন থেকে ১৮ মাস আগেকার সংবাদে প্রকাশ যে, তপসিলি জাতি ও উপজাতির প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত ৩৫,০০০ পদ কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তরসমূহে খালি পড়ে আছে এবং সেই পদগুলি পূরণ করার জন্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে চলেছেন ["Special Drive to fill Quota Vacancies", The Times of India, Kolkata, November 20, 2011]। সেই উদ্যোগ কার্যকর হয়নি এখনো। ইতিমধ্যে অন্তত আরও ৫,০০০ খালি পদ সেই সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ অধিকাংশ কেন্দ্রীয় সরকারি পদ থেকে তপসিলি জাতি ও উপজাতিগুলির উচ্চশিক্ষিত মানুষেরা বিতাড়িত হয়েছেন, বাকি যাঁরা আছেন তাঁরাও অচিরে বিতাড়িত হবেন এবং অতঃপর ঐ পদগুলি অপূর্ণই ফেলে রাখা হবে। সোজা কথায়, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রী সরকার তার অফিসগুলিকে ব্রাহ্মণ্যপদ্ধতি স্বীকৃত শুদ্ধিকরণের অযোযিত কর্মসূচী পালনের পরিকল্পনা করেছেন বলে তাঁর কাজের ধারা থেকে অনুমিত হয়। এই প্রসঙ্গে শুধু এটুকুই বলা যায় যে, তাঁরা আত্মঘাতী পথ ধরে এগিয়ে চলেছেন।

এতো জানা কথা যে, কোন দেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি তার শ্রমশক্তির শ্রমে-ঘর্মে রচিত হয়। তার ফলে সবল শ্রমশক্তিই কেবল সবল অর্থনীতির বুনিয়ে গড়ে তুলতে পারে। শ্রমশক্তিকে দুর্বল করে ভারতের শাসককূল দেশের অর্থনীতির বুনিয়ে এবং সেই সূত্রে দেশে ঐক্য ও সহিতিকে বিপন্ন করে তুলেছেন। এভাবে চলতে থাকলে অনতিবিলম্বে দেশ খন্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে। দেশের শ্রমশক্তিকে সকল করে তুলে এখনও সেই বিপর্যয় রোধ করা যায়। শিল্প বিপ্লবোত্তর ইউরোপের জাতিরাষ্ট্রগুলির আদলে এবং তৎপরণতার ভারতের তপসিলি জাতি-উপজাতিগুলিকে সংরক্ষণের মাধ্যমে অচিরে অগ্রবর্তী করে তুলে এনে সবল শ্রমশক্তিকে সহিত করা এখনও সম্ভব।

ভারতের বস্টারী
শাসককুল কি তা বুঝবেন?

WHEN SOME ARE LESS THAN EQUAL

Share in Income and Expenditure BY CASTE GROUP

India's scheduled caste, who make up 16.2% of the population, are poorer than scheduled, more marginalized and in lower-paying jobs than people belonging to 'upper' caste. (see table) Caste against Dalits based on their caste alone, reservation and non-reservation remain constant, particularly in rural India. They also face difficulties in filing police complaints to getting a fair trial. (see box)

Social group	Population	Income	Expenditure	Surplus Income
SC	8.7	5.3	5.7	0.4
ST	10.8	11.8	13.0	1.2
OBIC	41.5	7.73	8.31	0.58
Upper Caste	38.1	45.4	42.7	2.7

All figures as % of total source: NCERT's National Survey of Household Income and Expenditure 2004-5

[The Times of India, Kolkata, June 13, 2011]

UPA flagship NREGS sees sharp slide in job creation

LOSING SHEEN

MGNREGS Work (crore persondays)

Dalits, Women
Hardest Hit

Subodh Varma

Year	Total	SC	ST	Women
2009-10	284	86	59	136
2010-11	257	79	54	123
2011-12	211	47	38	102
2011-12 (as of Feb 2)	146	33	23	78
Decline over 4 years (%)	-48	-52	-61	-43

Source: Ministry of rural development

[The Times of India, Kolkata, Feb. 03, 2013]

Netus duping dalits and tribals ?

Neglect, Politicians; Insincerely Result in Slow, Patchy Uplift Of Deprived

Subodh Varma
Times Insight Group

ROBBERY OF THE HAVE-NOTS

	SC		ST	
	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
Plan Allocation (Rs. crore)	23,153	30,501	9,221	8436
Share of Total (%)	8	9	3	5
Share Entitled To (%)	16	16	9	9
Deprived of (Rs. Crore)	25,247	22,890	15,004	12,187

Scheme for hungry in shambles

Grain Allotted
By Govt Not
Reaching Poor;
Ration Cards
Undistributed

WHAT YOU SEE ISN'T WHAT YOU GET	How the ration system works on the ground					
	West Bengal	MP	Uttar Pradesh	Bihar	Assam	Orissa
Offtake	94.8	97.4	79.1	86.2	94.2	86.3
Getting less	NA	75	56	100	100	38
Paying more	63	58	58	100	100	42
Discrepancy in records	80	27	87	100	84	8
Interruption in supply	73	23	23	75	100	25

All figures in %

8th Report of the States Studies

[The Times of India, Kolkata, December 10, 2010]

Suicide biggest killer of young women in India

TOP 10 CAUSES of disease burden among 15-49 year old women in India, 2010

Disease/Condition	% of total disease burden	No. of deaths (% of total deaths)
Suicide/self harm	5.8	78,200 (9.6)
Iron-deficiency anemia	5.1	1,700 (3.2)
Iron-deficiency anemia	5.1	1,700 (3.2)
Major depression	5	
Injury from fire, heat, hot substances	4.9	68,700 (8.5)
Maternal disorders related to child birth	4.8	63,600 (7.8)
Low back pain	3.8	
Chronic obstructive lung disease	3.4	18,700 (2.3)
Tuberculosis	3.3	44,600 (5.5)
All causes	100	8,12,500 (100)

*Includes death and disability

আর্যদের ভারতে আগমন ও তিনটি প্রশ্ন

সমীক্ষা কুমার বাউড়ে

লিখিত ব্যক্তি মাঝে মাঝে কয়েকশী ইতিহাস জ্ঞানের অধিকারী। বস্তুত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পাঠ্যসূচিতে ইতিহাস একটি বিষয় থাকার জন্য সাধারণভাবে ইতিহাসের প্রচলিত ধারনা হয়ে বেড়ায় অধিকাংশ মানুষ। খুব কম লোকই আছে যারা যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ দ্বারা ফেলে আসা লিনগুওলো দেখতে চায়। ফলে সেখানে অনেক ভুল তথ্যের মাঝে ঐতিহ্যের উদ্ভাবিকারী হিসাবে মোহজুহু হতেই ভালোবাসে মানুষ। আমরা আর্যদের আগমন ও তাদের কর্মকাণ্ডকে তেমনই দেখত শক্তির মিশ্রণ হিসাবে দেখছি ও মোহজুহু হয়েছি। প্রচলিত ইতিহাসকে কখনও গ্রন্থের মুখোমুখি দাঁড় করাইনি। অথচ আর্যদের ভারতে আগমন, বিস্তার, তাদের কৃত তথ্যকথিত বৈদিকসভ্যতা ইত্যাদির সাথে যুক্ত হয়ে আছে কত হাজার অতিকথন, প্রশ্ন তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাইনি। সব প্রশ্নের অবতারণা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয় এবং তা সম্ভবও নয়। আর্যভারতের সাথে যুক্ত মূলত তিনটি বিষয়কে একবিংশ শতাব্দীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। সেগুলি হল—

- ১) আর্যদের বৈদিকসভ্যতা কি আদৌ উন্নত ছিল?
- ২) যোড়ার ব্যবহার কি অন্যর ভারত জ্ঞানত, না কি আর্বরাই খোজা এনেছিল?
- ৩) লোহা গলানোর প্রকৃত করিণর করা?

সংক্ষেপে যুগে নেওয়া যাক কারা আর্য ছিল, তাদের আবাসস্থান কোথায় ছিল। ভাষাশাস্ত্র—সাহিত্যের ঐতিহ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ইরানীয়দের সাথে ভারতীয় ধর্ম বিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি, আচার বিচারের অনেক মিল আছে। প্রাচীন ইরানীয়দের ‘আবেস্তা’ ও প্রাচীন ভারতীয়দের ‘ঋগ্বেদ’-এর সঙ্গে এমন অনেক সাদৃশ্য আছে। আবার আর্যদের চেনা পশুপাখি, গাছপালা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক বলেন—আর্যরা ইউরোপ থেকে এসেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের বলকান দেশসমূহের থেকে এসেছিল। কিন্তু অধিকাংশ প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্বাস করেন যে এই জনগোষ্ঠী দক্ষিণ রাশিয়ার উজাল পর্বতমালার কাছ থেকে ইরান হয়ে ভারতে ক্রমে প্রবেশ করেছিল পাণ্ডুর মালভূমিকে আদি আর্যদের বাসস্থান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। অবশ্য একদল ইতিহাসবিদ প্রমাণ করার চেষ্টা করেন—ভারতই আর্যদের আদি নিবাস। কিন্তু দ্রাবিড় ও আর্যদের ভাষা, সংস্কৃতি এবং সভ্যতার পার্থক্য থেকে এই যুক্তির অসারতাই বেশি পরিলক্ষিত হয়। ষষ্ঠ খ্রিষ্টাব্দে কিলিসিয়া সাসানি সংস্কৃত

ভাষার সাথে ইউরোপের মূল ভাষাগুলির মিল বুঝে পান। গন্যন্য তথ্যসূত্রে আর্যদের বাইরে থেকে অনুপ্রবেশকেই সমর্থন করে। মূলতঃ ধরা হয় তারা ককেশিয়ার অঞ্চল থেকে এসেছিল। আর্যরা যাবার হিসাবে এই সমস্ত সম্ভবত রচিত হয়েছি ১২০০-১০০০ খ্রিষ্টপূর্ব। প্রবেশ করে। ম্যাক্সমুলার-এর মতে অশ্বম শব্দবৎ রচিত হয়েছি ১২০০-১০০০ খ্রিষ্টপূর্ব। আর্যদের আগমন ঘটেছিল ২৫০০-১৫০০ খ্রিষ্টপূর্ব। সত্য আদিমুত মোহেরগড় সভ্যতাকে ধরে সিদ্ধুসভ্যতার বয়স দাঁড়ায় প্রায় আট হাজার বছর। সাংস্কৃতিক খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় মোহেরগড় থেকে মহেঞ্জাদারো-হরপ্পার বিপুল বিকৃত অঞ্চলে রয়েছে অনেক গণকবর। অধিকাংশ দেহগুলির মৃত্যুজনন করা হয়েছিল অস্থি কঙ্কালের বয়স এবং আর্যদের ভারতে আগমনের বয়স মেগাসটি সমসাময়িক। ঐতিহ্যগত সিদ্ধুসভ্যতা ঋগ্বেদের অন্যতম প্রধান হিসাবে আর্যদের বর্ননাক্রমণকেই দায়ী করে। মুকটী নরকঙ্কাল অধিকাংশের ফলে আর্য আক্রমণের তত্ত্বই বেশী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিছু গিছু পণ্ডিত অবশ্য আর্যদের অনুপ্রবেশকে দেখেছেন অতি উন্নত জনগোষ্ঠী দ্বারা পচাৎপাৎ দ্রাবিড় আদিবাসীদের পদনত করা হিসাবে। সিদ্ধুসভ্যতা অবিদ্যুত হওয়ার পরও কেউ কোঁ এই অবৈজ্ঞানিক তত্ত্বখা আওড় আসছেন।

আমাদের প্রতিনিয়ত শেখানো হচ্ছে আর্যরা গ্রামভিত্তিক সভ্যতা গড়ে তোলার ফলে সেশে কৃষি, ধর্ম-সাহিত্য, শিক্ষার সমৃদ্ধি ঘটেছিল। প্রশ্ন হচ্ছে আর্য কৃষিটাই বা শিখল কখন? তথ্য প্রমানের ভিত্তিতে এ বিশ্বাস এতদিনে দৃঢ় হয়েছে আর্যরা ছিল যাবাবর, পশুপালক। খাদ্যাভ্যবেশে একস্থান থেকে অন্যত্র প্রতিনিয়ত তাদের যেতে হ়। কৃষি গড়তে দরকার স্থায়ী জনবসতি এবং প্রকৃতি নির্ভর শ্রম সাধনা, যা আর্যদের কোনে কানেই ছিল না। তারা বে সমস্ত অঞ্চল থেকে এসেছিল তাদের মধ্যে এখনও অনেকাংশ বেদুইন চরিত বর্তমান। সুতরাং একথা মেনে নেওয়া খুব মুশকিল—ভুট করাত করত আসা জনগোষ্ঠী এসেই চাষাবাদের মতো একটা শ্রমনির্ভর শিল্প আয়ত্ব ও তার উন্নতি সরন করেছিল। ভারতের মত শাস্ত্র সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ থাকতে থাকতে তারা হয়ত দ্রাবিড়দের কাছ থেকে কৃষিকাজ শিখেছিল ধারাবাহিক ভাবে। আজ সারা বিশ্বে প্রমানিত সভ্যতায় নগর সভ্যতার বিকাশ ঘাসের আগে ঘটেছিল তারা উন্নত জাতিতে পরিণত হয়েছে। নামাদের দুর্ভাগ্য যে আর্বরা আসার প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে নগরসভ্যতা দ্রাবিড়রা গড় তুলেছিল। আর্বরা নাকি সুর-দেবতা, আর দ্রাবিড়রা-অসুর। আর্য নামক তথ্যকথিত দেতারা সমৃদ্ধ সভ্যতা ধ্বংস করে আমাদের দেশের বিকাশকে সাড় অট হাজার বছর নি্যায়ে দিয়েছে। নগরসভ্যতার সাথে দ্রাবিড় সভ্যতায় কৃষিরও ব্যাপক বিকাশ ঘটেছিল। প্রতিনিয়ত অধিকার আমায়ের অবাক করে দেয় যে সেট থেকে চাষাবাদ ছিল অত্যন্ত বিজ্ঞান ভিত্তিক। আমরা একবিংশ

ডোকরা একটি আদিবাসী নিম্ন হিসাবে স্বীকৃত। যদিও এই নিম্ন সাধনার সাথে যুক্ত লোকদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার আদিবাসী হিসাবে স্বীকারই করে না। কিন্তু চেহারা ও ভাষায় অস্ট্রিক শব্দ থাকায় তাদের মধ্যে আদিবাসী লক্ষণ স্পষ্ট। ভারতবর্ষে প্রাপ্ত প্রাচীনতম ডোকরার নিদর্শন—মহেশ্বেনারোতে প্রাপ্ত সুন্দরী নর্তকীর মূর্তি। খোপায় কটি, গলার হার, হাতে চুড়ি পরে অপরূপ ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে এক নর্তকী। দ্রাবিড় সভ্যতার আবিষ্কৃত ডোকরার বয়স ৪০০০ বছর-এরও বেশী। কী অপরূপ প্রাচীন নিদর্শন। ছত্রিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মত রাজ্যে ডোকরা শিল্পীরা এখনও একেবারেই অসমিত পদ্ধতিতে তামা গলিয়ে শিল্পসম্রাটী বানায়। তাদের সৃষ্ট শিল্পকর্মের মধ্যে আদিবাসী চেহারা ও লোকসংস্কৃতির ছাপ স্পষ্ট। তারা যে পরিমল আপ ব্যবহার করে তার থেকে সামান্য তাপ বাড়ালেই লোহাগলে যায়। আর যাবতরগা বরষা তাদের ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের তাগিদে লোহা গলনকারীদের বা তামা গলনকারীদের অবজ্ঞার চোখে সেখা এসেছে অনিবার্য। তামা গলনকারীরা কোনোদিন কর্মকারদের পেছা গ্রহণ করেছে এমন প্রমাণ নেই। তারা বরাবরই শ্রমবিমুখ পরজীবী জাতি।

আর্যরা এসেছিল সেখানে লোহা কেন, লোহার আকর সেখাও সম্ভব নয়। যারা লোহা দেখেন না, যারা তামা গলাতে শিখেন না তারা এমনশে এসেই লোহার ব্যবহার চালু করে দিল। লোহা গলানোর বিদ্যা কি আর্যদের জানা ছিল? জানা ছিল কি লোহা থেকে ইস্পাতের আয়ুধ নির্মানের কৌশল? লোহা গলানোর কাজ যার করে তাদের প্রতি ব্রাহ্মণদের খুগা আর্য আগমনের থেকেই। অথচ হাতের কাছে দলমা, গুরুমহিবানী পাহাড়ে সর্বোচ্চ মানের সৌহ আকরিকের অফুরন্ত ভান্ডার। প্রাচীনকালে তামাকুড়িতে তামা গলিয়ে কুড়ল বানিয়েছিল কারা? আর্যরা তো এ অঞ্চলে ঢুকেছে খ্রিস্টপূর্ব শতাব্দীতে। কাঠকমলার চুড়ীতে হাপর বা ভগ্না ব্যবহার করে লোহা গলানোর মত তাপ পরবর্তীকালে মৌর্যযুগের ধাতু নিষ্কাশককারীরা আরম্ভে এনেছিল। মানুষগুলোর পরিচয় কি? নির্দিষ্টায় বলা যায় তারা অন্যায় অর্থাৎ ভূমিপুত্র। তামাকুড়ির কুড়েলটি বয়স দশহাজার বছরও হতে পারে কিংবা তারও বেশী। আর্য যাবতর গণ্ড পালকদের লোহা-তামা গলানোর কাল্পনিক গল্প লোহার পাথরবাটির মত দাঁড়াল না কি? আর্যরা এসেছিল লুট করতে করতে। তাদের সাথে কোনো মহিলা পর্যন্ত ছিল না। যেহেতু গায়ের রং ফর্সা ও গায়ের জোর তাদের বেশী ছিল তাই তারা পরাজিত দ্রাবিড়দের মালিক সেজে বসল। জৈবিক চাঞ্চল্য ও বংশ বিস্তারের জন্য তাদের দরকার ছিল নারীদের। তারা যথা হল দ্রাবিড় মেয়েদের বিয়ে করতে। অসুর বা এই শূদ্র নারীদের গর্ভজাত সন্তানদের নিয়ে তারা গড়ল মহাকাপারে। শূদ্রের গর্ভজাত সন্তান কি করে আর্য বা ব্রাহ্মণ হয়? তখন তারা তাকে পৈতে দিয়ে বা উপনয়ন করে দ্বিজ করল। ব্রাহ্মণ হল। মনুসংহিতার কারণে এখনও সব নারীই শূদ্র। ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মানো সব ছোলে-মেয়ে শূদ্র হয়ে জন্মায়, দ্বিজ করে ছেলোদের ব্রাহ্মণ করা হয়। ব্রাহ্মণের মেয়ে কিন্তু চিরকাল শূদ্র থেকে যায়। তাদেরও গায়ত্রীমন্ত্র পাঠের অধিকার নেই। এত কথা

শতাব্দীতে এসে হয়েছে হাতে বুজতে পারছি নগরায়ণ ও শিল্পায়ণ কতটা জরুরী দেশের উন্নয়নে। তা না হলে আর্যদের দারী করব না দেশের এই পশ্চাৎপদতার জন্য? যাদের আগমনই জাতিকে পিছিয়ে দিল সাথে আট হাজার বছর বা তারও বেশী।

লোহার কথা

বলা হয়, আর্যরা নাকি লোহার ব্যবহার শিখিয়েছিল দ্রাবিড় ভারতকে। ভাষা অসত্য কথা। আর্যরা আসার অনেক আগেরই মধ্য ভারতে তামা গলানো পদ্ধতি জানত দ্রাবিড়রা। প্রমাণ করা যেতে পারে যে মধ্য এশিয়া কিংবা ইরানে উন্নতমানের লৌহ আকরিকের ভান্ডারটি কেন অঞ্চলে অবস্থিত? কোনো কালে কি তেমন কোনো লৌহ ভান্ডারের অস্তিত্ব ছিল? আর্যরা কবে কখন শিখল লোহা থেকে ইস্পাত আয়ুধ নির্মানের কৌশল? স্বাধে এসবের কোনো উল্লেখ নেই কেন? লোহা বা ইস্পাত বোঝানোর মত কোনো প্রতিশব্দই ছিল না প্রাচীন বৈদিক ভাষায়। পুরাণের গল্প মতে আর্যদের নায়ক ছিল ইন্দ্র। বেদের এই গল্পে হিন্দুদের অগাধ বিশ্বাস। ইন্দ্রের মত বীরযোদ্ধা আর কেউ ছিল না। অসুরদের তুড়ি মেয়ে নিধন করে ফেলাতে পারত। তার হাতে বজ্র নামক অস্ত্র সর্বত্র বিরাজমান। এ ছবি আমাদের মানসচক্ষেও পৌঁছে আছে। বজ্র তৈরী হয়েছিল দলীটি মুনির হাড় দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে যুগেরও অনেক আগে হাড় দিয়ে অস্ত্র তৈরী হতো কারণ তখন মানুষ ধাতুর ব্যবহার জানত না। তা হলে আর্যরা লোহার ব্যবহার বা লোহার অস্ত্র বানাতে জানত-এ কথা বিশ্বাসের যৌক্তিকতা কি?

আদিবাসী-কোলদের একটি গোষ্ঠী এখনও 'অসুর' নামে পরিচিত। ছোটনাগপুর মালভূমির বিভিন্ন অংশ এবং উত্তরবঙ্গের চা-বাগানে বহু 'অসুর' শ্রমিক হিসাবে কর্মরত। ওলমা ও লোহারদাগা অঞ্চলে এদের বসবাস। এরা লৌহ-মাটি বা আকরিকের লোহা গলাতে পারে। পূর্ব পুরুষিয়ার অসুর গোষ্ঠীর মানুষেরা তামা গলাতে পারে এবং বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র তৈরী করতে পারে। পরবর্তীতে এরা বালদা ও বাঘমুড়িতে অসুর-কামার নামে পরিচিত হয়। তাদের তৈরী নানান লোহার দ্রব্য বিভিন্ন জনগোষ্ঠী চাষীদের কাজে ব্যবহার করে আসছে অনানি কাল থেকে। পার্সিদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা অনুসারে 'অহর' হল সর্বোচ্চ দেবতা। সংস্কৃতে 'সু' ইরানীয়দের 'ই' উচ্চারণযুক্ত। বারবার ভারতে আর্য-আক্রমণ হয়েছে এবং তাদের প্রতিহত করেছে প্রাগজবরা। তারা কলবান, নগরসভ্যতা সৃষ্টিকারী। 'অহর'দের আর্যের উচ্চারণ বিকৃতি করে বানিয়ে দিল অসুর। আজকের আড়খন্ডে, পশ্চিমবঙ্গের পূর্ববঙ্গিয়া, বাঁকুড়া, মেদীনীপুর (পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলিতে লোহা গলনকারী জনগোষ্ঠী অসুর বা চাপুয়া কামার নামে পরিচিত। আর্য যাবতরগের আগমনের কথ আগেই তারা এ বিদ্যা আয়ত্ত্ব করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় আউসগ্রাম (১) ব্রাকের দরিয়াপুর, বাঁকুড়া জেলার বিকনা ও পশ্চিম মেদীনীপুর জেলায় ডোকরা শিল্পীরা বহুদিন ধরেই কাজ করে চলেছে।

বঙ্গের উদ্দেশ্য এই যে আদিত্যে অর্থাৎ আগমনপূর্বে তারা নিজেরাই সামাজিক অস্থিরতা ও বিপন্নতার মধ্যে ছিল। সুতরাং লোহার ব্যবহার কেন, কোনো কড় কাজই তাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়।

নিরীক্ষার সুত্ববিন্যাস প্রাপ্তনে অবস্থিত লৌহস্তম্ভ চম্পুও মৌর্যের সময় তৈরী হয়েছিল। আনুমানিক সময় ৯১২ খ্রিষ্টপূর্ব। মৌর্যেরা ছিল অনার্য। আদিম্যুদ ছিল উর্যগিরি ওহার মধ্যে। স্তম্ভটির উচ্চতা ৭.১২ মিটার, বেড় ১.১৭ মিটার। প্রাচীন পরম্পরা মেনে লোহার কাজ হত মধ্যভারতের ধর বা লৌহপুরা এবং হোহলিপিরে। এও অনার্যদের সৃষ্টিশীল কর্ম। যার গঠনশৈলী আজও বিশ্বকর। সুতরাং আর্থদের লোহার প্রচলন তত্ত্ব মানতে হলে এই প্রসঙ্গগুলোর উত্তর দিতে প্রস্তুত কোনো ঐতিহাসিক?

আর্থদের দ্রাবিড় ভারতকে যোড়ার ব্যবহার খেচানোর গল্প যোড়ার ডিমের মত একটি অঙ্গীক ফল। একবার খানিকটা যুক্তি থাকতে পারে যে অর্থাৎ যোড়ার চড়ে এদেশে অনুপ্রবেশ করেছিল। তাদের ক্ষিত্রতা, সৈনিক শক্তি, যোড়ার গতি ইত্যাদি অনার্য সভ্যতার সাধকদের পরাজিত করতে সহায়তা করেছিল কারণ দ্রাবিড়রা ছিল নগরায়ণ, কৃষি, নৃত্যগীতি, অলংকারণ সাধনার ব্যস্ত। তাদের শক্তিসাধনার প্রয়োজন হানি। জীবিকার অনিশ্চয়তা তাদের ছিল না। আর্থরা নিজাদের বেস্তার বংশধর মনে করত। প্রাথমিক ভাবে কান্দীর তৎসংলগ্ন অঞ্চলকে তারা দেবতার রাজ্য বা স্বর্গ হিসাবে ভাবত। মেহেগড়-নিম্বুসভ্যতা ধ্বংস করে আর্থরা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। ঋতু বৈচিত্র্য, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, চাহিদার চাইতে খাদ্যের পর্যাপ্ত যোগান প্রাচীন অসুর সভ্যতার মানুষ যেমন ছিল আর্যমণ্ডির তেমনি সাম্যবাদী ও মানবিক। ফলে দুর্বল লুণ্ঠনকারী যাবতবনের প্রতিহত করা প্রাথমিকভাবে সম্ভব হয় নি। পরে আর্থ আক্রমণের সময় অসুররা জোট বাকিল কৈবর্তগোষ্ঠীর সাথে। কৈবর্তগোষ্ঠীর নেতাকে বলা হত 'মহামণ্ডলিকা' বা মহিষ। আর্থ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রাণার্থদের যে জোট হয়েছিল তার নেতৃত্ব দেয় মহিষাসুর। দেবতা নামক আর্থরা বারো বারো অসুরদের কাছে পরাজিত হয়ে স্বর্গচ্যুত হত এবং মধ্যপ্রাচ্যে পালিয়ে যেত। অসুররা তাদের দুই লোহার অস্ত্রস্ব ব্যবহার করত। পরে অবশ্য দুর্গা নামক এক নারীর ছলকায় আমোদপ্রিয় অসুর নেতা মহিষাসুর গুণ্ডাবত্যের হাতে খুন হয়। এই স্বর্গব্যব্রের ধীজ রচিত হয়েছিল মধ্য প্রাচ্যের কোনো এক আক্রমণে পরাজিত শেখতারা (৭) পালিয়ে গিয়ে আক্রমণ নিত। পরে সংগঠিত হয়ে অতর্কিতে আক্রমণ চালাত অনার্য জনপদ, শহর গ্রামের এবং ধ্বংস করে দিত সব। তারপর হারিয়ে যার অসুরদের সমৃদ্ধ সভ্যতার ইতিহাস। আর্থ যাবতবনের ক্ষিত্রতার সাথে তারা এটে উঠতে পারেনি। কিন্তু তাতেই প্রমাণ হয়ে গেল দ্রাবিড়ভারত যোড়ার ব্যবহার জানত না? আমরা প্রত্যেকেই জানি কচ্ছের রূপ ওজরাটে অনান্দিকাল থেকে থাকার বিতরণভূমি।

এখন প্রমাণ মিলছে ওজরাটে তথা উত্তরভারত একটা বিশাল অঞ্চল বসি হররাসভ্যতার বিস্তার ছিল। এটা ধরা যেতে পারে যোড়ার পূর্বপুরুষ থাকার সাথে ভারতের অনেক আগেই পরিচয় ছিল। তারা সৈন্যদলি কাজেও ব্যবহার করত।

এখন আমরা প্রায় সকলেই জানে গেছি ভীমবেটকার কথা। ভীমবেটকার পাথরের গম্ব ২৪৩ টি প্রস্তরখণ্ডে অসাধারণ রক পেটিং আবিষ্কার হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের বিছাচালে পর্বতমালায় দক্ষিণ দিকে এতলি ডি.এস. ওয়াকারের ১৯৫৭ সালে নথীকৃত করেন। এই অঞ্চলে সর্বমোট এরকম ৭০০ টি প্রস্তরচিত্র আছে। এই প্রস্তরচিত্র বা ওহাচিট্রগুলির বয়স অনুসারে ৭টি ধাপে ভাগ করা হয়েছে। আদিপর্ব প্রায় সেকুলক এবং শেষতম পর্ব ১০,০০০ খ্রিষ্টপূর্ব ধরা হয়। যখন ভারতে তথাকথিত সুশিক্ষিত অর্থাৎ আর্সেইনি। কি আছে সৈন্যব প্রস্তরচিত্র? তীরধনু নিয়ে শিকারশূন্য, ফুল, পাখি, বিভিন্ন পশু, যোড়ার চড়ে মানুষ যাচ্ছে, যোড়াসহ শোভাযাত্রা। অর্থাৎ যোড়ার চমৎকার ব্যবহার। এখানে যে রং ব্যবহার করা হয়েছিল তা প্রায় আধুনিক রঙেরও হার মানায়। তখন তো আর সুরলর্পন ছিল না যে ঘরে বসে আর্থদের যোড়ার ব্যবহার সেবে অনার্যরা ঐ চিত্র আঁকবে। এতে প্রমাণ হয় যোড়ার ব্যবহার অনার্যভারত বা দ্রাবিড়ভারত আর্থদের আসার বহু হাজার বছর আগেই জানত।

পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলায় খশান বা সমাধিক্ষেত্রের আশেপাশে মাটিতে পোতা এক ধরনের পাথরের গায়ে খোদাই করা রয়েছে অশ্বারোহী মূর্তি। এগুলির বিভিন্ন নাম— হিরো স্টোন, বীরস্তম্ভ, শ্রেতশিলা বা আত্মপাথর। কেউলো ক্রমবিশিষ্ট অশ্বারোহী মূর্তিটিকে বলেছেন— স্পিরিট রাইডার, যা বাংলার দাঁড়ার প্রেত-সওয়ার। তেমন প্রেতসওয়ার আনি বাঁকুড়া জেলায় খাতড়া মধ্যভূমায় নানা গ্রামে দেখেছি। এগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওতনিয়া পাথরের কণার পাশে, পুরুলিয়া জেলায় আদিবাসী বা প্রান্তিকব্রহ্মণীয় মানুষজন অধ্যুষিত প্রাচীন অঞ্চলে দেখা যায়। প্রেতসওয়ার মূলতঃ পরলৌকিক আচারের সাথে যুক্ত ছিল। এই আচারের মূল কেন্দ্র বিষ্ণুপর্বতের দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশের মাঝানবি এলাকায় বলে ধরা হয়। পরলৌকিক আচারের অঙ্গ হিসাবে পিতলের অশ্বারোহী মূর্তি পশ্চিমবঙ্গেও চালু আছে। ডোককা কর্মকাররা পিতল ঢালাই করে এই মূর্তি বানায়। কিন্তু ভারতের মাঝ বরাবর থেকে প্রেতসওয়ার 'কাষ্ট' বা ধর্মচার ছড়িয়ে পড়েছিল কেন? দুটো দুই জিনিষ-পিতলের ঘোড়সওয়ার আর শিলাপাটা কোদাই করা ঘোড়সওয়ার। তবে দুই-ই ঘোড়সওয়ারের মূর্তি আর দুই-ই পরলৌকিক আচারের সাথে যুক্ত। পশ্চিমবঙ্গের পিতলের ঘোড়সওয়ার বানায় ডোককা শিল্পীরা আর মধ্যপ্রদেশে পিতলের এবং লোহার ঘোড়সওয়ার বানায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিল্পীরা।

অনেকের বিশ্বাস করিয়ে কিংবা রাজপুত সামন্তবর্গের কৌলজার হিসাবে এটি রাজের

অঙ্গ ছিল। সেই হিসাবে এই ধর্মচার আর্থ উত্তরাধিকার বলে গণ্য করতে হয়। কিন্তু এই মুক্তিও খাটে না। কারণ—(১) শাস্ত্রে, পুরাণে কোথাও আচারটির উল্লেখ নেই। (২) মহিরাগত কোনো জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এই শ্রেতসওয়ারের যোগ পাওয়া যায়নি। (৩) অশ্বারোহী খোলাই পাথরের পাটিয়েক হিরো স্টোন বা বীরপাথর বলাও ঠিক নয়। একটা বৃহৎ শিলা বা মনোলিথ—এর সঙ্গেও এর কোনো যোগ নেই। (৪) পাথর উৎকীর্ণ শ্রেতসওয়ার আর পিতলের শ্রেতসওয়ারের মূর্তি একই সংস্কৃতিক উৎস থেকে উদ্ভূত তাও নিসন্দেহে বলা যায় না।

পশ্চিমবঙ্গে ডোকরা কামারদের বানানো পিতলের অশ্বারোহী মূর্তি জিতাষ্টমী ব্রতের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু জিতাষ্টমী বা জীমুতবাহন পূজার জন্য ব্যবহৃত মূর্তি এই ব্রতের সাথে সম্পর্কিত জীমুতবাহনের নাও হতে পারে। কারণ জীমুতবাহন ছিল নিরস্ত্র। ব্রতকথার গল্পে নরমাংস ভক্ষণকারী গরুড়কে নিজের হাতে শেতে দিয়ে সে অহিংসার পরিত্যক্তি দিয়েছিল। জঙ্গলমহলে এক সময়ে জৈনধর্মের বিস্তার ঘটেছিল কংসবতীর অববাহিকা ধরে। এর মধ্যে জৈন বা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অহিংস ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব থাকলেও থাকতে পারে। শ্রেতসওয়ার আশ্রয়শ্রেণী সজ্জিত। প্রাচীন অস্ট্রিক ভাষা সাঁওতালিতে ঘোড়ার প্রতিশব্দ “সাদম” পাওয়া যায়। “সাদম” শব্দটি আর্থভাষা থেকে ধার করা নয়। সাঁওতালি লোককথা তা তাদের ধর্মগ্রন্থ “বিনতী” তে সাদম শব্দটি অর্থহীন ঘোড়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। সিঙসাদম ছিল দুইঘোড়া যে সর্বদাই সিঙবোতার স্বয়ং সাধনা ধ্বংস করে দিতে চায়। আবার গোড় উপজাতি পারলৌলিক আচার হিসাবে পাথরের গায়ে ঘোড়া উৎকীর্ণ করে। ঘোড়ার সাথে পরিচয় না থাকলে এই সব আদিবাসীদের জনজীবন ঘোড়া এল কোথা থেকে? শুণনিয়া পাহাড়ের উপত্যকায় প্রত্নতাত্ত্বিক পত্রেশ দাশগুপ্ত একটি জীবাশ্ম পেয়েছিলেন। তার বয়স হযত কয়েক লক্ষ বছর। কঙ্কনা বিলাসীরা আর্থ ঘোড়ার আগমনের বয়স অতটা ভাষ্যতে পারবে কি?

বাকুল জেলার অসংখ্য লোকসেবতার অধিষ্ঠান। প্রাচীন জনপদে বা গ্রামে তাদের অবস্থান। একান্তই গ্রামসেবতা-আর্থ সংস্কৃতির সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। পূজা-পার্বনে ব্রাহ্মণ্য আচার আচরণ নেই। তেমন কিছু লোকসেবতার পূজাচারের সমীক্ষিত বর্ণনা দেওয়া হল—

ঝাঁপুড়ায় রাইপুর ধানার সারকোসের গ্রাম্য সেবতা ঝাঁপুড়া। শেওড়াভাটলার ধান। প্রতীক মাটির হাতি-ঘোড়া। আদিবাসী মাঝি সমাজের “গুলি” পদবিধারী ব্যক্তি তার পূজারী। পশুপাখি বলি দেওয়া হয়। কথিত আছে, তার মাথাভর্তি এলোমেলো জটা। তাই তিনি ঝাঁপুড়া।

কঁকাঠাকুর রাইপুর গ্রামে ভরতীতির দেবতা কঁকাঠাকুর। বাসুলী ধানের পানেই তার অবস্থান। শ্রীক হাতি-ঘোড়া। কোঁপে তার অবস্থান। “বড় ভোগ” (মদ) গিলে তার পূজা হয়। শান্তিনা গোত্রের লোহাররা তার পূজারি।

বনপাহাড়ী শিমলাপাল ধানার হাতিজাতির গ্রামসেবী বনপাহাড়ী। কালাপাহাড় ও বম্বু তার সঙ্গী। হাতি-ঘোড়া তাদের প্রতীক। জঙ্গলে তার ধান। তপসিনী মাঝি তার পূজারি। ষিচুড়িভোগ ও মাংস দেওয়া হয় নৈবেদ্যে।

খুতানাজ হাতনা গ্রামে আছে খুতানাজ। একটা পাথরের পাটায় বীরমূর্তি খোদিত, ফুলানাজের প্রতীক অশ্বারোহী শ্রেতসওয়ার বা শ্রেতশিলা। এমন বীরমূর্তি হাতনার কামার কুলিতে পুঁম পাথরে অসংখ্য স্থানে আছে। গবেষকরা এগুলিকে বলেন— মুন্ডারের সমাধিস্থতার নির্দেশ। এখন ব্রাহ্মণ পূজারি কিন্তু কর্মকার প্রধান ব্রাহ্মী। সংস্কৃতায়ানের কলে ব্রাহ্মণের প্রবেশ ঘটেছে অনার্য লোকধর্মে।

এমনই গ্রামসেবতার হল— আমতুশ্যা (পারভাচলি গ্রাম, ইদপুর থানা), তেঁতুলিমিলা (মনিহারী-টোলা মেহনডাঙ্গা, হাতনা), কসরাবুড়ি (কুলমুড়া গ্রাম, বোকাড়া থানা)। এইসব সেবসেবীও হাতি-ঘোড়ার প্রতীকে বিদ্যমান। প্রায় সবাই আদিবাসীদের দ্বারা পূজিত। মদ, মাংস নৈবেদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। পশুবলী, নরলব্ধিটি মোরগ বলি হয়। যদিও আদিগত সব গ্রামসেবতার পূজারি ছিল অনার্যরা কিন্তু বর্তমানে কোথাও কোথাও ব্রাহ্মণরা পূজারি। এটা অনার্য লোকজীবনে সংস্কৃতায়ানের আভ্রাসন।

যে সমস্ত গ্রামসেবতা বা গ্রামসেবীর উল্লেখ করলাম প্রত্যেকের সাথে প্রতীক হিসাবে হাতি-ঘোড়া বর্তমান। আদিবাসীরা বা অনার্যরা এই সব আঞ্চলিক সেবসেবীর পূজা অসম্ভব যাদুশক্তি ও কুসংস্কার থেকে শুরু করেছিল। পূজার উপকরণ হিসাবে ‘বড় ভোগ’ অর্থাৎ মদ, মাংস ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। পশুপাখি বলি দেওয়া হয়। এর সবগুলোই অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর আচারের সাথে যুক্ত। কিন্তু এখানে যে বিষয়টি মুখ্য তা হল— হাতি-ঘোড়াকে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার। জঙ্গলমহলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল হাতির বিচরণভূমি। কিন্তু এই পান্ডব বর্জিত রাজ্যের আদিবাসী সম্প্রদায় ঘোড়ার ব্যবহার করে থেকে জানল? শুণনিয়া পাহাড়ের লক্ষ লক্ষ বছরের প্রাচীন ঘোড়ার জীবাশ্ম আবিষ্কার, ডোকরাশিলীদের শ্রেতসওয়ার প্রস্তুত কৌশল, আদিবাসীদের পাথর পটে বীরমূর্তি খোদাই বা শ্রেতসওয়ার খোদাই, সাঁওতালী ‘বিনতী’ তে ‘সাদম’ এবং প্রাচীন জনপদ আদিবাসীদের গ্রামসেবতা হিসাবে ঘোড়ার প্রতীক ইত্যাদির মধ্য থেকে কি এ সিদ্ধান্ত নিতে পারি না যে আর্থরা আসার হাজার হাজার বছর আগেই ভূমিপুত্রদের

সাথে ঘোড়ার পরিচয় ছিল? ঘোড়সওয়ারী বীরপক্ষকে বা প্রেতসওয়ারকে ঘোড়ার ব্যবহার ছাড়া আর কি বলা যায়?

লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির নিদর্শন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করাই যাচ্ছেট নয়। এর দরকার ঐতিহাসিক মূল্যায়নও। তার জন্য উপাদান সমূহ যেমন বস্তুগত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সহায়তা করবে, তেমনি লোকসাহিত্য সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত কথাগুলি পড়ে ফেলাতে পারলে প্রাচীনতম ইতিহাসের সাক্ষ্যদানের দ্বারও খুলে যেতে পারে।

যে সমস্ত কথা সমগ্র প্রবন্ধে উল্লেখ করলাম তার ঐতিহাসিক মূল্য তেমনই বিরাট এবং সম্ভাবনাময়। এরকম নজির সারা ভারতের প্রাচীন জনপদের সাথে সর্বত্র সম্পৃক্ত হয়ে আছে। তথাকথিত ঐতিহাসিকরা এসবের দিকে ফিরে তাকানোর ফুরসৎ পায়নি। তারা ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের মাতব্বিরিতে মজে আছে দিনের পর দিন। এ কথা অস্বীকার করতে অসুবিধা নেই আমাদের ইতিহাস শিক্ষা শুরু হয়েছিল বিদেশীদের চোখ দিয়ে। সেই সব ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ এখনও মানতে চায় না ব্রাহ্মীলিপি ভারতীয় কারণ তার পূর্ববর্তী কোনো লিপি ভারতে পাওয়া যায়নি। সিদ্ধুলিপির পাঠোদ্ধার এখনও সম্ভব হয়নি। ফলত, ইউরোপীয় পণ্ডিতরা মহেঞ্জদারোতে প্রাপ্ত সিলমোহরগুলিতে উৎকীর্ণ চিহ্নগুলিকে লিপি বলেই মানতে চায়নি। সিলমোহরগুলিতে খোদিত হয়েছিল একশিঙ্গ অশ্ব বা এক সিঙওয়ালা অশ্ব সাদৃশ্য প্রাণী। সামাজিক উচ্চবর্ণের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হত। এখানেও ঘোড়ার গল্প। ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র সাহিত্যের কাল্পনিক ভিত্তির উপর ইউরোপীয় সমাজবলনের ধারণাবাহক পণ্ডিতবর্গের অলীক ‘আর্য আগ্রাসন তত্ত্ব’ দ্বাবিড় ভাষা সমূহের উপর গ্লানিকর ভাবে চেপে বসেছে। বাংলা সহ অনেক অনার্য ভারতীয় ভাষা সংস্কৃত ভাষার অপভ্রংশকার ফলশ্রুতিতে হয়েছে, এ তত্ত্ব ভাঙার সপক্ষে অনেক প্রমাণ ইতিমধ্যে হাতে এসেছে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ উল্লেখ করতে পারি—

(১) আদিমকালের আন্তর্মহাদেশীয় জনস্থানান্তরের দ্বারা উত্তর-পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল পরবর্তীকালে সভ্য মানুষদের আন্তর্জাতিক মিলনক্ষেত্রে পরিগণিত হয়েছিল।

(২) খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে ভূমধ্যসাগরীয় উত্তর-পূর্ব উপকূলের সিসিলিয়া থেকে পুরাতন প্যালেস্তাইন পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে হরিয়ানদের মিতামি রাজ্য সভ্যজাতি সমূহের বানিজ্য ও সংস্কৃতিক যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। হরম্মা-মহেঞ্জদারোর সাথেও হরিয়ানদের বানিজ্যিক আদান-প্রদান ছিল। ফলে ঐ সব অঞ্চলে আকস্মিক ভাষায় অনেক ভারতীয় অনার্য শব্দের প্রবেশ ঘটেছিল। বানমুখী লিপিতে সেগুলি লিখিতরূপ লাভ করেছিল। তুরস্কের রোগাজকর অঞ্চল থেকে মর্মর লেখরূপে রক্ষিত সেই শব্দভান্ডারের

সন্ধান মিলেছে এবং সেগুলির পাঠোদ্ধার হয়েছে। যেমন উনুন, বটি, শিক, দজ্জাল, আঁধার, ছোকড়া, অক্রা, ছুরি, আল, নাল্লা ইত্যাদি অজস্র শব্দ। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল শব্দগুলি প্রায় অপরিবর্তিতরূপে বাংলার কৃষকদের মধ্যে বিশেষত পূর্ববঙ্গের কৃষকদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এতে প্রমাণিত হয় (ক) মহেঞ্জদারো-হরম্মার সুবর্ণযুগে সেখানকার প্রাকৃতভাষীরা হরিয়ানদের সাথে ব্যবসা চালাত (খ) পরবর্তীকালে স্থানান্তর সভ্যতা গঠনের একস্তরে তারা বাংলার কৃষি সভ্যতা গড়েছিল। প্রাকৃতভাষা, তার শব্দ বানমুখীতে প্রথমে লেখন্যরূপে ব্যবহৃত হতো এবং বাংলার কৃষকদের পূর্বপুরুষেরা আজ থেকে অন্তত চার হাজার বছর পূর্বে আন্তর্জাতিক ছিলেন।

(৩) মিশরের আমরানা লেখন্যমালায়ও এমন অনেক শব্দ মেলে। যা সম্ভব হয়েছিল নানুর, বিনপুর, মহিষদল এবং মঙ্গলকেটি—এর সাথে বানিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ফলে। আমরানা লেখন্যমালার প্রাপ্ত কিছু শব্দের নমুনা— কুপি বা কুপো, ধামা, পিথাগ, বান/বণ্টা, পিসিম/শিয়াল, ঘাঁড়, বেহলা, মোচা, ঘাস, আলসে, ডাকিনি ইত্যাদি।

তথাকথিত আর্যদের মুখ নিঃসৃতবানী বিশেষত প্রাকৃতভাষার এমন বিশাল শব্দভান্ডার আছে সেখানে সংস্কৃতে তৎসম বা তৎভব—র পিছনে ছোট্টাট দিন বোধ হয় শেষ। বরফ, সুমেরীয় ও হিব্রুভাষায় বাংলা শব্দের ভান্ডার খোঁজা যেতে পারে। ভাসা সাহিত্যেও আর্য আগ্রাসনের এবং তার উৎকর্ষতার তত্ত্ব তাদের ঘর হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। প্রাকৃতাত্ত্বিক খননের ফলে বেগুতিস্তান, সিদ্ধু, গজরাট ও মহারাষ্ট্র অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মীলিপি এবং খরোষ্ঠীলিপি পাওয়া গেছে। কোনো মিশ্ররূপ যাওয়া যায় নি অথচ বাংলায় বহুসংখ্যক ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী এবং ব্রাহ্মীখরোষ্ঠী মিশ্রলিপি যাওয়া গেছে পান্ডুরাজের ঢিবি (বর্ধমান), বানগড় (দক্ষিণ দিনাজপুর), মহাস্তানগড় (বগুড়া, বাংলাদেশ), ভাওয়াল (ঢাকা), সিলুয়া (নোয়াখালী), চন্দ্রকেতুগড় (উত্তর ২৪ পরগনা), হরিনারায়ণপুর (দাঃ ২৪ পরগনা), তমলুক (পূর্ব মেদিনীপুর) প্রভৃতি স্থানে। এগুলি খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে পঞ্চম শতাব্দীর কীর্তি বলে প্রমাণিত। আর্যরা তখনও পূর্ব ভারতে আসেনি। ফলে আর্য ভাষা-সংস্কৃতির আধিপত্যবাদের তত্ত্ব প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের মহান কবি রামাই পণ্ডিত বাংলা লিপিতে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ ‘শৃণুপূরণ’ লিখে সর্বর্বে ঘোষণা করলেন— ‘মমসব পড়াল পণ্ডিত চারিজন / পণ্ডিতে দক্ষিণা দিল রজতকঙ্কন’। বিদেশি ঐতিহাসিকগণ এ দেশের ভাষা সংস্কৃতি বুঝতে পারেনি। তাদের ভাবনায় উত্তরসূরী দেশীয় ঐতিহাসিকরা অধিকাংশ শ্রেণীস্বার্থের উপরে উঠতে পারেনি। কারণ আর্য স্বার্থ রক্ষাকারী ধর্মসাহিত্য রচিত হয়েছিল পরাজিত ভূমিপুত্রদের বা অসুরদের হয়ে করার উদ্দেশ্য নিয়ে। সিদ্ধুসভ্যতার বা মিশরীয় সভ্যতার ঘোড়ার যোগসূত্র পাওয়া যায়নি বলে এসব পণ্ডিতদের সিদ্ধান্তে উপনীত হতে ও সময় লাগল না যে ভারতে ঘোড়ার আর্য আগমনের আগে ব্যবহার ছিল না। মধ্য এশিয়ার তৃণভূমি ছিল ঘোড়ার স্বাভাবিক

বিচরণক্ষেত্র। ফলে আর্য যাবাররা নাকি তাদের পোষ মানিয়ে অন্যায় ভারতকে যো-
ব্যবহার শেখাতে এসেছিল। একথা অবশ্য তাঁদের খাতিরে ধরে নেওয়া যেতে পারে, আ-
লুট করতে করতে কিছু ঘোড়া নিয়ে ভারতে আসতে পারে কিন্তু ভারতে ঘোড়া ছিলনা, এ-
বলার অবকাশ কোথায়?

আর্য আগমনের সাথে যুক্ত তিনটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজলাম। বোধ হয় বলার সময় এসেছে
আর্যদের উন্নততর বৈদিকসভ্যতা, লোহার গলানো ও ঘোড়ার ব্যবহার প্রচলন করার
তিনটি বিষয়ই দাঁড়িয়ে আছে এক ধরনের কাল্পনিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের তাগিদে উপর। সা-
যুক্ত হয়ে আছে লুটেরা আর্যজাতির উত্তরসূরী মানুষগুলির সামাজিক সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষি-
রাখার প্রয়াস। এই তিনটি প্রশ্নে সমাধান এভাবে খুঁজলে এক ধাক্কাই তাদের ঘরের মা-
ভেঙে পড়বে আর্যদের শ্রেষ্ঠত্বের, শৌর্য-বীর্যের কাল্পনিক মিথ বা অতিকথন। মহাজার ব্যাপ-
হচ্ছে যুগযুগ ধরে ভারতের শ্রেষ্ঠ কাজগুলি করে চলেছে অন্যায়রা আর তার সুবিধা ভে-
করছে আর্যরা। 'রামায়ণ' রচনা করলেন দস্যু রত্নাকর, মহাভারত - পাণ্ডিনী মৎস্যগন্ধা সভাবতী
পুত্র বাসদেব। এরা দুজনেই অস্পৃশ্য। আর ভারতের সংবিধানের জনক ডঃ বি. আর আম্বেদক-
তো খোঁষিত দলিত। বিজ্ঞানবলে পৃথিবী আজ নিতান্তুন ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির। ঐতিহাসি-
উপাদান সমূহের অপ্রতুলতা অনেকাংশে কমছে— ধারাবাহিক প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে
আদিম সমাজের জীবন-সংস্কৃতি আলোয় আসার জন্য। এখন শুধু প্রচলিত ইতিহাসে
বিকল্পধরে বস্তুনিষ্ঠ কথা বলার সময়।

তথ্যসূত্র :-

(১) ভারতবর্ষের ইতিহাস— কোকা আন্তোনিও, গ্রিগোরি বোনাগার্সেভিন, গ্রিগোরি
কস্তোভস্কি। প্রগতি প্রকাশন, মস্কো।

(২) অশ্বরোহী এক দেবতা এবং মৃতের পুনর্জীবন লাভ— অনিমেব কান্তি পাল। সমীক্ষাপত্র
লোকায়ত, প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা—২০০৪।

(৩) দুর্গাপূজার অন্তরালে — সমুদ্র বিশ্বাস। চেতনা লহর, যুগ্ম সংখ্যা, অক্টোবর
২০১২-মার্চ ২০১৩।

(৪) ডোকরা গ্রাম — নিজে পুড়ে অন্যকে আলো দেয় - সামীম কুমার বাউড়, ২৬ ডিসেম্বর,
বর্তমান।

(৫) বাঁকড়া জেলার লোকধর্ম ও লোকদেবতা — মিহির কুমার কামিল্যা, পশ্চিমবঙ্গ,
বাঁকড়া জেলা সংখ্যা, ১৪০৯।

‘শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত’ এক ব্রাহ্মণ্যতাত্ত্বিক প্রশ্নাস :

প্রসঙ্গ হরিচাঁদ ঠাকুর-এর নিবেদিত

দুলালকৃষ্ণ বিশ্বাস

প্রাক্কথন

বৈদিক যুগান্তর কাল থেকে, বিশেষ করে পুণ্যমিত্রের সময় থেকে, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, অর্থাৎ
তথাকথিত হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি, ভারতে আর্য-সামাজিক অগ্রগমন ও তৎসংক্রান্ত সাংস্কৃতিক
বিকাশকে স্থবিরতায় বেঁধে রেখেছিল। এদেশের সমাজ-ইতিহাসের এই স্থবিরতার কারণ
পশ্চত শিক্ষার থেকে শ্রমের বিচ্ছিন্নতা। মানুষের জৈবিক জীবন প্রক্রিয়ার উন্নয়নের স্বার্থে
এদেশের জ্ঞানচর্চা প্রযুক্ত হয়নি, তা সীমিত থেকেছে নানা দার্শনিক ভাবনাতে মাত্র। অপর
দিকে শ্রম থেকে শিক্ষা বিচ্ছিন্ন থাকায় শ্রমজাত অভিজ্ঞতা দ্বারাও জ্ঞানচর্চা প্রভাবিত হয়নি।
এলা যায়, শ্রমের সংগে শিক্ষার সার্বিক বিচ্ছিন্নতা এদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশকে
স্থবিরতায় বদ্ধ করেছে। উৎপাদনের সংগে সম্পর্কহীন এদেশের জ্ঞানচর্চার অধিকারী মানুষের
অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের জ্ঞানচর্চায় জড়জগতের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অনুপস্থিত থেকেছে। অপরদিকে,
শ্রমজীবী মানুষকে শিক্ষার অধিকার বঞ্চিত করায় তারা তাদের শ্রমজর্জিত জ্ঞানকে বিজ্ঞান ও
প্রযুক্তির বিকাশে নিয়োগ করতে পারেন নি। এজন্যই এদেশের উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ
যেমন থেমে ছিল বৈদিক যুগে, তেমনি থেমেছিল এদেশের সমাজ বিকাশের ইতিহাসও।
এই সংগে সমাজজীবনে মানুষকে বর্ণ ও জাতি ব্যবস্থায় স্থায়ীভাবে বিভাজিত করায় সমাজে
শ্রেণী-সংগ্রাম ছিল প্রায় অনুপস্থিত, যে সংগ্রাম ব্যতীত উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটনা,
প্রকাশ ঘটে না মানুষের মানবিক সম্পর্কের এবং অতঃপর ঘটে না সামাজিক অগ্রগমন।

এমন পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র যে শ্রমজীবী মানুষকে এক অমানবিক জীবনযাপনে বাধ্য
করেছে ব্রাহ্মণ্যতাত্ত্বিক সমাজ ও তার রাষ্ট্র তাই নয়, শ্রমজীবী মানুষকে অমানবিক জীবনযাপনে
বাধ্য করতে গিয়ে এই সমাজের সুবিধাভোগীরা নিজেদেরও উন্নততর জীবনযাপন থেকে
বঞ্চিত করেছেন এবং সর্বোপরি, ভারতীয় সভ্যতার বিকাশে অন্তর্ঘাত ঘটিয়েছেন।

শ্রমজীবীদের চির ‘দৈব-দাসত্বের’ এই দেশে তাঁদের মুক্তির পথ-প্রদর্শক মানুষও তাঁদের
মধ্যে থেকে কেউ উঠে আসেন নি। কেননা, এদেশের শ্রমজীবীরা ধর্মের নামে এই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রকে
মেনে নেওয়ায় নিজেদের শিক্ষা-সংস্কৃতি থেকে যেমন বঞ্চিত রাখতে বাধ্য হয়েছেন, তেমনি
ওঁরা রাষ্ট্রীয় সমাজ থেকেও (from civil society) মুখ ফিড়িয়ে থেকেছেন। ফলে তাঁরা
পাননি তাঁদের মুক্তির দার্শনিক পথ নির্দেশ। অপরদিকে দেশের মানুষের সমর্থনহীন রাষ্ট্র
গরবার বহিরাগ্রামে পরাস্ত হয়েছে। এরই উত্তরাধিকার অদ্যাবধি বাহিত হওয়ায় তথাকথিত

গণতন্ত্রের এই দেশে সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রীয় সমাজের সঙ্গে সাধারণভাবে একত্ব বোধ করেন না। রাষ্ট্রীয় সমাজের মানুষও সাধারণ জনদের আপনজন ভাবেন না।

প্রথম পরিবর্তন

ইংরেজরা এদেশে আসার পর ভারত সমাজের স্থবিরতায় প্রথম গতি সঞ্চার ঘটে ইউরোপীয় উৎপাদন ব্যবস্থা তথা উৎপাদিকা শক্তির আগমনে ব্রাহ্মণতন্ত্রের স্থায়ী পেশাভিত্তিক জাতব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। ব্রাহ্মণ মুখনিঃসৃত ব্রাহ্মণ ঐ ব্রাহ্মণ পা থেকে উৎপন্ন শূত্রের সঙ্গে যখন ইংরেজের পদমিশ্রিত হতে কাল বিলম্ব করেন নি। এ-দেশে যখন ইউরোপীয় কলকারখানা গড়ে উঠল তখন প্রয়োজন হয়ে পড়ল অল্প শিক্তি অল্প শ্রমিকের যা ব্রাহ্মণতন্ত্রের সুবিধাভোগী শ্রমিকদের একমুঠো মানুষ দিয়ে মেটানো সম্ভব ছিল না। অতঃপর বৃত্তিদের আনা উৎপাদিকা শক্তির ধাক্কা জাত আন্দোলন এসেদের চিরায়ত শ্রমজীবী তথা মনুর শূত্রদের নিকটও লৌহ্যে হেতু তাদের আনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফল তৎক্ষণাৎ চিরায়ত শ্রমজীবীদের উপর নির্ভরশীলতা পাবে না। অবশ্য ব্রাহ্মণতন্ত্রের সুবিধাভোগীদের বিনোদী যবনাশ্রয় ঐ তন্ত্রের চির-নিপীড়িতের মনেও প্রশ্ন উত্থাপন করে। তাই শাশ্রুর বুলি দিয়ে নিপীড়িত জাতের মানুষদের আর তাদের জাত পেশার আটকে রাখাও সম্ভব ছিল না।

ব্রাহ্মণতন্ত্রের কোন বিধি-নিষেধ নানো জনগোষ্ঠীর উপর কখনই কার্যকরী ছিল না। আর এজন্যই এই জনগোষ্ঠীর মানুষেরা সমসাময়িক উৎপাদন ব্যবস্থার স্বতন্ত্র স্বার্থের কার্যে অংশ নিতেন। তথাকথিত জাত-পেশা বলে এই জনগোষ্ঠীর কোন নির্দিষ্ট পেশা ছিল না। কিন্তু তারা রাষ্ট্রীয় সমাজ বহির্ভূত জীবনযাপন করতে বাধ্য হওয়ার সভ্যতা-সংস্কৃতিতে পিছিয়ে পড়েছিলেন। অপরদিকে যখন নানো জনগোষ্ঠীর ধনিক শ্রেণীর লোকেরা তাঁদের শ্রেণী অবস্থান বজায় রাখতে ও শক্তিশালী করতে, অর্থাৎ রাষ্ট্রতন্ত্রমত কলার রাখতে বহিরাগত ব্রাহ্মণতন্ত্রমিত সেন রাজাদের সহযোগী হিসেবে শামিল হন, অবশ্যই তাঁদের জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বহন করে। ঐরাই হন বাংলার ব্রাহ্মণতন্ত্রের ভিত্তিশক্তি এবং অবশ্যই ব্রাহ্মণ পরবর্তীকালে যারা ব্রাহ্মণতন্ত্রে শামিল হন তারা ঐ তন্ত্রের ধারা অনুসরণ করে নানা ‘জাত পরিচয় গ্রহণ করেন বা ‘ক্রয়’ করেন। এদের মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণেরাই গম্যতে পাল্লার নিকট নানোদের সমর্থন পান ও পিতৃস্মৃতিতে পিতৃদান করতে পারেন। অন্যজাতের হিন্দুরা যদি জাতের পিতৃদান করতে চান তবে পাল্লার নিকট তাঁদের নামজনাগোষ্ঠীতে মূল বংশ-পরিচয় জ্ঞাপন করতে হয়। কারণ, পাল্লার পুথিতে কেবল ঐসব বংশ তালিকা লিপিবদ্ধ আছে। অন্যথায় তারা চাল-কলার পিতৃদান করতে পারেন।

ইংরেজ এদেশে তাদের পাল্লামেটে পাশ করা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করলে

নামজনাগোষ্ঠীও তাঁর আওতায় আসে এবং পাল আদালের পর আবার তাঁদের রাষ্ট্রীয় সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। আসলে বৃত্তি কল্‌ক ইউরোপীয় খাঁচের এক সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা অর্থাৎ জমিদারি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে এদেশের ব্রাহ্মণতন্ত্রবাহীন শ্রমজীবী জাতগুলি রাষ্ট্রের প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থার অধীন আসতে বাধ্য হয়। এরই ফলস্বরূপে প্রায় হাজার বছরের রাষ্ট্রীয় সমাজ-বহির্ভূত নানো জনগোষ্ঠীরও রাষ্ট্রের সঙ্গে পুনরায় সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

এই পরিবর্তনের আর্থ-ভিত্তি, অর্থাৎ ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আমদানি শুরু হয় এদেশে উনিশ শতকের প্রথম দশকের শেষে। রিক এই সময়ে নামো জনগোষ্ঠীতে জন্ম হয় ঐ গোষ্ঠীর আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব শ্রী হরিশ্চন্দ্র ঠাকুরের, যার পিতৃদত্ত নাম হলো হরিশ্চন্দ্র। তাঁর জন্মের (১৮১২) চল্লিশ বছর পূর্বে জন্ম হয় রাজা রামমোহন রায়ের এবং ব্যক্তি নয়, দার্শনিক রামমোহনের জন্মের পটভূমিকাও রচিত হয়েছিল ইংরেজের আনা আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে। আর এজন্যই রামমোহনের সংস্কার আন্দোলন এদেশীয় রাষ্ট্রীয় সমাজের ব্রাহ্মণতান্ত্রিক সুবিধাভোগীদের এক ক্ষুদ্র অংশের মধ্যেই কেবল সীমাবদ্ধ ছিল। কেননা, এই ইউরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটিছিল কেবলমাত্র এই সুবিধাভোগীদের এক নগণ্য অংশের মানুষের। অপরদিকে, দেশীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় তখনও কোন মৌলিক পরিবর্তন না ঘটায় উৎপাদক তথা শ্রমজীবী শ্রেণীর মানুষেরা তাদের জৈবিক জীবন প্রক্রিয়ায় ইংরেজ আগমনের কোন অভিঘাত অনুভব করার সুযোগ তখনও পাননি। কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরেজদের বাণিজ্য ভবনে এবং তাদের প্রশাসনিক কাজে কেবল ঐ ব্রাহ্মণতন্ত্রের সুবিধাভোগীরাই তাঁদের জৈবিক জীবন প্রক্রিয়াকে (Organic living process) প্রসারিত করার সুযোগ গ্রহণ করেছেন। (এটাই ছিল ভারতে ইংরেজ আগমনকে ‘ঈশ্বরের অশীর্বাদ’ ভাবনার উৎস) কেননা, এতাবধিকাল তাঁরাই বহন করেছেন এদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থার অংশগ্রহণের ইতিহাস। এই ইতিহাসের অনুসরণে সাক্ষ্য পেতে ইংরেজের প্রশাসনিক সংস্কৃতিকেও তাঁরা গ্রহণ করেছেন, অবশ্যই তাঁদের একটা ক্ষুদ্র অংশের তরফে। কেননা, তাঁদের সমাজকে আকর্ষণ করার পরিমাণগত সীমাবদ্ধতা ছিল ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্যিক প্রশাসনে। এই সংস্কৃতি চর্চাকে কেন্দ্র করেই তাঁদের মনে পচান্দপদ ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির মানুষ হিসেবে যে হীনমন্যতার জন্ম হয়; তার থেকে মুক্ত হতে তাঁদের কিছুটা সাহায্য করে রামমোহনের ব্রাহ্ম-ধর্মোপলব্ধি। আর তাই ব্রাহ্মণতন্ত্রের সুবিধাভোগী আন্দোলনগোষ্ঠী রামমোহনের দার্শনিক ভাবনা গ্রহণ করে এক নতুন আপাত প্রগতিশীল অবস্থানে থাকার তৃপ্তি বোধ করতে থাকেন। অবশ্য ঐদেরই অপর এক অংশ ইউরোপীয় ধর্ম-সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতেও বিধা করেন নি। এই উভয় অংশের মানুষদের বাইরে যে আন্দোলনগোষ্ঠী ছিলেন, তাঁরা চিরায়ত সামাজিক-সাংস্কৃতিক সীমানাকে দৃঢ়তা না অতিক্রম করলেও একটা যুক্তিবাদী অবস্থান থেকে কিন্তু সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকাও পালন করেছেন।

এরাই হলেন আধুনিক বাঙালি মহাবিশ্বের সাংস্কৃতিক পূর্বসূরি।

ইউরোপীয় আলোকপ্রাণ মানুষদের এই আর্থ-সমাজ (অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থাজাত সমাজ) ভিত্তিহীন শিল্প-সাহিত্যোদ্দেশন তাই ভারতীয় ঐতিহ্য পরিহার করে ও ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক ডাবধারণকে অনুসরণ করে এবং তারই ফলে বাংলা ও ভারতীয় মনীষা বিশ্ব-সভ্যতার অঙ্গনে স্থান করে নেওয়ার সুযোগ পায়। অতঃ, তাঁদেরই স্বদেশে কুৎসিত ব্রাহ্মণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের জগদল পাথরের নিচে অমানবিক জীবনে বাঁধা পড়ে থাকেন তাঁদেরই সমাজের শ্রমজীবী অংশের মানুষ। এমনকী, ইংরেজ আগমনের ফলে যে ছিটেফোঁটা আলোড়ন শেষ পর্যন্ত শ্রমজীবী নানাজাতের জনগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছায় তা ইউরোপের অনুজগৎ উৎপাদন ব্যবস্থাজাত সংস্কৃতি ও শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে না আসায় তাঁদের সামাজিক মুক্তি আন্দোলন প্রচেষ্টা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যখন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সুবিধাভোগীরা এমনকী তাঁদের সর্বাধুনিক ধর্মচক্র, প্রথাগত শিক্ষাবিজ্ঞান শ্রী গলাধর চট্টোপাধ্যায় অর্থাৎ ‘শ্রী রামকৃষ্ণের’ জীবনচরিত রচনা করতেও চিরায়ত ব্রাহ্মণ্যপদ্ধতি পরিহার করেছেন। (অর্থাৎ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি রচনাত্তে যেমন অবাস্তব কল্পকাহিনী ও তথ্যকথিত শ্রী ক্রমতায় নানা গাল-গল্পের ব্যবহার করা হয় তেমন কৌশল প্রায় বর্জন করেছেন) সেখানে শ্রী হরিচাঁদের মত ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র বিরোধী সংগ্রামী মানুষ, যিনি আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্পন্ন গণআন্দোলনকে এদেশে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছিলেন তাঁর নিজ জনগোষ্ঠীর উপর শোষণ ও নিপীড়ন বন্ধ করার দাবিতে, সেই মহান এক ঐতিহাসিক চরিত্রকে কবিরাজ শ্রী সরকার উপস্থাপিতকরলেন মধ্য বা প্রাক-মধ্যযুগীয় ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রী কবিরের অধিকার প্রসূত অনুকরণের দ্বারা। এই আন্ত অনুকৃতিদ্বারা রচিত শ্রী হরিচাঁদের সংগ্রামী জীবন বাংলায় ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিপীড়িতদের মুক্তির যে বাস্তবসম্মত ও মানবিক জীবনানুগ পথ প্রদর্শন করেছিল, সে পথকে অনুসরণ করতে তাঁর জনগোষ্ঠীর মানুষেরা ব্যর্থ হলেন। (মনে রাখতে হবে, ভারতের তথ্যকথিত মহান ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক সমাজ সেই বৈদিক যুগ থেকে প্রায় একই অবস্থানে অবরুদ্ধ ছিল উনিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত।) তাঁরা মধ্যযুগীয় ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক ভাবধারার গোলকধাঁসায় ঘুরপাক খেতে থাকলেন এবং অপরিশেষে, এই বিদ্রোহ মানুষদের অবাকগকে মূলধন করে এই মহান মানুষটির উত্তর পুরুষেরা ও তাঁর অনুরাগী (অনুগামী নন) গোসাইরা ঐ ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সর্বাধিক সুবিধাজোগী ব্রাহ্মণ্যদের মতই ধর্ম ব্যবসায় নিজেদের নিয়োগ করলেন। (ঠাকুর নগরের বারগিরি মেলায় বর্তমান ঠাকুর বংশের লোকেরা প্রতিবৎসর তাঁদের স্বজনগোষ্ঠীর ভাবাবেগকে মূলধন করে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রণামি উপার্জন করেন যার একটি পরিসরও ওই জনগোষ্ঠীর লোকেরদের পার্শ্ব

ঐধনোপায়ী সংগ্রামে উপযুক্ত করার কাজে ব্যয়িত হয় না। অবশ্য এই উত্তরপুরুষদের সঙ্গে শ্রী হরিচাঁদের সুযোগ্যপুত্র আর এক মহান নেত্রা ওসকলকে এক করলে তা হবে ইতিহাসের এক বিকৃত মূল্যায়ন। শ্রী ওসকল ঠাকুর যথার্থই তাঁর সময়কালকে বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাই শিক্ষা ও রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁর জনগোষ্ঠীর মানুষদের অস্থান জানিয়েছিলেন। কিন্তু একথাও অস্বীকার করা যাবে না যে তাঁর জীবিতকালেই শ্রী তারক সরকার রচিত শ্রী হরিচাঁদের এই তথ্যকথিত জীবনী ‘শ্রী শ্রী হরিশীলানুত’ প্রকাশিত হয়, যে জীবনী গ্রন্থ সম্পর্কে স্বয়ং হরিচাঁদেরই আপত্তি ছিল।

এই গ্রন্থ প্রকাশনার যে স্বয়ং হরিচাঁদ ঠাকুরেরই আপত্তি ছিল, সে কথা আমরা অবগত হই ঐ গ্রন্থেরই ভূমিকা লেখক কবিরাজ তারক সরকারেরই অন্যতম শিষ্য শ্রী হরিকর সরকারের নিকট থেকে। তাঁর ব্যানানেই শোনা যাক, কী বা কেমন ছিল সেই নিবেদন:

“মহাপ্রভুর লীলার প্রারম্ভে, প্রথমতঃ প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস ও দশরথ বিশ্বাস মহাপ্রভুর, প্রভুর লীলা প্রকাশ মানসে, শ্রীযুক্ত কবি রসরাজ তারক সরকার মহাপ্রভুরকে লেখক পদে নিযুক্ত করিয়া অত্র লীলা কতকাংশে লিখিয়া, শ্রীধাম ওড়াকান্দি গিয়া, মহাপ্রভুকে শুনায়াছিলেন। তখন মহাপ্রভু গ্রন্থ লিখতে নিবেদন করেন” (ভূমিকা, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৭)।

এই পুস্তক রচনার বিরুদ্ধে হরিচাঁদ ঠাকুরের আপত্তি এতটাই তীব্র ছিল যে মৃত্যুঞ্জয়কে “তখন মহাপ্রভু বলিলেন, মৃত্যুঞ্জয়, তুমি যদি এই লীলাগ্রন্থ প্রকাশ কর, তাহা হইলে তোমার কণ্ঠ হইবে, এবং হস্ত-পদাদির অঙ্গুলী স্থলিত হইবে” (প্রাণ্ডক)।

অপরিশেষে মৃত্যুঞ্জয় এই অভিশাপকে সাদরে গ্রহণ করেন:

“সে তো আমার জীবনের লীলাগীতি লেখার পরম পুরস্কার এবং কর্মজগতে মানবসেহের অতিমুণ্ডবান আভরণ, অতএব আমি লীলাগীতি লিখিব” (ঐ)।

খুব স্বাভাবিক কারণে দুটি প্রশ্ন উঠে আসে: এক ঠাকুর হরিচাঁদ কেন লীলাগ্রন্থ প্রকাশ করার বিরোধিতা করেন? এবং দুই, গোস্থানী মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস কেনই বা তাঁদের “স্বয়ং পুণ্ড্রিকের” নিবেদন আমান্য করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ? এবং অতিরিক্ত আরো একটা প্রশ্নও পাঠক মনে উঠবে: এই অমান্য করার দ্বারা হরিচাঁদের ‘ঐশী ক্রমতা’ কি স্বয়ং তাঁর শিষ্যদের দ্বারাই অস্বীকৃত হলো না? মনে রাখতে হবে, এটা কোন পারিবারিক ভাবাবেগপ্রসূত মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ নয়।

অবশ্যই শেষ প্রশ্নের উত্তর সকলের জানা এবং সম্ভবত এই উত্তরের মধ্যে আত্মগোপন করে আছে অন্য উত্থাপিত প্রশ্নাবলীর উত্তরও।

এমন ঘটনা থেকে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতেই হয়, যে এই গোস্থানী মশায় হরিচাঁদ ঠাকুরকে

আসৌ ‘স্বয়ং ঈশ্বর’ ইত্যাদি রূপে বিবেচনা করতেন না। তিনি যে হরিচাঁদের শিষ্য গ্রহণ করেছিলেন তার ছিল দুটি কারণ: এক, হরিচাঁদের কিছু উপশম ক্ষমতা (healing power) ছিল, যা তাঁকে সাধারণের মনে ‘ঐশীক্ষমতাবান’ রূপে প্রতিষ্ঠা দেয় এবং হরিচাঁদের এই ক্ষমতার জন্যই মৃত্যুঞ্জয় তাঁর রোগমুক্ত হ’ন ও হরিচাঁদের শিষ্য গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় কারণ, হরিচাঁদের এই উপশম ক্ষমতা বা তথাকথিত ঐশী ক্ষমতাকে অবলম্বন করে তাঁর উপর অবতারের আরোপ, এতে মৃত্যুঞ্জয় গোসাঁইদের লাভ? খুবই স্বাভাবিক, ‘স্বয়ং ঈশ্বরের’ অবতারের শিষ্য সাধারণ মানুষের নিকট অন্য কোন-না-কোন হিন্দু দেব-দেবতার ‘অবতার’ হবেন। নিদেনপক্ষে অবতারের সঙ্গী সাধারণের নিকট যে অসাধারণ কেউকোটা হবেন, সে বিষয়ে কারো কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

ভক্তি আশ্রয় মানুষের নিকট এমন ব্যাখ্যা পীড়াদায়ক। কিন্তু সারা পৃথিবীর সমাজবিজ্ঞানীর অবতার বা সন্ত ইত্যাদি গড়ে ওঠার এমন ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। প্রথা হলো: এ-ক্ষেত্রে যিনি ‘অবতার’ রূপে বিবেচিত হচ্ছেন, সেই হরিচাঁদ ঠাকুর কেন তাঁর অবতারত্বের প্রচার গ্রন্থ “শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত” প্রকাশের বিরোধিতা করেন?

এই প্রশ্নের দুটি উত্তর বিবেচনা করা যেতে পারে। এক, হরিচাঁদ নমো জনগোষ্ঠীর ও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অনুরূপ নিপীড়িত জাতের মানুষদের জৈব-জীবন সংগ্রামের মাধ্যমে সমৃদ্ধি অর্জনের পথ নির্দেশ করেছেন। অথচ, ইতিপূর্বে কোন অবতার বা সন্ত মানুষের ‘পার্থিব জীবনে’ সমৃদ্ধি অর্জনের পথ প্রদর্শক নন, সকলেই মৃত্যু পরবর্তী জীবনের (?) পথপ্রদর্শক মাত্র।

দ্বিতীয় কারণ সম্ভবত এই যে, যদি হরিচাঁদ ‘ঐশীক্ষমতাবান’ হন, তবে তাঁর নির্দেশিত পথে চলতে হলে সকলেই অনুরূপ ক্ষমতার (অবতার কৃষ্ণ ও তাঁর সঙ্গীদের কথা স্মরণ করা যেতে পারে) অধিকারী হতে হবে। এখানেই মানুষের অর্জিত ক্ষমতা ও জন্মসূত্রে পাওয়া ক্ষমতার হেয়তর অবস্থা মানুষকে নিজের সম্পর্কে অবমূল্যায়ন করাবে যা অন্ততঃ মহান মানুষ হরিচাঁদের অভিপ্রেত হতে পারে না।

অতএব ব্রাহ্মণ্য ভাবধারায় রচিত এই তথাকথিত ‘লীলাগ্রন্থ’ শেষ পর্যন্ত হরিচাঁদের নির্দেশ অনুসরণ করা থেকে তাঁর অনুগামী মানুষদের বিচ্যুত করবে এবং তাঁরা সবাই হবেন প্রগল্বীন ভক্তিতে আত্মসমর্পিত একদল মনোবলহীন মানুষ, যা আসলে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের দার্শনিক লক্ষ্য। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র বিরোধী হরিচাঁদ, অতঃপর, এমন ব্রাহ্মণ্য উত্তরাধিকার বহনকারী গ্রন্থকে অনুমোদন দিতে পারেন নি। অবশ্য উক্ত ভূমিকায় হরিচাঁদ ঠাকুরের এই নিবেদনকে এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে উক্ত গ্রন্থ প্রকাশের সেটা উপযুক্ত সময় ছিল না। আবার শ্রী হরিবর

সরকারই তাঁর ‘ভূমিকায়’ জানাচ্ছেন, “মহাপ্রভু গ্রন্থ লিখিতে নিবেদ করেন।”

এ থেকে আমরা কেবল এই সিদ্ধান্তই নিতে পারি, যে শ্রী হরিচাঁদ তাঁর জীবনীগ্রন্থ রচনাতেই নিবেদন আরোপ করেন, গ্রন্থ প্রকাশের কথা তো আসছে তারপরে। তাঁর গ্রন্থ রচনার উপর নিবেদন জেনেও মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস এই গ্রন্থ রচনা করতে চান। শ্রী হরিবর সরকার জানাচ্ছেন, “তথাপি মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থ লিখিতে ইচ্ছুক হইলেন।”

প্রশ্ন হলো, কবি তারক সরকার সহ শ্রীহরিচাঁদের নিকটতম সব অনুরাগী ব্যক্তির (স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় গোসাঁই সমেত) নিকট যিনি ‘পূর্ণত্ব’, ‘স্বয়ং’ বা ‘ঈশ্বর’, সেই ঠাকুর হরিচাঁদের নিবেদন অমান্য করার সাহস অথবা স্পর্ধা সম্ভব কীভাবে? এমন স্পর্ধা যিনি প্রদর্শন করতে পারেন, তাঁকে কি হরিচাঁদ ঠাকুরের ‘অনুগামী’ বলা যায়? শিষ্য কি কখনও গুরুর আজ্ঞা অমান্য করতে পারেন? এমনই গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘনকারী শিষ্যদের দ্বারা নিযুক্ত কবি তারক সরকার রচিত গ্রন্থ শ্রীহরিচাঁদের জীবন, জীবনদর্শন এবং তাঁর কর্মোদ্দ্যোগের ঐতিহাসিক তথ্য ও ভূমিকা কি সঠিকভাবে উপস্থাপিত করেছে ভাবা যায়? এমন ভাবনা কি অসংগত বা অবাস্তব যে স্বয়ং গোসাঁই মৃত্যুঞ্জয়-এর ব্যক্তিগত অথবা গোসাঁইকুলের সমষ্টিগত কোন স্থূল স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই হরিচাঁদের নিবেদন সত্ত্বেও তাঁর ‘জীবনীগ্রন্থ’ শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত রচনা করার জন্য কবি তারক সরকারকে বাধ্য করা হয়? হ্যাঁ, যথার্থই কবি তারক বাধ্য হন এই গ্রন্থ রচনায়। কেন এমন সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হই? এমন সিদ্ধান্তের কারণ শ্রী হরিবর সরকার লিখিত ভূমিকাতেই বর্তমান। তাঁর বয়ানেই জানা যাক সে কথা:

“কিন্তু দেব নিকর্ষন, লিখিত লীলাগ্রন্থ শ্রীধাম হইতে হারাইয়া যায়। সুতরাং বিশ্বাস মহাশয়গ্রন্থ গ্রন্থ লিখিতে নিরন্ত হইলেন। কিয়দিন পরে, আন্তরিক গাড় অনুরাগের উত্তেজনায়, উক্ত বিশ্বাস মহাশয়, পুনরায় লিখিতে কবি রসরাজ (তারক সরকার) মহাশয়কে অনুরোধ করেন। তদুত্তরে কবি রসরাজ মহাশয় বলিলেন, গোপ্যমী আমি লেখা জানি না, পড়া জানি না, অতীত মূর্খ, অতি মুঢ় যাহা জানি না তাহা বলিবার নয়...। অতএব গ্রন্থ লিখিতে, অযোগ্য ও অক্ষম বলিয়া আমাকে ক্ষমা করুন।” (হুবহু উদ্ধৃতি)

শ্রীহরিবর সরকার তাঁর কবিরাজ গুরু শ্রী তারক চন্দ্র সরকার সম্পর্কে এই তথ্য আমাদের জানাচ্ছেন। অর্থাৎ আমরা জানলাম, কবি নিজেকে (হেয়ত বিনয়বশত) হরিচাঁদের জীবন ও দর্শন সম্পর্কে অতি মুঢ় বলে ঘোষণা করেছেন এবং এই ‘মুঢ়তা’ নিয়েই কবি ইতিপূর্বে যে ‘লীলাগ্রন্থ’ রচনা করেছিলেন ‘শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত’ সেই গ্রন্থ। কেননা, শ্রী হরিবর সরকার মশায় আমাদের জানাচ্ছেন:

“অতঃপর অনেক দিন পরে, একদা রাত্রি যোগে স্বপ্নাদেশে বাক্যবিনোদিনী দেবী সরস্বতী

আসিয়া কবি রসরাজ মহাশয়কে বলিলেন — তারক যখন পূর্বে শ্রীধামে ওড়াকলী হইতে, তোমাদের কৃতপ্রভুর লীলাগ্রন্থ, তখন প্রকাশের অসময় বলে, তাহা আমার নিকট রাখিয়াছিলাম; এই তোমাদের সেই গ্রন্থ লও...। (এ)

অতএব, সন্দেহ করার কোন কারণ নেই, যে-গ্রন্থ না লেখার জন্য হরিশ্চন্দ্র আশেপাশে ছেঁটিয়ে, সেই গ্রন্থই, শ্রীহরির সরকারের ভাবার ফেরৎ দেন। দেখা যাচ্ছে স্বয়ং ‘ঈশ্বরের’ ইচ্ছাকে তারই অধীনত একদেবী সরস্বতী অমান্য করছেন। হ্যাঁ, হরিশ্চন্দ্রের একান্ত স্বাভাবিক অনুগামী বিশিষ্ট জনেরা একথা জানাচ্ছেন। অবশ্যই কবি স্বপ্নের কথাবার্তা সরাসরি শ্রী হরির সরকারের জানার কথা নয়, যদি না কবি তারক সরকার এ বিষয়ে তাঁকে অবগত করেন।

স্পষ্টতই, বেদবিধি না-মানা, ব্রাহ্মণকে না-মানা শ্রী হরিশ্চন্দ্রের অনুগামী (অনুগামী?) এই কবি বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য ‘দেবী’ সরস্বতীতে আস্থা রাখেন। এরপরও কি আমরা ভাবতে পারি কবি তারক সরকার রচিত ‘লীলাগ্রন্থ’ আর দশটি ব্রাহ্মণ্য পুরাণকাহিনী (কাহিনী, ইতিহাস নয়) থেকে ভিন্ন হবে, হবে ঐতিহাসিক দলিল?

বস্তুত বৈদিক উত্তরাধিকারের হাত ধরে ব্রাহ্মণ্য তথা হিন্দু ধর্মের সুবিধাভোগীরা অমলীয়া নানাভাষ্যের মানুষের উপর যে মানবোত্তর নিপীড়ন সামাজিকভাবে আরোপ করেছিলেন তারই বিরুদ্ধে ছিল হরিশ্চন্দ্র ঠাকুরের সংগ্রাম। আর আমরা দেখছি, সেই মহান মানব প্রেমিক, মানবতার প্রতি দায়বদ্ধ হরিশ্চন্দ্রের স্বাভাবিক ‘অনুগামী’ গোসাইরা ব্রাহ্মণ্যতাত্ত্বিক মানসিকতাপট্ট এক তথাকথিত ‘লীলাগ্রন্থ’ জোর করেই এক স্বাভাবিক ‘মুড়’, ‘অজ্ঞ’ কবিকে দিয়ে রচনা করালেন। হ্যাঁ, জোরজবরদস্তি করেই। কেননা, ঐ ভূমিকাতেই শ্রীহরির সরকার আমাদের জানাচ্ছেন:

“কিয়াদিন গত হইলে পরলোকগত মহাভাবময় প্রভুপাদ গোস্বামী গোপালচাঁদ উমজাকোশে একদা শেষ নিশ্বাসে যন্ত্রণাদেশে ভীষণ ‘নৃসিংহমূর্তি’ ধারণ করিয়া” কবি রসরাজ মহাশয়ের বক্তব্যে নব বাখাইয়া দিয়া বলিলেন — “হয়ত প্রভুর লীলাগ্রন্থ দে, নচেৎ তোর বক্ষ চিরিয়া কবির পান করিব।” তখন কবি রসরাজ অগত্যা স্বীকার করিলেন...”।

দেখা যাচ্ছে, গ্রন্থটি লেখার জন্য কবির উপর গোস্বামীদের প্রবল চাপ ছিল যা তাকে মানসিকভাবে নিচুত করিয়েছিল। ফলে এইসব গোস্বামীদের মধ্যে যিনি সব চাইতে বেশি অস্বাভাবিক আচরণ দ্বারা হরিশ্চন্দ্রের অনুগামীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং যিনি সাধারণের নিকট যথেষ্ট ভীতিপ্রদ ছিলেন সেই গোস্বামী গোলক চাঁদকে কবি স্বপ্নে পর্যন্ত দেখেন এবং তাঁর স্বপ্ন-শাসনিত ভীত কবি এই ‘লীলাগ্রন্থ’ লিখতে শুরু করেন। অথচ কবি ব্রাহ্মণ্য দেবী সরস্বতী, কবিবাল শ্রী হরির সরকারের তথাকথিত বাক্যবিনোদিনিও (আসলে ব্রাহ্মণ্যের কাছে এই ‘দেবী’ তো কেবল বিনোদিনি নন, তিনি তো জ্ঞানেরও দেবী)। কবিবাল শ্রীহরির

সরকার অবশ্য লোককে কেবল বিনোদনই বিলিয়েছেন তো। যদি একটু ব্রাহ্মণ্যভক্তের খুঁজার জ্ঞানীদের দার্শনিক বলা উচিত ব্রাহ্মণ্য স্বার্থের শ্রেণী দার্শনিক প্রজ্ঞা সম্পর্কে কবি সাচেন তাহলে তা হলে জানতে পারতেন, কেন এসেছে চির ব্রাহ্মণ্য দাসস্বাধার কবলিত এবং তখন তিনি এই দেবীকে দিয়ে শ্রী তারক সরকার মহাশয়কে স্বপ্ন দেখাতেন না। কবি তারকও এই বিনোদন রসের কারবারি — মানুষকে বিনোদন দিতে চেয়েছেন ঐ সরস্বতীর সব ‘করপুত্রদের’ রচিত শাস্ত্রকে অবলম্বন করে। এরই ফলে তাঁর বিনোদন প্রচেষ্টা কেবল তার স্বজনগোষ্ঠীর মানুষের নিজেদের নিশ্চিন্ত জীবন সম্পর্কে উপলব্ধি করেছে, কিছুকণের জন্য এই মানুষজন তাঁদের ব্রাহ্মণ্যতত্ত্বব্রিাত যুগ্য জীবনকে ভুলে থাকতে পেরেছেন। কিন্তু যদি ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের স্বামীরা (শূত্র) বিরোধিতার দর্শনকে তিনি জ্ঞানালোক দিয়ে এই সব ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রের মধ্যে অনুসন্ধান করতেন তা হলে ঐ বিনোদনের সঙ্গে তাঁর শ্রোতৃমন্ডলী তাঁদের মুক্তির পথও অনুসন্ধানে সফল হতেন। কবিকে দিয়ে ‘লীলাগ্রন্থ’ রচনা করাতে পারেননি।

কবি হরির সরকারের বাক্যবিনোদিনি স্বপ্নে এসে কবি তারক সরকারকে তাঁর রচিত ‘লীলাগ্রন্থ’ ফেরৎ দিয়ে গেলেও কবি তারক গ্রন্থ রচনা করতে অপরূপ থাকলেন। (যদিও স্বপ্নে প্রাপ্ত জিনিষ স্বপ্নভঙ্গ হাতে পাওয়ার কথা শোনা যায় না হয়ত এজন্য) কবি হরির সরকার জানাচ্ছেন:

“তথাপি তিনি নিশ্চিতে নিরস্ত থাকেন। পরে নিত্যানন্দ শক্তি বিশিষ্ট স্বামী মহানন্দ পাণ্ডল অহরহ সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া ব্যাবহার অনুপ্রোথ করারও তিনি গ্রন্থ লিখিলেন না।” (এ)

দেখা যাচ্ছে এমন এক গোস্বামী যিনি ‘নিত্যানন্দ শক্তি বিশিষ্ট’ (অর্থাৎ, শ্রী গৌরাসের সহচর নিতাই গোস্বামীর শক্তি বিশিষ্ট? নাকি নিত্য আনন্দে থাকার শক্তি সম্পন্ন?) তাঁরও অনুপ্রোথ কবি তারক সরকার আর ‘লীলাগ্রন্থ’ লিখতে রাজি ছিলেন না। কেন রাজি ছিলেন না কবি? স্বয়ং ব্রাহ্মণ্যদেবী সরস্বতী তাঁর ‘প্রভুর লীলা’ প্রকাশ করতে বলা সত্ত্বেও কবি কেন ‘লীলাগ্রন্থ’ রচনায় অনগ্রহীত হন? যে-সরস্বতীর ‘ইচ্ছা’ এই কবি ‘কবিবাল’ সেই সরস্বতীর নির্দেশ অমান্য করেন যে কবি, তিনি কেন তা হলে গোস্বামী গোপালচাঁদের ‘নৃসিংহ মূর্তি ধারণ’ —এর ভয়ংকর স্বপ্ন দেখেন? সে কি হরিশ্চন্দ্রের নিবেদন তারক সরকারের রচিত শ্রোতৃকেও মধ্যে গোপচন্দ্রতা হেতু? এবিষয়ে স্বয়ং কবিবাল তারক সরকারের রচিত শ্রোতৃকেও আমরা অবগত হতে পারি। প্রথমে আমরা কবি তারক-এর রচনায় ‘লীলামৃত’ সম্পর্কে হরিশ্চন্দ্র-এর প্রতিক্রিয়া জেনে নিতে পারি:

কিছু অংশ লেখা হলে দুই মহাশয়।
মহাপ্রভু হরিশ্চন্দ্র পড়িয়া শুনায়।।
মহাপ্রভু ভেবে বলে শুন মুতুঞ্জয়।

লীলাগীতি লেখা এবে উচিত না হয়।।

ক্ষান্ত কর লেখালেখি বাহ্য সমচোর।

অন্তরের মাঝে রাখ আসন আমার।। (লীলামৃত, পৃ. ৫)

এতদসত্ত্বেও মৃত্যুঞ্জয় লেখার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করলে হরিচাঁদ-এর প্রতিক্রিয়া ছিল এরূপ:

মহাপ্রভু বলে জান এ কর্মে পুরস্কার।

কুণ্ড ব্যাধি হবে চেষ্টা করিলে আবার।। (ঐ, পৃ. ৫)

অন্যতম প্রিয়শিষ্য মৃত্যুঞ্জয়কে এমন কঠোর ভাষায় দুঃসংগে ব্যাধির ভয় দেখিয়ে নিবেদন জানালেন হরিচাঁদ যে অপরাধে, সেই ‘লীলাগ্রন্থ’ রচনা কি আদৌ কোন অপরাধ? হরিচাঁদ-এর মত এমন মানবদরদি মানুষ কেন এতটা ক্ষুব্ধ হলেন?

এ ঘটনায় সম্ভবত কবি তারক ভীত হয়ে পড়েন এবং গ্রন্থ রচনা সম্পূর্ণ করা থেকে কেবল বিরত হন না, ইতিপূর্বে রচিত অংশকে তিনি লুকিয়ে রাখেন। অবশ্য এই লুকিয়ে রাখার ঘটনাটি ব্রাহ্মণ্য-বৈষ্ণব কবি তারক ঐ ব্রাহ্মণ্য পুরাণ কাহিনীর নিখুঁত অনুসরণে এভাবে উপস্থাপিত করেন:

হেনকালে সৈবযোগে লীলাগ্রন্থখানি।

আপনি হরিয়া লন দেবী বীণাপাণি।। (ঐ, পৃ. ৫)

ইতিমধ্যে দীর্ঘ সময় অতিব্রূত। শ্রী হরিচাঁদের জীবনাবসান ঘটেছে এবং অতঃপর,

কিছুকাল পরে দেবী স্বপ্নযোগে কয়।।

অসমর বলি আমি প্রভু আঞ্জা মতে।

জরেছি লীলাগীতি তব অসাক্ষাতে।।

এবে বটে সুসময় নাহি কর দেয়ী।

প্রচার করহ লীলা অমৃত লহরী।। (ঐ, পৃ. ৫)

দেখা যাচ্ছে শ্রী হরিচাঁদ-এর জীবিত কালে নয়, তাঁর মৃত্যুর পর হলো এই পুস্তক রচনার ‘সুসময়’। এ থেকে বুঝতে পারা যায়, মৃত্যুঞ্জয়, দশরথ ও তারক গোসাই সাহস করে হরিচাঁদের জীবিত কালে এই ‘লীলামৃত’ রচনা করতে সাহস পান নি। কিন্তু প্রশ্ন হলো গুরু যাদের ‘ঈশ্বরের’ অবতার, সেই গুরুর নিবেদন অমান্য করা কেন? এই গোসাইদের এমন ‘ঈশ্বর’

[এরোধী আচরণ কী ইঙ্গিত করে? কোন ‘পার্বিব’ প্রাপ্তি?

যে দেশে সব সাধু-সন্তরা তাঁদের অনুরাগী ভক্ত-শিষ্য দ্বারা প্রচারের আয়োজিত আসেন সেদেশে জন্ম নিয়ে শ্রী হরিচাঁদের এমন বিপরীত ভূমিকা কেন? তাঁর যথার্থ জীবনচরিত পাঠ করে তাঁর নিজ জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি ঘটলে তাঁদের ‘মুক্তি’ ঘটত অপেক্ষাকৃত কম সময়ে। যে মানুষদের জন্যই তিনি সংগ্রাম করেছেন, সেই মানুষদের মধ্যে তাঁর যথার্থ পরিচিতি ব্যাপ্ত হলে ঐ মানুষেরা তাঁদের জীবন-সংগ্রামে অনেক বলিষ্ঠ ও আত্মবিশ্বাসী ভূমিকা পালন করতে পারতেন। এরূপক্ষেত্রে সাগ্রহে এমন গ্রন্থের প্রচারকে তো সমর্থন করার কথা এই পথপ্রদর্শক মানুষটির। তবে কেন তাঁর ‘লীলাগ্রন্থ’ প্রচারে বিরোধিতা?

এ প্রশ্নের উত্তর দেননি শ্রীহরিবর সরকার, উত্তর দেননি তাঁর গুরু কবি তারক সরকার। যদিও একটা অপ্রত্যক্ষ উত্তর হরিচাঁদের নির্দেশের মধ্যে ঐ কবির বয়ানে পাওয়া যায়:—

অন্তরের মাঝে রাখ আসন আমার।।

এমন নির্দেশের অর্থ তো এই, যে হরিচাঁদ তাঁর দর্শন, তাঁর মতাদর্শকে অনুসরণ করতে বলছেন তাঁর অনুরাগী নয়, অনুগামীবৃন্দকে। মানুষের মধ্যে কোন দর্শন বা মতাদর্শকে যথাযথভাবে প্রচার করতে হলে সেই দর্শন ও মতাদর্শকে ইতিহাস ও সমকালের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত করতে হয়। সেখানে মধ্যযুগীয় রহস্যময়তা বা কাব্যনৈতিক ‘অত্যাশ্চর্য’ ঘটনার দ্বারা জৈবিক জীবন যাপনের, গৃহীত জীবনযাপনের পথ নির্দেশ করা যায় না। কোন মধ্যযুগীয় ধর্মগুরু তাঁর ‘অনুগামীদের’ পার্বিব জীবনযাপনের পথনির্দেশ করেন নি, তাঁদের নির্দেশিত পথের ত্রিকানা ছিল কোন এক মরনোত্তর ‘জগতের’। কেন না, এসব অলৌকিকতা বা ‘অত্যাশ্চর্য’ ঘটনা যেহেতু সাধারণ মানুষের জীবনে ঘটে না, তাই তারা আরো অসহায়তার শিকার হ’ন এবং জীবন সংগ্রামজিহ্বিত আত্মবিশ্বাসকে হারিয়ে ফেলেন, এবং অতঃপর, তারা ‘ভাগ্য’ নির্ভর বা ‘দৈব’ নির্ভর হয়ে পড়েন, যে নির্ভরতা জীবন সংগ্রামের ‘এই জগতে’ তাঁদের গুরু-গোসাই নির্ভর করে তোলে। অথচ হরিচাঁদ তাঁর জনগোষ্ঠীকে আত্মশক্তিতে বলিয়ান করতে চেয়েছিলেন। এমন বলীয়ান হতে গেলে মানুষকে এমন শিক্ষা পেতে হবে যার সাহায্যে মানুষ সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির যথার্থ মূল্যায়ন ও মুকাবিলা করতে পারে, পারে সমকালীন উপযোগী নৈতিক ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক অবস্থান অর্জন করতে। হরিচাঁদকে ‘অবতার’ বানিয়ে, অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বানিয়ে, এসব ‘অত্যাশ্চর্য’ ঘটনার গল্প-কাহিনী দিয়ে মানুষকে তার সমকাল সম্পর্কে সচেতন করা যায় না এবং অতঃপর মহান হরিচাঁদের মূল লক্ষ্য থেকে এমন ‘লীলাগ্রন্থ’ তাঁর অনুগামীদের, তাঁর নিপীড়িত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে যথার্থীতি ব্রাহ্মণ্যাত্মিক মানেবত্তর, কারাগারেই শেষ পর্যন্ত বন্দী করে রাখে। তাই কি হরিচাঁদ এমন গ্রন্থ প্রকাশে আপত্তি জানান?

কবি অবশ্য সুকৌশলে তাঁর এই আপত্তি জানানো পংক্তির মধ্যে ‘এবে’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন যা ইঙ্গিত করে বর্তমানে প্রকাশে আপত্তি থাকলেও ভবিষ্যতে প্রকাশ করা যাবে আর তাই ব্রাহ্মণ্য দেবী সরস্বতীর মাধ্যমে কবি স্বপ্নযোগে হরিচাঁদ তথা ‘প্রভুর’ অনুমোদন অর্জন করেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যে-গ্রন্থ ভবিষ্যতে প্রকাশ করা চলবে, সেই গ্রন্থ বর্তমানে প্রকাশে আপত্তি জানাতে কেন এই মহান ব্যক্তি ব্রাহ্মণ্য পদ্ধতিতে কৃষ্ণ হওয়ার ‘অভিশাপ’ দেবেন? আরো লক্ষ্য করার যে এমন কী ‘স্বয়ং’ ঈশ্বর বা তাঁর ‘অবতার’ হরিচাঁদের ‘আজ্ঞা’ নিয়ে ব্রাহ্মণ্যদেবী সরস্বতী, ‘বাক্যবিনোদিনী’ সরস্বতী কবি তারককে গ্রন্থ প্রকাশ করতে নির্দেশ দিলেও কবি গ্রন্থ রচনায় অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। কবির এই ‘স্বপ্ন কান্ড’ অবগত হলে

মৃত্যুঞ্জয় দশরথ পুনঃ দুই জনা।
বলিলেন লীলামৃত করিতে রচনা ॥ (ঐ, পৃ.৫)

কিন্তু কবি কী করলেন?

চরণ ধরিয়া তবে বলিল তারক,
ধীকার করিনু আমি তোমার সেবক ॥
অতি দীন অভাজন আমি মুঢ়মতি।
এ লীলা বর্ণিতে মম না হবে শক্তি ॥ (ঐ, পৃ.৫)

কবির কাছ থেকে এই বৃত্তান্ত জানার পর তো কিছু প্রশ্ন তুলতেই হয়। ‘স্বয়ং ঈশ্বর’ কবির ‘শক্তি’-তে আস্থা রেখে যে-দেবীর কৃপায় সমস্ত ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র রচিত সেই ‘বাক্যবিনোদিনী’র মাধ্যমে নির্দেশ পাওয়ার পরও কেন কবি তারক অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন? কবি কি তাঁর কবিসত্তা, তাঁর সত্যদৃষ্টির অবস্থান অথবা শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের জীবিতকালের নির্দেশপ্রাপ্ত অবস্থান এবং গোস্বামীদ্বয়ের পীড়াপীড়ির মধ্যে এক অসহায় অবস্থায় পড়েছিলেন এতে কি তাঁর মনের শান্তি বিপর্যস্ত হয়েছিল, যার জন্য তিনি এমন সব স্বপ্ন দেখেন? কবি কি হরিচাঁদের নির্দেশ লঙ্ঘনের অপরাধ সত্তাবনায় দুই গোস্বামীর কাছে গ্রন্থ রচনায় অক্ষমতা প্রকাশ করেন?

অবশ্য কবি জানাচ্ছেন, যে ব্রাহ্মণ্যতত্ত্বের শাস্ত্রবিধান অমান্য করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন হরিচাঁদ, সেইসব ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রের নানা কাহিনীর উল্লেখ করে গোস্বামীদ্বয় তাঁকে নানাভাবে ‘লীলাগ্রন্থ’ রচনায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। প্রথমে অবশ্য নিজেদের ক্ষমতার উপর গোস্বামীরা আস্থা রেখে কবিকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেন:

দুই প্রভু বলে হরিচাঁদে রেখে ভক্তি।
লিখিতে আরম্ভ কর হবে তোমার শক্তি ॥
বিশ্বাস না করিস মোদের কথা ধর।
লিখিতে পারিবি গ্রন্থ তোকে দিনু বর ॥ (ঐ, পৃ.৫)

তবুও তারক অসম্মত হলে গোসাইদ্বয় বিভিন্ন ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র এবং মুনিদের কথা উল্লেখ করে তাঁকে প্ররোচিত করেন:

তোমার কেন ভয় হল করিতে রচনা।
তোমার জন্য তপস্যা করিব দুজনা ॥
সব কর্ম সেই করাইবে তোমারে দিয়া।
রচনা করহ গ্রন্থ তাহারে ভাবিয়া ॥ (ঐ, পৃ.৫)

তবু কবি বিধাবিহীন:

এইভাবে কতদিন গত হয়ে গেল।
পারিব না ভেবে গ্রন্থ লেখা নাহি হল ॥ (ঐ, পৃ.৬)

এবং গোস্বামীদ্বয়ের পীড়াপীড়ির ফলে, অথবা ‘যার ধর্ম সেই করাইবে’ ভেবে কবি আবার সেই ব্রাহ্মণ্যতাত্ত্বিক কৌশল গ্রহণ করেন:

একদিন দেবযোগে নিশি অবসানে।
গোসাই গোলক এসে দেখায় স্বপনে ॥
নরহরি রূপ ধরি বুকু হাটু দিয়া।
বক্ষস্থলে দিল হস্ত নখ বাঁধাইয়া ॥
বলে তোমারে নখে চিরি করি খান খান।
নৈলে ‘শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত’ পুঁথি আন ॥ (ঐ, পৃ.৬)

মৃত্যুঞ্জয় ও দশরথ গোসাই-এর উক্ত বরদানের পর ইতিমধ্যে দীর্ঘ চব্বিশ বৎসর অতিক্রান্ত। এবার কবি সরকারের ‘লীলাগ্রন্থ’ রচনার অভিপ্রায় জাগে এবং অতঃপর, আবার সেই ব্রাহ্মণ্য অপকৌশল অনুসরণ করে তিনি গোলক গোসাইকে দিয়ে নতুন এক অত্যাশ্চর্য স্বপ্নের আমদানি করেন:

মৃত্যুঞ্জয় দশরথ বর দিয়াছিল।

চতুর্বিংশতাব্দে এই গত হয়ে গেল।।
পুঁথি যদি না লিখিবি তোর রক্ষা নেই।
পুস্তক লিখিস যদি ছেড়ে দিয়ে যাই।। (ঐ, পৃ.৬)

কেবল এই স্বপ্নে দেখা ভীতি নয়, কবির যে ‘লীলাগ্রন্থ’ লেখার যোগ্যতা আছে, সে সম্পর্কে কবি গোলক গোসাঁইকে দিয়ে তাঁর ‘দৈব’ জন্ম বিবরণ ও কবিরাজ হইয়ে ওঠার কাহিনীও আমাদের জানিয়েছেন এবং এমন কি ব্রাহ্মণদের শংসা পত্রের কথাও আমাদের অবগত করেন:

ইতিনায় ভট্টাচার্য পাড়া হয় গান।
সুকবি বলে তোরে দিয়াছে আখ্যান।। (ঐ, পৃ.৬)

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মতুরা কবি বেদ-বিরোধী, ব্রাহ্মণবিরোধী হরিচাঁদের জীবনীকার হলেন বেদের অস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ব্রাহ্মণের পতাকাবাহী এক কবি। সেই গ্রন্থে যথার্থ হরিচাঁদকে আমরা কতটা পেতে পারি? যে-হরিচাঁদ ঠাকুর ব্রাহ্মণ্য নিপীড়নে জর্জরিত এসেশের চিরায়ত শ্রমজীবী মানুষের চেতনা থেকে ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার অবলম্বিত চেয়েছিলেন, সেই হরিচাঁদের জীবনী যদি লেখেন ব্রাহ্মণানুরাগী কবি তারক সরকার তবে তা যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম শাস্ত্রাদির মতই ‘অত্যাশ্চর্য’ কল্পকাহিনীতে পরিপূর্ণ হবে এবং তা পাঠ করে শ্রমজীবী মানুষ যে ঐ ব্রাহ্মণ্য দাসত্বমানে নেবেন সে বিষয়ে কি কোন সন্দেহ থাকে। মতুরাদের বর্তমান জীবনচারণ যে ব্রাহ্মণ্য ভাবধারায় আক্রান্ত তা তো আর গবেষণার বিষয় নয়। একজন মতুরা আর অন্য একজন হিন্দুর মতই নিজেকে হিন্দুই ভাবেন এবং অতঃপর কার্যত তিনি সেই হরিচাঁদকে অস্বীকার করেন যিনি বলেন:-

বেদ-বিধি নাহি মানে না মানে ব্রাহ্মণ।

হরিচাঁদের এই নির্দেশ মতুরারা অগ্রাহ্য করেন এবং তারপরও তাঁরা হিন্দু ঋচিরিতার উত্তরাধিকার বহন করে থেকে যান মতুরা, নিজেদের ঘোষণা করেন ঠাকুর হরিচাঁদের অনুরাগী বলে।

এবং হরিচাঁদের অনুগত সঙ্গী গোসাঁই গোলকও যে যথার্থই হরিচাঁদের জীবনাদর্শনের অনুগামী ন’ন, তিনিও যে ব্রাহ্মণ্য ধারণায় বিশ্বাসী সেকথা কবি তারক স্বয়ং আমাদের জানিয়েছেন। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ কাহিনী সবই ব্রাহ্মণ্য সমাজ বিধি গলাধঃকরণ করার জন্য সৃষ্ট মনোরম সাহিত্যকর্ম। তাকেই সত্য বলে স্বয়ং গোলকও মানেন এবং তারপর তিনি মতুরাও থেকে যান। তিনি কবি তারককে জানাচ্ছেন:

স্বপ্নেতে কেহ যদি পুঁথি করে দান
সেজন পন্ডিত হয় পুরাণে প্রমান।। (ঐ, পৃ.৬)

অবশ্যই এ বিশ্বাস স্বয়ং কবি তারকেরও। তাই কি হরিচাঁদ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রানুসারী জীবনী রচনা করার জন্যই কি হরিচাঁদ কবি তারক কর্তৃক রচিত গ্রন্থ প্রকাশে আপত্তি জানিয়েছেন?

কবি তারকের এই ব্রাহ্মণ্যাত্মিক উত্তরাধিকার এতটাই প্রবল, যে তিনি নিজেরও ‘দৈব’ জন্ম নির্মাণ করেন। তাঁর পিসিমার মুখে কবি তারক তাঁর জন্মবৃত্তান্ত জানাচ্ছেন:

তোর জন্ম বিবরণ তোর মনে নাই।
মৌখিক শুনিলি তোর পিসিমার ঠাই।।
তোর পিতা কশীনাথ ছিল কাণী ভক্ত।

অপুত্রক ছিল বংশে পুত্র না জন্মিল।
বংশ রক্ষা হেতু দুর্গা বলিয়া কানিল।।
বটপত্রে লক্ষ দুর্গানাম লিখে পরে।
সপ্তাহ পর্যন্ত শিব সন্তানন করে।। (ঐ, পৃ.৭)

ইত্যাদি...

নবকুমার শর্মা পুরোহিত এসে।
পূজা করে জগদ্ধাত্রী পূজার দিবসে।।
সপ্তাহ পর্যন্ত চণ্ডী করিল পঠন।
অষ্টম দিবসে দিল ব্রাহ্মণ ভোজন।।

মাগধীর্ষ অমাবস্যা শনিবার দিনে।
তোর মাতা প্রসব করিল শুভক্ষণে।।
নাম করণেতে নাম রাখিল তারক।
আচার্য বলিল পুত্র হইবে রচক।। (ঐ, পৃ.৭)

আমরা প্রসঙ্গত স্মরণ করতে পারি, এ সময় নমোরা ব্রাহ্মণ্য সমাজ বর্হীভূত ‘চন্ডাল’। কিন্তু সেটা অন্য প্রসঙ্গ অন্তত এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, রামায়ণ, মহাভারত বা অন্যান্য পুরাণ কাহিনীতে নানা অবতারের বা ‘শাপদ্রষ্ট’ দেবতাদের জন্মবৃত্তান্তের সঙ্গে কবি তারকের জন্মের বেশ মিল আছে। কবি তারক এক ‘দৈব’ স্বাবস্থাজাত সন্তান এবং তিনি যে কবি (রচক)

হবেন সেকথাও কোন এক আচার্য ব্রাহ্মণ জানিয়েছিলেন তাঁর জন্মকবেই। এমন ব্রাহ্ম আত্মশীল কবি যদি কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের জীবনকৃতান্ত লেখেন তখন তো সে জীবনী হতেই হয় এই ব্রাহ্মণ ধর্মশাস্ত্র ও নানা পুরাণের অনুকরণ, অনুসরণ এবং অস্তঃপর ব্রাহ্মণ্যবোধ আকর। যে কোন ইতিহাস সচেতন, সমাজ সচেতন পাঠক মারোই কবি তারকের রস ‘শ্রীশ্রীহরিশ্চন্দ্র’ থেকে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছাবেন।

আরো একটা চমকপ্রদ কথাও কবির এই গোলক গোসাই-এর স্বপ্নভাবনা থেকে জানা পায়। সেটা হল, এই ‘লীলাগ্রন্থ’ রচনায় কবি তারক আসলে বাজীপরের হাতের কাণ্ড পুতুলমাত্র, আসল লেখক হলেন কে? জানা যাক:

বাজীর ছায়াবাজী দেখায় বিপুল।
না চাইতে পারে তারা কাণ্ডের পুতুল।।
গোস্বামী লোচন দশরথ মৃত্যুঞ্জয়।
তুই কাণ্ড পুতলিকা তেমনি নাচার।। (এ.পৃ.৭)

কবি তারক সরকার, অতঃপর ছিলেন উক্ত গোস্বামীদের হাতে এক কাণ্ডের পুতুল মাত্র তাঁরা কবিকে যা লিখতে বলেছিলেন, কবি তাঁর কবিত্বের দ্বারা তাই লিখেছেন মাত্র:

মৃত্যুঞ্জয় দশরথ আর মহানন্দ।
তোরে করে কেল্যফলি তাদের আনন্দ।। (পৃ.৭)
কেবল তাই নয়, গোসাইদের নির্দেশ:
শীঘ্র করি লেখ মোর প্রভুর মহিমে।
লেখ লেখ যাহা তোমার উচিত কলমে।।

কোন ঠাই লিখিতে হইলে কিছু সদ্ধ।
আরোপে দেবিবি হরি-চরনারসিন্দ।। (পৃ.৭)

তাহলে ‘আরোপ’ করে, নিজের খুসিমত সন্দেহ (সন্দ) জনক হলে নিজের কল্পনাকে প্রয়োগ করতে পারবেন কবি। এমন পরামর্শ কবিকে দিয়েছেন স্বয়ং হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গী অনুগামী (১) এক গোসাই। আমরা জানি, কবির কিছু ‘ছাড়’ পাওনা থাকে, কিন্তু সে তো তথ্যকে মহিমামণ্ডিত করার জন্য। অথচ এখানে কবির কলমে যা উঠবে তাই লেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আবার এই কবি গোস্বামীদের হাতে ‘কাণ্ড পুতলিকা’। তাই এই গ্রন্থ রচনার কবির

কলমে যা উঠেছে তা তাঁর নিজস্ব ভাবনার বা জানা তথ্য নয়, গোসাইদের সরবরাহ করা এখা। তাই কবির এই হরিশ্চন্দ্র জীবনী, এই ‘লীলাগ্রন্থ’, যা একান্তভাবেই ব্রাহ্মণ্য ভাবাবেশে গঠিত তা অব্যত হরিশ্চন্দ্রকে ধর্মগুরু বা অবতার বানাবার গোস্বামীদের এক ব্রাহ্মণতান্ত্রিক ষড়যন্ত্রিকার ফলশ্রুতি। (এ ঘটনা থেকে বুঝতে পারা যায়, গোস্বামী মৃত্যুঞ্জয়, লোচন আর দশরথের সমানে লেখ এই গ্রন্থ, যা আসি হরিশ্চন্দ্র ঠাকুরের মানব প্রেমিক রূপ নয়, উপস্থাপিত করে ব্রাহ্মণতান্ত্রিক এক অবতার রূপে।) মহান হরিশ্চন্দ্র তাঁর জনগোষ্ঠীকে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের পথনির্দেশ দিয়েছিলেন সে পথ তাঁর পুত্র আর এক মহান ব্যক্তিত্ব ওরফে দশরথের পিতার সাহায্যে হেঁচু যথার্থ্যগতভাবে অনুসরণ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু ফেসব গোসাই হরিশ্চন্দ্রকে অবতার বানিয়ে তাঁর জনগোষ্ঠীর মানুষদের বিভ্রান্ত করেছেন, ইতিহাসের সাথে যোগ্য ভূমিকা পালন থেকে বিচ্যুত করেছেন, সেইসব গোসাই আর দশরথ অবতারের সঙ্গী সাথীদের ভূমিকা পালন করেই হরিশ্চন্দ্রকে এবং তাঁর মতাদর্শকে গণমানুষ থেকে আড়াল করেছেন। আর এজন্যই হরিশ্চন্দ্রের নিজ জনগোষ্ঠীর মানুষেরা ইতিহাস সৃষ্টিকার পরিবর্তে হয়েছেন ইতিহাসের হাতে ক্রীড়নক। কবি তারক সরকার কেবল গোসাইদের খুশি করতে দিয়ে নয়, নিজের ব্রাহ্মণতান্ত্রিক প্রচেষ্টা দ্বারা তাঁর স্বজনগোষ্ঠীর মানুষদের চৈতন্যকে ব্রাহ্মণ্য দাসত্বে আবদ্ধ করেছেন।

কবির স্বম্বাক্শেপকে সত্তা ধরে নিলে একটা প্রশ্ন তো পরিহার করা যায় না, যে কেন তাঁর এমন স্বপ্নবোধ লাগল? স্বপ্ন বিশেষজ্ঞরা এর উত্তর হরত জানেন। কিন্তু যুগান্তে পারা যায়, গোস্বামীদের জ্বররশ্মি কোন পর্যায়ে ওঠায় কবি তারক মানসিকভাবে এতটাই বিপর্যস্ত হয়েছিলেন যে শেষপর্যন্ত ‘লীলাগ্রন্থ’ রচনা করতে তাকে এই ভয়াকর স্বপ্নের গলটি উদ্ভাবন করতে হয়েছে। আসলে তাঁর অসম্পূর্ণ রচনা সম্পূর্ণ করা ও প্রকাশ করার জন্যই এই গল্পের অবতারণা। বস্তুত ব্রাহ্মণ্য গাল-গল্পের সুবিপুল আমদানির ফলে এই গ্রন্থ থেকে অসংখ্য সাধন করেই পাঠককে শ্রী হরিশ্চন্দ্র ঠাকুরকে অবিজ্ঞার করতে হবে।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র ঠাকুর এক ঐতিহাসিক ব্যক্তি। আর তাই তাঁকে জনান্তে, যুগান্তে চাই তথ্য, ঐতিহাসিক তথ্য, যে তথ্যের শরীরে ব্যহিত হয় কাল ও সমসাময়িক ও সমকালীন ঘটনার প্রতিফলন। অথচ শ্রী হরিরবর সরকার এই ‘লীলাগ্রন্থ’-এর ভূমিকায় লিখছেন:

“অনুনা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আশ্চর্য ঘটনাকলীর সত্যায় বিশ্বাস স্থাপন করিবার অক্ষমতা দৃষ্ট হয় এই সম্প্রদায়কে আমার বক্তব্য এই আশ্চর্য বিচিত্রপূর্ণ জগতের বিশেষত: ধর্মজগতের ঘটনাবলী, মানুষের পক্ষে সমস্তই আশ্চর্যপূর্ণ। ধর্মজগতের ইতিহাসে, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অতীব আশ্চর্য ঘটনার বিবরণ দৃষ্ট হয়। শ্রীশ্রী মহাশয়

চৈতন্য সেবের জীবনের ঘটনাবলী, সমস্তই আশ্চর্য ঘটনাপূর্ণ। এমন কি পাশ্চাত্য জগতের ধর্ম প্রভু বীণুর জন্মজীবনী ও কার্যকলাপ আশ্চর্য ঘটনাপূর্ণ। কিন্তু তাই বলিয়া, এই সমস্ত ঘটনাবলীর সত্যতার কেহই সন্দেহান হয় না।” (ছব্ব উদ্ধৃত)

তা হলে দেখা যাচ্ছে, ‘পাশ্চাত্য’ শিক্ষায় ‘শিক্ষিত’ এদেশীয় ‘সম্প্রদায়’ ধর্মগুরুদের ‘জীবনে’ ঘটিত আশ্চর্যজনক ঘটনায় অবিশ্বাসী হলেও সেই পাশ্চাত্যের লোকদেরই “এই সমস্ত ঘটনাবলীর সত্যতার কেহই সন্দেহান হয় না।”

খুবই স্বাভাবিক যে প্রশ্ন উঠবে: যে পাশ্চাত্যের লোকেরা সকলেই ধর্মগুরু (যিশুর) জীবনের আশ্চর্যজনক ঘটনায় বিশ্বাসী, সেই পাশ্চাত্যের লোকদের শিক্ষা নিয়ে এদেশের ‘শিক্ষিত সম্প্রদায়’ কেন এইসব অত্যাশ্চর্য ঘটনায় অবিশ্বাসী হন?

আসলে ধর্মকে জীবিকা করেন যারা তাঁদের রচিত গ্রন্থাবলী তো এদেশে যারা ধর্মকে জীবিকা করেছিলেন সেই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় রচিত শাস্ত্র থেকে গুণ ও আঙ্গিক পৃথক হতে পারে না। কবিয়াল শ্রী হরিবর সরকারও শাস্ত্র নামক ধর্মগ্রন্থকে বলতে চান ‘ধর্মজগতের ইতিহাস’। মুশকিল হলো এখানেই: ইতিহাস আর লীলা এক বস্তু নয়। ইতিহাস লিখতে চাই তথ্য, আর ‘লীলা’ রচনা করতে চাই উর্বর মস্তিষ্কসূত ‘আশ্চর্য কাহিনী’, যে কাহিনী দ্বারা অতিসহজে অজ্ঞ ও শিক্ষাবঞ্চিত মানুষ আকৃষ্ট হন, অথবা হয়ত প্রতারিত হন, ঠিক যে কারণে সমাজ-ইতিহাস বোধ বর্জিত অনভিজ্ঞ শিশু রূপকথা দ্বারা আকৃষ্ট হয়। বস্তুত, শিক্ষাবঞ্চিত অজ্ঞ মানুষকে শিশুর জগতে প্রতিবন্ধী করার চক্রান্ত থেকেই রূপকথার মতই এইসব ‘লীলা’ কথার কারবার শুরু করা হয় ধর্মব্যবসায়ীদের তরফে শোষণ-শাসকের স্বার্থে।

কবিয়াল হরিবর সরকার কেন এমন উদ্ভট প্রতিবেদনাংশ তাঁর লিখিত ভূমিকায় যুক্ত করেন, যা কিনা পুস্তক রচনার ইতিহাসের সঙ্গে (যা তিনি বর্ণনা করেছেন এই ভূমিকার) সংগতিপূর্ণ কোন উপসংহার নয়?

সম্ভবত এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা। শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের স্বজনগোষ্ঠী ও অন্যান্য অনুগামীরা তাঁর সুযোগ্য পুত্র, সমকালীন জীবনে প্রবেশের পথ-প্রদর্শক, শ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে যে জীবন অভিমুখে অগ্রসরমান, সেই জীবনে প্রবেশের জন্য এই অনুগামীরা অবশ্যই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন, এবং শিক্ষিত তাঁদের হতেও হবে। ফলে এইসব অনুগামীরা ঐ পাশ্চাত্য শিক্ষায় ‘শিক্ষিত সম্প্রদায়ের’ দোষে দুষ্ট হবেন, এমন আশংকা ছিল শ্রীহরিবর সরকারের। তেমন ক্ষেত্রে এই ‘লীলাগ্রন্থ’ নিয়ে যেসব গোষ্ঠ্যমীরা ধর্মকে জীবিকা করবেন, তাঁদের ভক্ত জোটানো কঠিন হবে। আর তাই শ্রীহরিবর সরকার বলতে চান: পাশ্চাত্যের

লোকেরা যেমন ‘কেহই’ ‘প্রভু বীণুর জন্মজীবনী ও কার্যকলাপ’ ‘অত্যাশ্চর্য ঘটনায় পূর্ণ হলেও অবিশ্বাস করে না, তেমনি হে, নবশিক্ষিত মতুয়াবৃন্দ, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মত তোমরা কেউ এই গ্রন্থে বর্ণিত ‘অত্যাশ্চর্য ঘটনায় অবিশ্বাস করো না।

এমন চাপা আবেদন থাকায়, এই সম্প্রদায়ের অনেকাংশ লোকেরাও অদ্যাবধি ঐ ব্রাহ্মণাত্মক খপপূরে পড়া লোকদের মতই অবৈজ্ঞানিক ও ইতিহাস বিমূখ মানসিকতার শিকার। আর তাই আজও তাঁরা ইতিহাস রচনা (সার্বিকভাবে নিজেদের জীবন ও সংগ্রামকে বদলে ফেলা) থেকে দূরে, অত্যাশ্চর্য ঘটনার দিন গুনছেন— দিন গুনছেন, কবে আবার অন্য এক ‘অবতার’ বা অবতারের অবতার, বা তস্য তস্য অবতার ‘আবির্ভূত’ হবেন তাঁদের ‘মুক্তি’ পথ প্রদর্শন করতে। অথচ তাঁরা যদি ইতিহাস সচেতন হতেন, হতেন সমাজ সচেতন, তা হলে দেখতে পেতেন তথাকথিত হিন্দুদের অথবা অন্য যেকোন ধর্মের অবতার এই মাটির পৃথিবীতে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বেঁচে থাকার কোন পথ দেখাননি, তাঁরা জীবনের পথ নয়, দেখিয়েছেন মৃত্যুর বা মৃত্যু পরবর্তী জীবনের (?) পথ। অথচ হরিচাঁদ তাঁর জনগোষ্ঠীর মানুষদের দেখিয়েছেন জীবনে সহজভাবে বেঁচে থাকার পথ, যথার্থ জীবন-সংগ্রামের পথ। এবং কবি তারক চন্দ্র সরকারের ভাষায় এসম্পর্কে হরিচাঁদ ঠাকুরের বক্তব্যও জেনে নিতে পারি:

গৃহেতে থাকিয়া যার হয় ভাবোদয়
সেই সে পরম সাধু জানিবে নিশ্চয়। (ঐ, পৃ ২৩, ২৫)

মহান হরিচাঁদই একমাত্র ব্যতিক্রমী ‘অবতার’ যিনি মানুষকে এই জড়জগতে গৃহীর জীবনযাপন করতে পরামর্শ দিয়েছেন, যার নিগলিতার্থ হলো এই যে মানুষকে জড়সম্পদ সৃষ্টি করতে হবে, নিজেকে পবিত্র রেখে, অর্থাৎ অসততার পথ পরিহার করে, যা করে থাকেন শ্রমজীবী মানুষেরা।

শ্রী হরিবর সরকার অলৌকিক বা তাঁর ভাষায় ‘অত্যাশ্চর্য ঘটনা’ সম্পর্কে মানুষের আস্থা দাবি করেছেন। প্রশ্ন হলো, অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটান আপেক্ষায় যদি হরিচাঁদের গৃহী মানুষেরা বসে থাকেন তা হলে কি তাঁদের জৈবিক জীবন প্রক্রিয়া, অর্থাৎ তাঁদের গৃহজীবন বজায় রাখতে পারবেন? ‘গৃহেতে থাকিয়া’ তখন ‘ভাবোদয়’ হবে তো?

এক গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী অন্ততঃ স্বীকার করেছেন: খালি পেটে ধর্ম হয় না।

শিক্ষিত হওয়ার অর্থ তো কেবল বিদ্যালয় বা উচ্চতর শিক্ষালয় থেকে অর্জিত জ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ হওয়া নয়, মানুষ তার কাজের মধ্য দিয়ে সর্বদাই জ্ঞানার্জন করে, শিক্ষিত হয়ে ওঠে।

‘অত্যাশ্চর্য ঘটনা’ ঘটান অপেক্ষায় বসে থাকা নিরক্ষর চাষি যখন দেখবেন যে কোন অলৌকিক ঘটনার দ্বারা তাঁর ক্ষেত ফসলে ভরে উঠল না, তখন তিনি এই শিক্ষা পাবেন, যে তাঁকে শ্রমদ্বারা ফসল ফলাতে হবে। তাঁর এই অভিজ্ঞতা তাঁকে এও শেখায়, যে অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে না। এই শিক্ষা পাওয়ার জন্য চাষিকে কোন ‘শিক্ষিত’ সম্প্রদায়ের লোক হতে হয় না।

শ্রী সরকার জানিয়েছেন, শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের সব ঘটনাবলীই নাকি ‘অত্যাশ্চর্য ঘটনা’। কিন্তু আমরা অবাক বিষ্ময়ে এও দেখি যে এই ‘অত্যাশ্চর্য ঘটনা’ সমুদ্র মানুষটি হরিচাঁদের গৃহীর জীবন যাপন করতে পারেন নি। তিনি সম্যাস নিয়ে হরিচাঁদ-এর ভাবনার গৃহীতজীবনের মৌলিক দায়িত্ব অস্বীকার করেছিলেন, তিনি মাতা ও স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায় অস্বীকার করেছিলেন। অথচ যে ব্রাহ্মণ্যধর্মেরও ধর্ম তথা বৈষ্ণব ধর্ম সেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরও কোমল রূপ এই সম্যাস।

যদি শ্রী সরকার তাঁর কবিয়ালি চাতুর্য দ্বারা প্রমাণও করেন যে শ্রীচৈতন্য সম্যাস নিয়ে সঠিক কাজ করেছিলেন, তাহলে তো তাঁকে এবং তাঁর সব অনুগামীদের সম্যাস নেওয়া নৈতিকভাবে বাধ্যতামূলক। এবং সবাই যদি শ্রীচৈতন্যের পথকে বেছে নেন সেক্ষেত্রে যে মানুষদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে এই সাধু-সন্ন্যাসীরা জীবন ধারণ করেন, সেই শ্রমজীবী গৃহী মানুষের অভাবে এত আয়োজনের গাজন নষ্ট হবে। এবং একই সঙ্গে শ্রীহরিচাঁদের গৃহীর জীবনযাপনের পরামর্শকে ও উপেক্ষা করা হবে।

শ্রীহরিবর সরকারের সর্বশেষ মন্তব্য, যে শ্রীচৈতন্যের জন্ম, জীবন ও কার্যকলাপ সবটাই অত্যাশ্চর্য ঘটনাবল্য হলেও ঐসব ঘটনার “সত্যতায় কেহই সন্দেহান হয় না”। এমন মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় কেবল এটুকু বলছি যথেষ্ট যে কেউই যখন সন্দেহান হয় না, তখন আর পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদেরই বা তিনি ‘সন্দেহান’ হওয়া লোকদের তালিকায় কেন রাখেন? আসল কথা তো এই, যে শ্রীহরিচাঁদের জীবন ও কার্যাবলি নিয়ে কবিয়ালরা যেমন খুশি গান-গল্প বানাবেন, তাতে কারো সন্দেহান হওয়া চলবে না? অধিকন্তু, কেউ যেন ঐসব অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটান অপেক্ষায় নিজেদের কাজকর্মকে অবহেলা না করেন।

সুদূর অতীত থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সময়ের সঙ্গে মানুষের জীবন ধারায়, জীবন ভাবনার পরিবর্তন ঘটেই চলেছে। এই পরিবর্তন ঘটে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের অভিঘাতের দ্বারা জীবন সংগ্রামের পরিবর্তন ঘটায়।

একজন যথার্থ যুগপুরুষ মানুষকে আত্মান জ্ঞানান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্বারা প্রভাবিত নতুন জীবনযাপন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে এবং ঐ জীবন প্রক্রিয়ার অনুসারী জীবন ধারায় নিজেদের

খাপ খাইয়ে নিতে।

দূরত্বের বিষয়, আমাদের পুরোনো সংস্কৃতি সহজে পথ ছাড়ে না এবং সেই জীবন-সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন তাঁরাই যারা পুরোনো জীবন ব্যবস্থায় বেশি সুবিধা ভোগ করেন? কারণ, এতে চিরায়ত বস্তুত্ব নতুন জীবনধারণার নিজেদের উপযুক্ত করতে বিলম্ব করবেন এবং সেই অবকাশে চিরায়ত সুবিধাভোগীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নতুন জীবনকে আয়ত্ত করে নিজেদের সুবিধাজনক অবস্থানকে ধরে রাখতে সক্ষম হবেন।

মধ্যযুগ পর্যন্ত এবং এদেশে সাম্প্রতিক অতীত পর্যন্ত মানুষের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা হেতু পরস্পর সম্পর্কে মানুষ যেমন অজ্ঞ থাকেছে, তেমনি ঐ অজ্ঞতার শূন্যস্থানে সাধু-সন্ন্যাসী-গোসাইদের প্রচারের দ্বারা নানা তথাকথিত অত্যাশ্চর্য বা অলৌকিক ঘটনা স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু এখন পৃথিবী খুব ছোট হয়ে গেছে, মানুষ পরস্পরের অনেক কাছাকাছি এসে গেছে। তাই সব ঘটনা তার বাস্তব চেহারা নিয়েই মানুষের নিকট, প্রশ্ন উত্থাপনকারী মানুষের নিকট উপস্থিত হয় এবং অতঃপর ঐ বাস্তব ঘটনার শরীরে কোন অত্যাশ্চর্য বা অলৌকিক ছাপ থাকতে দেখা যায় না।

ইতিহাস বলে, ধর্মগুরুদের নানা ‘অত্যাশ্চর্য’ কর্মকান্ড তাঁদের অনুরাগী শিষ্যদের মস্তিষ্ক প্রসূত কল্প কথা মাত্র। আসলে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনাই যুক্তির মাপকাঠির বাহিরের কিছু নয়। হতে পারে ঐসব ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার মত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য মানুষের করায়ত্ত সর্বদা থাকে না; কিন্তু তাই বলে ঘটনা কখনই ‘অত্যাশ্চর্য’ কিছু নয়, যদি অবশ্য ঘটনাটি সত্যিই ঘটে থাকে। একথা থেকে অবশ্য এমন সিদ্ধান্ত সঠিক নয়, যে যা কিছু যুক্তি সম্মত তাই বাস্তব। কেন না যুক্তির মার পাঁচে অনেক অবাস্তবকে বাস্তব এবং অনেক বাস্তবকে অবাস্তব প্রমাণ করে নিতে পারেন তর্কবাণীশ্বর। যুক্তিকে অবশ্যই তথ্য ও তত্ত্ব নির্ভর হতে হবে।

শিষ্য বা অনুরাগীদের তরফে গুরুদের সম্পর্কে নানা তথাকথিত ‘অত্যাশ্চর্য’ ঘটনা যে সরবরাহ করা হয় তেমন ইঙ্গিত আমরা শ্রীহরিবর সরকার কর্তৃক লিখিত পরিশিষ্ট (পৃ. ২৮) থেকেও পেতে পারি। তিনি জানাচ্ছেন:

“আমি বোধকরি, প্রভুর আজীবন লীলার কণাংশ মাত্রও এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল না।... কিন্তু তাঁহার অনুভব ভক্ত বা প্রাচীনতম ব্যক্তি বা তাহাদের বংশধরগণের প্রমুখ্যৎ যাহা শ্রুত হওয়ায় তাহা সংগ্রহ করিতে পারিলে এরূপ অনেকানেক গ্রন্থ হইতে পারে।”

হ্যাঁ, এভাবেই বিচ্ছিন্ন মানুষের মধ্যে নানা কল্পকাহিনী তাদের গুরু সম্পর্কে ভক্তদের দ্বারা প্রচারিত হয় এবং একসময় গুরু হয়ে ওঠেন কোথায়ও ঈশ্বর পুত্র, কোথায়ও পরগন্ধর, কোথায়ও

বা অবতার। আর গ্রন্থকার যদি হন ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার প্রভাবিত, তা হলে কোন জননেতাকে কেবল ধর্মগুরু বানাবেন না, তাকে বানাবেন স্বয়ং তথাকথিত ঈশ্বর বা তার অবতার। ‘শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত’-এর লেখক শ্রীসরকার তাই নিঃসন্দেহে এক ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রপ্রাণিত মানুষ। তাঁর আত্মপরিচয় থেকেও একথা আমরা জানতে পারি। ‘গ্রন্থকারের বিনতি’ নামক শিরোনামের অংশে তিনি শুরু করেছেন এভাবে:

গোপদ্বীপের অনুমতি, যদি মাতা সরস্বতী,
মুচ্যতি আমি অভাজন।
শক্তিময় দিয়া শক্তি, আমাধারা কর উক্তি,
পঞ্চাশ বর্ষ স্বর ব্যঞ্জন।।

লেখে যদি শূলপানি, বাণী যদি বলে বাণী,
তবু বাণী অবধি না হয়।
আমি যে সাহস করি লিখিতে কলম ধরি
সাধু গুরু বৈষ্ণব কৃপায়।। (এ, পৃ.৮)

শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম যে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রেরই এক ক্ষেত্রমূল রূপ, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বেঁচে থাকার এক ঐতিহাসিক বাধ্যবাধকতা, আচম্ভাল যখনকে কোল দেওয়ার ব্রাহ্মণ্য কৌশল, সে তো স্পষ্ট হয় স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে ফিরে যাওয়ার মধ্যে। কেবল এটুকুই কবির দার্শনিক পরিচিতি নয়। তিনি যে আপাদমস্তক হরিচাঁদের ভাবনা বিরোধী ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার লোক, সে পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর ‘গ্রন্থকারের বিনতি’ নামক ভনিতায়। আর আমরা হরিচাঁদকে খুঁজে পেতে চাইছি সেই গ্রন্থে যার লেখক স্বয়ং হরিচাঁদের দর্শন-বিরোধী ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের পদাশ্রিত। এই হরিচাঁদ-দর্শন বিরোধী কবির দাবি শোনা যাক:

লিখি লীলা গুহ্য বাহ্য গ্রন্থকার মনোদার্য
পূজা হোক ভক্ত সমাজেতে।। (পৃ.৮)

তাহলে দেখা যাচ্ছে তারক কবি তাঁর ‘লীলাগ্রন্থে’ কবির নিজের ‘মনোদার্য’ অর্থাৎ খুশিমত গোপন ও প্রকাশ্য লীলা তিনি রচনা করেছেন। অর্থাৎ, কবি আমাদের কার্যভ জ্ঞানিয়ে দিলেন, এই গ্রন্থের ‘অত্যাশ্চর্য’ ঘটনাবলী আসলে তাঁর ‘মনোদার্য’ বা ইচ্ছামত বানানো ঘটনা। তিনি অবশ্য তাঁর এই যা খুশি ‘মনোদার্য’ ঘটনা-সমৃদ্ধ গ্রন্থকে ভক্ত সমাজে ‘পূজা’ হতে দাবি জানাচ্ছেন। হ্যাঁ, ভক্ত সমাজে এমন দাবি চলে এবং তা মান্যতাও পায়। কেন না, ভক্ত যিনি, তিনি প্রগল্ভ, আত্মসমর্পিত। তাই তাঁর কাছে তাঁর গুরু বা ‘ঈশ্বর’ বা ‘অবতার’ সম্পর্কে সমস্ত অত্যাশ্চর্য ঘটনাই গ্রহণযোগ্য এবং অতঃপর, ‘পূজা’।

আরো লক্ষ করা যেতে পারে যে এই কবি এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্রের ও পৌরাণিক কাহিনীর অনুকরণে উপস্থাপিত করতে চান। তিনি তাঁর পাঠকদের জানাচ্ছেন—

বেদব্যাস মহামুনি, যত লিখিলেন তিনি
চারি বেদ আঠার পুরাণ। (পৃ.৮)

ইত্যাদি। কীভাবে সক্ষম হলেন ব্যাস এই সব গ্রন্থ লিখতে?

একদা বহ্নিক্রমে, ব্যাস মুনি ছিল ঘূমে
হেন কালে আসি দুই পাখি।

শাখে বসি দুই শূকে একটি কহিছে সুখে
অবিরত ‘ত্রয়োদ্বিংশৎ’।
অন্যটির মুখে বাণী, শুনিতেছে ব্যাসমুনি,
উঠে ধনি ‘পঞ্চপঞ্চাশৎ’।। (পৃ.৮)

অতঃপর ব্যাস ধ্যানযোগে জানলেন যে, যে-পাখি সংস্কৃত বলছে, সে হলো বাম্বীকি। এরপর,

ব্যাস কহে শুকপাখি, আমি যে ভারত লিখি,
বৈকুণ্ঠপতির সব লীলা,
বাসুদেব যদুবংশ, কৃষ্ণ নারায়ণ অংশ
লিখি তাঁর ঐশ্বর্যের খেলা।। (পৃ.৯)
..... ইত্যাদি।

এইরূপে কবি তারক রামায়ণ-মহাভারত রচনার কল্পকাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপিত করার পর ‘হরিলীলা’ বর্ণনা করতে চান। অর্থাৎ কবি তারক সরকার মহান এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ধর্মশাস্ত্র রচনার কল্পকাহিনী অনুসরণ করার কথা ঘোষণা করেন:

সেই মত লিখি পুঁথি হরিচাঁদ লীলাগীতি
রামকার্যে মার্জারের ন্যায়। (পৃ.১১)

স্বাভাবিক ভাবেই এমন গ্রন্থ থেকে সেই বাস্তব জীবনে পথ চলার কোন নিক-নির্দেশ পাওয়া যাবে না, যে-বাস্তব গৃহীতবলকে অনুসরণ করতে হরিশ্চন্দ্র তাঁর স্ব-জনগোষ্ঠীকে আহ্বান জানিয়েছেন। তথাকথিত ধর্মগ্রাণ মানুষ ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে পারিধি জগতে চলার পথ অনুসন্ধান করেন না, তাঁরা কেবল ‘পুণ্যার্জনের’ জন্য ধর্মপাণ্ড পাঠ করেন। ‘শ্রীশ্রীহরিশ্চন্দ্রমৃত’ রচনা পদ্ধতি যেহেতু ব্রাহ্মণতন্ত্রের ধর্মশাস্ত্র রচনাকে অনুসরণ করেছে, তাই এই গ্রন্থ হরিশ্চন্দ্রের জীবনী না হয়ে, হয়েছে ‘ধর্মগ্রন্থ’ যা পাঠ করলে ভক্ত ভাবতে পারেন যে তিনি ‘পুণ্য’ সঞ্চয় করলেন। কিন্তু এই গ্রন্থ থেকে হরিশ্চন্দ্র-এর নির্দেশিত পথ সরাসরি খুঁজে পাওয়া যাবে না, তাই পাওয়া যাবে না গৃহীতবল যাপনে সাক্ষর অর্জনের উপায়।

এই সিদ্ধান্ত থেকে একথা বলাই যায়, কবি তারক ও তাঁর প্রেরণাদাতা গোস্বামীরা মহান হরিশ্চন্দ্রের প্রতি, তাঁর স্ব-জনগোষ্ঠীর প্রতি এক অমার্জনীয় অপরাধ করেছেন, তিনি হরিশ্চন্দ্রকে ব্যবহার করেছেন তাঁর জনগোষ্ঠীকে ব্রাহ্মণতন্ত্রের দাসত্ব অবনত করতে। এমন ঘটনা যাতে না ঘটে, যাতে তাঁর জনগোষ্ঠীর মানুষেরা তাঁর জীবন থেকে বাস্তব জীবন সংগ্রামের পথনির্দেশ পেতে পারেন, ব্রাহ্মণতান্ত্রিক ‘পুণ্য সঞ্চয়’ নামক কৃষিকার শিকার না হন, সেইজন্য শ্রী হরিশ্চন্দ্র এই গ্রন্থ প্রকাশ নিয়েষ করেছিলেন। তাঁর নিবেদকে অমান্য করে এই গোস্বামীরা হরিশ্চন্দ্রের প্রতি যেমন বিশ্বাস ভাসের অপরাধে অপরাধী, তেমনি তাঁরা হরিশ্চন্দ্রের জনগোষ্ঠীকে ব্রাহ্মণতান্ত্রিক নিপীড়ন থেকে মুক্তির পথ, উন্নত জীবনযাপনের পথ থেকেও দিক্‌হীন করেছেন। এই জনগোষ্ঠী সহ সারা ভারতের শ্রমজীবী জনমানুষ ব্রাহ্মণতন্ত্রের দ্বারা যে মানবত্বের সামাজিক নিপীড়নের শিকার হয়েছেন তার থেকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করতে তিনি ব্রাহ্মণ্য বিধি-নিকেধ উপেক্ষা করার আন্দোলন শুরু করেন। স্বয়ং কবি তারকই জানাচ্ছেন:

ব্রাহ্মণেরে মান্য লিল নিজ ভগবান
কি সাহসে হরিদাস করে অপমান।

এই ছিল হরিশ্চন্দ্র (তখনও হরিশাস বিশ্বাস) ঠাকুর সম্পর্কে ব্রাহ্মণের প্রতিক্রিয়া। তাঁদের আরো প্রতিক্রিয়া ছিল:

কেলিবিধি নাহি মানো না মানো ব্রাহ্মণ।
নিশচয় করিতে হবে এদলে শাসন।। (পৃ.৯৪)

এবং ব্রাহ্মণতন্ত্রের প্রতিনিষিদের সম্পর্কে হরিশ্চন্দ্রের মূল্যায়ণ ছিল:

কোথায় ব্রাহ্মণ সেখ কোথায় বৈষ্ণব।

স্বার্থ বাশে অর্থপোভী যত ভক্ত সব।। (পৃ.৯৪)

এই হলো ব্রাহ্মণ তথা ব্রাহ্মণতন্ত্র অর্থাৎ তথাকথিত হিন্দুধর্ম সম্পর্কে শ্রী হরিশ্চন্দ্র ঠাকুরের মূল্যায়ণ। অথচ তারক গোস্বাই, সম্ভবত অন্যান্য গোস্বাইদের প্ররোচনায়, হরিশ্চন্দ্রের বার্তাকে করালেন সেই ব্রাহ্মণতন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পিত। এভাবেই নমো ও ব্রাহ্মণতন্ত্রের দ্বারা নিপীড়িত অন্যান্য শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর জীবন ব্যাধা হরিশ্চন্দ্রের কালোপরেণী বার্তা থেকে বঞ্চিত হলো এবং এসব মানুষেরা রয়ে গেলেন ব্রাহ্মণ্য সামন্ততন্ত্রের সাংস্কৃতিক ধান-ধারণায় মোহাচ্ছন্ন এবং অতঃপর তাঁরা রয়ে গেলেন ব্রাহ্মণতন্ত্রের সুবিধাজোগীসের নিকট যুগ্ম, যারে গেলেন তাদের পথপ্রদর্শিত।

পিতৃ-সংসর্গ হেতু মহান গুরুচাঁদ ঠাকুর তাঁর জনগোষ্ঠীর সমকালীন জীবনের প্রয়োজনীয় অভিমুখিতা যুগ্মেতে পেরেছিলেন যশেই এই জনগোষ্ঠী কিছুটা হলেও তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। গুরুচাঁদের শিক্ষা আন্দোলন সেই পথ-নির্দেশেই ফলশ্রুতি। অপরদিকে পরবর্তী ঠাকুর পরিবার ব্রাহ্মণতন্ত্রের দ্বারা অনুসরণ করে ব্রাহ্মণতান্ত্রিক ধর্মবিশ্বাসে লিপ্ত। এই পথে তাঁদের অনুপ্রেরণা হলো কবিদাল শ্রী তারক চন্দ্র সরকারের ‘শ্রীশ্রীহরিশ্চন্দ্রমৃত’।

যুক্তিবাদের আলোকে মতুয়া ধর্ম

নকুল মল্লিক

ধর্মতত্ত্বের ভিত্তর পরিপূর্ণ যুক্তিবাদের অবস্থান মেলে না। পৃথিবীর সকল ধর্মের স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য আমাদের জ্ঞাত নয় তবে ভারতীয় ধর্মের ভিত্তর বৌদ্ধধর্ম, যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবী করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রেও বিতর্কের অবকাশ আছে। ঈশ্বর, পরমাশ্রা, পরমব্রহ্ম, ইহকাল, পরকাল, স্বর্গ-নরক সম্বন্ধে তথাগত বুদ্ধ নীরব ছিলেন বলে তাঁকে যুক্তিবাদী বলতে আর দিখা থাকে না। এমন একটি ধর্মের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় ঠাকুর হরিচাঁদ প্রবর্তিত মতুয়া ধর্মে। এই ধর্মের আকরগ্রন্থ শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত পুস্তকে এ বিষয়ে উল্লেখিত আছে—

“বুদ্ধের কামনা তাহা পরিপূর্ণ জনা।
যশোবন্ত গৃহে হরি হৈল অবতীর্ণ।।”

মতুয়া ধর্মের সামগ্রিক সত্তাকে যদি সঠিক মূল্যায়ণ করা যায় তবে অকপটে স্বীকার করা যায় মতুয়া ধর্ম—

মানবিক ধর্ম, গার্হস্থ্য ধর্ম, সমাজ রূপান্তরের ধর্ম, গণমুক্তির ধর্ম, প্রতিবাদী ধর্ম, জ্ঞান-ভক্তি ও কর্মের সমন্বয়ের ধর্ম, আত্মোন্নয়ন ও আত্মজাগরণের ধর্ম, চারিত্রিক সংযম সাধনার ধর্ম, শ্রেনী-বর্ন বিভেদহীন ধর্ম, দেব-দেবী-বাগ-যজ্ঞ-তন্ত্র-মন্ত্র শূন্য ধর্ম, নারী মর্যাদার ধর্ম।

এই ধর্ম পালনের জন্য কোন দীক্ষা বা গুরুভজনার প্রয়োজন নেই, আছে কেবল ঠাকুরের ঘাদশটি সহজ সরল নির্দেশিকা, যা সমাজের অতি সাধারণ স্তরের মানুষ অতি সহজে পালন করতে পারে।

১) সদা সত্য কথা বলা। ২) পরস্পরকে মাতৃ জ্ঞান করা। ৩) পিতা-মাতার প্রতি ভক্তি করা। ৪) জগৎকে শ্রেমদান করা। ৫) পবিত্র চরিত্র ব্যক্তির প্রতি আতিথেয়তা না করা। ৬) কারও ধর্ম নিন্দা না করা। ৭) বাহ্য অঙ্গ সাধু সাজ ত্যাগ করা। ৮) শ্রী হরিমন্দির প্রতিষ্ঠা করা। ৯) ষড় রিপূর নিকট থেকে সাবধান থাকা। ১০) হাতে কাম মুখে নাম করা। ১১) দৈনিক প্রার্থনা করা। ১২) ঈশ্বরে আশ্রয়ান করা।

একজন নিপুণ পাঠকের পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে তিনটি নির্দেশিকা যুক্তিবিচারে প্রতিহত হতে পারে। শ্রীহরিমন্দির প্রতিষ্ঠা অর্থে কোন যুক্তিবিহীন ভক্তিবাদের কথা নেই। হরি বলতে বৈকুণ্ঠের হরিকে স্মরণ করা হয়নি। মতুয়া ভাবাদর্শে ব্যক্ত হয়েছে— সবকিছু হরণ করে তারে বলি হরি। সব বলতে দেহের জড়তা আর হৃদয়ের মলিনতা যার মাধ্যমে দূরীভূত

হয়। ন্যায়পরায়নতা, সংযম, নিষ্ঠা, চরিত্রের দোষগুলিকে দূরীভূত করতে পারে সম্পূর্ণভাবে। এই গুণত্রয়ের সম্মিলিত শক্তিকেই যথার্থ ভাবে হরি বলা হয়েছে। দৈনিক প্রার্থনা অর্থে কোন দেবদেবীর কাছে আত্মনিবেদন নয়, অভ্যন্তর জীবন চর্চায়, যাতে সর্বাস সুন্দর মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে তার নিরন্তর অনুশীলনকেই প্রার্থনা বলা হয়েছে। সবশেষে ঈশ্বরে আত্মদান বুঝতে ভগবান বা গড়কে আশ্রয়ান নয়। মতুয়া ধর্মে ঈশ্বরের ব্যাখ্যাই স্বতন্ত্র।

“যে যাহারে ভক্তি করে সে তার ঈশ্বর।
ভক্তিযোগে সেই তার স্বয়ং অবতার।।”

পুত্র যদি পিতাকে ভক্তি করে, ছাত্র যদি শিক্ষককে ভক্তি করে, ভগ্নী যদি ভ্রাতাকে ভক্তি করে, স্ত্রী যদি স্বামীকে ভক্তি করে, তাদের কাছে তারাই ঈশ্বর। এই তত্ত্বে নাম বিভ্রাট ভিন্ন যুক্তিতর্কের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। তথাগত বুদ্ধেরও এমন ত্রয়োদশ নির্দেশিকা পেয়েছি— পঞ্চাশীল অষ্টমার্গ বা পরিপূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য।

এখন আলোচ্য বিষয় মতুয়া ধর্মের স্বাতন্ত্র্য বা বিশেষত্ব কোথায়? দুইশত বৎসর পূর্বের গ্রামীণ সামাজিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ঠাকুর হরিচাঁদ উপলব্ধি করেছিলেন— ব্রাহ্মণ্যবাদ বলতে বা মনুবাদ সমাজের ঐক্য ও সংহতির প্রতিবন্ধক। ব্রাহ্মণ্যবাদ বলতে কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে বুঝায় না। যে ভাবনা অসাম্য, বিভেদ ও শোষণকে প্রশ্রয় দেয় সেই ভাবনার উৎসমুখ ব্রাহ্মণ লিখিত মনুসংহিতা। তাই এই ভাবনাকে বা শাস্ত্রীয় অনুশাসনকে ব্রাহ্মণ্যবাদ স্বীকার করে গেছেন—

ঠাকুর হরিচাঁদ হিন্দু ধর্মকে বৈদিক ধর্ম বলেই অভিহিত করেছেন কিন্তু বেদবিধির বিরুদ্ধেই তাঁর জলন্ত প্রতিবাদ। অনেকক্ষেত্রে মনুবাদী অনুশাসনের বিপরীত প্রক্রিয়াই তিনি গ্রহণ করেছেন, সে ক্ষেত্রে ভক্তিবাদ অপেক্ষা যুক্তিবাদই তাঁর কাছে প্রেরণাতর হয়ে উঠেছে। মনুবাদীরা যখন জীবন চর্চায় চতুরাশ্রম— ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাসের কথা বলছেন তখন ঠাকুর মন্তব্য করেছেন— একটি আশ্রমের মধ্যে সমস্ত আশ্রম নিহিত আছে তা হল প্রশস্ত গার্হস্থ্য আশ্রম।

“প্রশস্ত গার্হস্থ্য ধর্ম জীবে শিক্ষা দিতে
হরিচাঁদ অবতীর্ণ হন অবনীতে।।”

ঠাকুর হরিচাঁদ গার্হস্থ্য জীবন সাধনার একনিষ্ঠ অনুরাগী, সংসার তাগকে তিনি কোন ক্ষেত্রেই মেনে নিতে পারেননি। সমাজ সংসারের সকল প্রকার দায়-দায়িত্ব যথাযথ পালনের মাথোই

ধর্মসাধনা করার নির্দেশ তিনি দিয়েছেন। সম্রাস বা বৈরাগ্যকে তিনি কোন ক্রমে মেনে নিতে পারেননি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও ঠিক এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন—

“বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।।”

ঠাকুর বলেছেন— গার্হস্থ্য জীবনেই ধর্ম ও কর্মের সমন্বয় ঘটাতে হবে। সংসারে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, কন্যা ও আত্মীয় পরিজনদের প্রতি সকল দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই যত্ন করা হবে। তিনি গার্হস্থ্য ধর্মের পবিত্রতা রক্ষা করাকে অত্যন্ত উচ্চ স্থান দিয়েছেন। গার্হস্থ্য জীবন চর্চার মাধ্যমেই সাধারণ থেকে অতি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মাটির কাছাকাছি থাকা যায়। তাই ঠাকুর ব্যক্ত করেছেন—

“মনুষ্যে আসিয়া মনুষ্যে মিশিয়া
করিব মানুষ ভীলা পাইবে আমার
সেই তো সমর পুনশ্চ মানুষ হলে।।”

হিন্দুধর্ম বলেছে— বীৰ্য্য ধারণ ব্রহ্মচর্য্যম।
দোহের সর্বোত্তম শক্তি হল বীৰ্য্য। তাকে যথাযথ রক্ষা করতে পারলেই জীবন সাধনার উত্তীর্ণ হওয়া যায়। তাকে রক্ষা করার শ্রেষ্ঠ উপায়, নারী সঙ্গ থেকে দূরে থাকা। বীৰ্য্যপাত মৃত্যুর সমান, তাতে সাধন मार्গের বিঘ্ন ঘটে অতএব পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করতে হলে নারীস্পর্শ থেকে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়।

ঠাকুর বিপরীত কথাই বলেছেন—

“একনারী ব্রহ্মচারী পালো গৃহকর্ম।
গৃহকর্ম নষ্ট হলে, নষ্ট সব কর্ম।”

অর্থাৎ জীবনে একজন মাত্র নারী নিজের স্বীকে নিয়ে যদি সংযত জীবনযাপন করা যায় তাতে ব্রহ্মচর্য অক্ষর থাকে। সংসার জীবনে নিজের স্বীকে নিয়ে যদি সংযত ও পরিশীলিত জীবনযাপন করে, গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করা যায় তাতেই ব্রহ্মচারী হওয়া যায়। সবাই যদি নারীসঙ্গ ত্যাগ করে তবে বিশ্ব সংসার বিলুপ্ত হয়ে যায়।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই ব্রহ্মচর্য্য তত্ত্বের কঠোর প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁর কাব্যে—

“স্থিত্রিহের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন
সে নহে আমার,
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গড়ে গানে
তোমার আনন্দ হবে তার মাঝখানে।
মোর মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া।
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।।”

হিন্দুদের মনুসংহিতায় উল্লেখ আছে—

‘যভাব এষ নারীনাং নরানামিহ দুখনম’ অর্থাৎ মনুষ্যলিঙ্গকে কলঙ্কিত করাই নারীর যভাব। নারী নিজের সৌন্দর্যের প্রদোভন দেখিয়ে সর্বকণ পুরুষকে উদ্বৃত্ত ও বিভ্রান্ত করে। নারী নরকের দ্বার। নারীর সংসর্গেই পুরুষ উচ্চস্রে যায় অতএব ‘পথি নারী বিবর্জিতা’। পদমণ্ডপানের পথেও নারীকে বর্জন করা শ্রেয়। নারী কেবল পুরুষের ভোগাবস্তু, সম্ভ্রম উৎপাদনের যন্ত্র ভিন্ন কিছু নয়। নারী, পুরুষের সাধনপথের প্রতিবন্ধক, ধর্ম চর্চায় তাকে সঙ্গী করা চলে না। সংসারে নারী, পুরুষের সেবাদাসী হয়ে থাকবে। ঠাকুর হরিচাঁদ এই ভাবনার বিপরীত কথাটাই বলেছেন—

“করিবে গার্হস্থ্য ধর্ম লয়ে নিজ নারী।
গৃহে থেকে মানসী বান্দ্রস্বী ব্রহ্মচারী।।”

অর্থাৎ স্ত্রী স্বামীর দাসী নয় বরং তার ধর্ম ও জীবনসঙ্গিনী। মানব সংসারে উভয়ের মর্যাদা সমান। ধর্মে কর্মে নারীকে ব্রহ্মসংস্কারে সঙ্গী করতে হবে, সম্মান জাপন করতে হবে কেননা সংসারে নারী কেবল স্ত্রী নয়, সে কখনও মাতা, কখনও ভগিনী, কখনও বা কন্যা। ঠাকুর নারী-মুক্তি আন্দোলনের একজন পথিকৃৎ। তাঁর ভাবনায় সহমতও পোষণ করেছেন নজরুল ইসলাম—

“বিশ্ব যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যানকর,
অর্জেক তার করিয়াছে নারী, অর্জেক তার নর।।”

তবে ঠাকুর একটা বিষয় খুব সাবধান করে দিয়েছেন— নারীসঙ্গ যেন কখনও ব্যতিচারিতায় পরিণত না হয়, তার প্রতি যেন মন্দ দৃষ্টি কখনও আরোপিত না হয়—

“পর পতি পর সতী স্পর্শ না করিবে।
না ভাবো হরিকে, হরি তোমারে ভাবিবে।।”

পরতীর প্রতি মাতৃবৎ আচরণ করবে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। চারিত্রিক সততা, সংযম, দৃঢ়তা যদি অত্যন্ত হয় তবে ঈশ্বর আরাধনার প্রয়োজন হয় না। চরিত্রবান ব্যক্তিকে সমাজ সকলে সম্মিহ করে। তাকে কারও কাছে মাথা নিচু করে চলতে হয় না, সে অকপটে সত্য বা ন্যায় কথা বলতে ভয় পায় না। হিন্দুধর্ম গুণিয়েছে— গুরু কৃপাহি কেবলম্। জীবনকে পরিত্যক্ত করতে হলে একজন সদগুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। দীক্ষা লাভের পর তীর্থভ্রমণ বিধেয়। গয়া, কাশী, কদম্বাবনের পবিত্র মৃত্তিকার স্পর্শ সুখের সমান। পরমার্থিক সাধনার নির্বিকার লক্ষ্য ভববন্ধন থেকে মুক্তিলাভ। জগৎ দুঃখময়, এই দুঃখের কারাগারে যেন বারে বারে না আসতে হয় তার জন্যই মুক্তিলাভের স্পৃহা। ঠাকুর বিপরীত কথাই বলেছেন—

“দীক্ষা নাই করিবে না তীর্থ পর্যটন।
মুক্তি স্পৃহাশূণ্য নাই সাধন ভজন।।”

মতুরা ধর্মে দীক্ষা দান ও গ্রহণের প্রথা নিবিদ্ধ। তীর্থভ্রমণের কোন উপযোগিতা নেই, মুক্তিলাভের স্পৃহা অত্যন্ত স্বার্থপরতার লক্ষণ। মনুবাদীদের অধ্যাত্মবাদটিকে আছে ইহজগতের উর্দ্ধে পরজগতের সর্বশক্তিমান অধীশ্বরের অস্তিত্বের উপর। উপযুক্ত গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে সাধন ভজন করলে তাকে পাওয়া যায়। ঠাকুর বলেছেন, ঈশ্বর প্রাপ্তিতে মতুরাদের কোন আকাঙ্ক্ষা নেই, ব্যক্তিমুক্তি নয়, গণমুক্তিই কাম্য। মতুরা ধর্ম পারলৌকিক মোক্ষ লাভের ধর্ম নয়, ইহলৌকিক সাংসারিক জীবন সাধনার ধর্ম। এই ধর্ম মানব প্রেম বিশ্ব প্রেমের ধর্ম গুরুর কাছ থেকে কানে বীজমন্ত্র নিয়ে দেহত্যাগে বিশ্বাস করে না, স্বর্গভি এক অলীক কল্পনা মাত্র। মনুষ্যত্বলাভই জীবনের উদ্দেশ্য। একজন খাটি মতুরা আত্মকেত্রিক হতে পারে না। তাঁর কর্ম ও ভাবাদর্শ হবে— বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়। ঠাকুরের ভাবনার প্রতিফলন পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের ধূলামন্দির কবিতায়—

“মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে।
আপনি প্রভু সৃষ্টিবান্দন পরে বাঁধা সবার কাছে
রাখো রে ধ্যান, থাকরে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধূলাবালি—
কর্মযোগ্য তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক স্বরে।।”

হিন্দু ধর্ম বলছে— দীক্ষা নিয়ে মালা তিলক চন্দন গ্রহণ কর। তন্ত্র, মন্ত্র, ভেদক, ঝোলা অবলম্বন কর, তিথি নক্ষত্র অনুসারে খাদ্য নির্বাচন কর, বৈরাগী হয়ে ভিক্ষায়ে জীবিকা নির্বাহ কর, স্বপাক অন্ন ভোজন কর, সাধুতার নিদর্শন স্বরূপ অঙ্গের বেশভূষা পরিবর্তন কর, যাতে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ঠাকুর বলছেন—

“তন্ত্র, মন্ত্র, ভেদক, ঝোলা সব ধার্ম্যবাজি
পবিত্র চরিত্র রেখে হও কাজের কাজী।
মালা টেপা ফোটা কাটা জল ফেলা নাই
হাতে কাম মুখে নাম মন খোলা চাই।।”

ঋণাং তন্ত্র, মন্ত্র, যাগ, যজ্ঞ সবই মানুষকে ফাকি দেবার কৌশল, সবই অহেতুক। মন্ত্রে মানুষের গাণ দূর হয় না। মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। আত্মা যদি থেকেও থাকে তার সদগতি কখনও তন্ত্র, মন্ত্র যাগ, যজ্ঞ করতে পারে না। মতুরা মতে মানুষের জন্মের সচ্ছতা, কর্মের ও চরিত্রের সততাই মুখ্য শক্তি। হিন্দু শাস্ত্রীয় গ্রন্থ মানুষের সহজাত স্বভাবকে দুর্বল করে দিয়েছে, মতুরা ধর্মে কোনো দেব-দেবীর আরাধনাকে স্বীকার করা হয় না। ধর্মে দেবতাকে উদ্দেশ্য করে তন্ত্র, মন্ত্র, ভেদক দেখিয়ে পুরোহিত সমাজ মানুষের জন্মের গুণতাকে দুর্বল করে দেয়, তার প্রতিবাদী স্বভাবকে বিনষ্ট করে। মতুরা ধর্মে আছে— গভীর কর্মসধনা, ধর্ম ও কর্মের সমন্বয়, আছে জন্মের মর্যাদা। মনুসংহিতায় আছে—

“ব্রাহ্মণো জায়মানোহি পৃথিব্যাস্ অধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্মকোবল্য গুণ্যে।।”

ব্রাহ্মণ জন্মগত ভাবেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এবং ধর্মসমূহ রক্ষার জন্য সকল জীবের প্রভু বলে ধিবেচিত হন অর্থাৎ ব্রাহ্মণের জন্ম হয়েছে পৃথিবীকে শাসন করার জন্য। ব্রাহ্মণ, দেবতার প্রতিনিধি তারা আশীর্বাদ করতে পারে অভিশাপও দিতে পারে। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবকে দেবতার ধৃত ভক্তি করা বাধ্যনীয়, তাঁদের ভক্তিয়ুক্তভাবে সেবা করলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব, সমাজের শিরোমণি। ঠাকুর বিপরীত কথাই বলেছেন—

“কোথায় ব্রাহ্মণ দেখ কোথায় বৈষ্ণব।
স্বার্থবশে অর্থলোভী যত ভক্ত সব।।”

সমাজে যথার্থ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের সন্ধান পাওয়া যায় না, তারা প্রায় সবাই ভক্ত, অর্থলোভী, স্বার্থপর। শাস্ত্রে বলেছে ‘ব্রাহ্মজ্ঞানাতিথ্যঃ সং ব্রাহ্মণঃ’। ব্রাহ্মের স্বরূপ কী তা সঠিকভাবে ব্যাখ্যাতে যিনি কোথাও। অধ্যাত্মবাদীরই ব্রহ্মচর্চা করেন। এই অধ্যাত্মবাদ আর একপ্রকার ঘোঁরাশা।

বৈষ্ণবতন্ত্রের ব্যাখ্যায় একজন আদর্শ বৈষ্ণবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হবে তৃণাদপি সুনীচেন, মনসি কুসুমাদপি অর্থাৎ তাঁর চারিত্রিক স্বভাব হবে বিনীত ও নিরহঙ্কারী, তৃণ অপেক্ষা নিচু এবং কুসুম অপেক্ষা কোমল কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় বিপরীত। তারা বড়রিপু জয় করতে পারে

না। জ্যেষ্ঠ অগ্নিশর্মা হয়ে অশোভন বাক্য প্রয়োগ করে, ব্রাহ্মণকে যে দৃষ্টিতে দেখে, শূত্রকেও দৃষ্টিতে দেখেনা। তারা সমাজকে কলঙ্কিত করেছে। বৈষ্ণব ধর্মের যথার্থ মর্যাদা তারা রক্ষা করতে পারেনি।

এই প্রসঙ্গে বাবা সাহেব আশ্বেদকার বলেছেন—

“ব্রাহ্মণরা সেবদেবীর স্রষ্টা। সেবদেবীর মূর্তিকে সাক্ষীগোপাল হিসাবে দাঁড় করিয়ে কৌশলে চলছে ব্রাহ্মণশ্রেনীর অবাধ লুণ্ঠন। ব্রাহ্মণ্যবাদই নির্বাসিত শ্রেনীর দুঃখ, দুর্দশা ও সামাজিক নিপীড়নের মূল কারণ। ব্রাহ্মণ্যবাদ থেকে অস্পৃশ্যতার জন্ম। আজ প্রয়োজন সমস্ত নির্বাসিত ও বঞ্চিত শ্রেনীর মানুষের একত্রিত হয়ে ভারতের মাটি থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদের মূল উৎপাত করে ফেলা অন্যায়। তারা মানুষের অধিকার নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না।” মনুবাঈরা বলেছেন— যথার্থ ধর্মচর্চা যদি করতে হয়, ঈশ্বরলাভ যদি আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে সমাজ সংসারের কোলাহলে নয় নিভৃত নির্জনে এককভাবে সাধনা করতে হয়। পাহাড় পর্বত, গুহা অথবা জঙ্গলে নিরুপদ্রব শান্ত পরিবেশে পরমেশ্বরের স্বরূপে ধ্যানমগ্ন হওয়া হবে। তাই দেখা যায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন পাহাড় বা পর্বতের শীর্ষদেশে নানাবিধ বেদমন্দির বা উপাসনালয়ের অবস্থান।

ঠাকুর বলেছেন ভিন্ন কথা—

“গৃহেতে থাকিয়া যার হয় ভাবোদয়।
সেই ধর্ম গৃহকর্ম সাধু জানিবে নিশ্চয়।।
গৃহধর্ম গৃহকর্ম করিবে সকল।
হাতে কাম মুখে কাম ভক্তিই প্রবল।।”

অর্থাৎ পার্শ্বস্থ জীবনই উপযুক্ত সাধন ক্ষেত্র। গৃহত্যাগ নয় গৃহকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে হবে। মতুয়া সাধনে গৃহী যেমন যোগী হবে, যোগীও তেমনি গৃহী হবে। পার্শ্বস্থ জীবন পরিপূর্ণতার জীবন একে বাদ দিলে জীবন হয়ে যায় খণ্ডিত। জগৎ ও জীবনের পরম সত্য জানার জন্য তথাগত বুদ্ধ, মহাবীর, গৌরঙ্গ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ অভেদানন্দ, স্বামী স্বরূপানন্দ প্রমুখ ধর্মসাধকগণ সংসার ত্যাগ করেছিলেন। ঠাকুর হরিচাঁদ কোন ক্ষেত্রেই, বে পরিদ্বিতিতেই সংসার ত্যাগের নির্দেশ দেননি। তিনি নিজেও পরিপূর্ণ সংসার করেছে। তাঁকে যতই পূর্ণত্ব বলা হোক না কেন তিনি আদতে একজন সার্থক গৃহী মানুষ, গৃহে বসে করেই ধর্মিক জীবনযাপন করেছেন, মানুষের কল্যাণের কথা ভেবেছেন। গৃহকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য তিনি দাদশ আঞ্জা দিয়ে গেছেন। সংকর্ম এবং শ্রমের মর্যাদা দিয়েছেন তিনি। গৃহ থেকে সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনই ধর্ম। সংসারের সকল কর্তব্যের মাঝে যদি যথাসাধ্য অর্জন করা যায় তবেই আদর্শ মতুয়া হওয়া যায়। কর্মের মাঝেই ঈশ্বরের নাম স্মরণ

করতে হবে। চিন্তন এবং কর্ম সমানভাবে চলবে। কর্মবিহীন ভক্তি আদৌ গ্রহণীয় নয়।

হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

“অয়মেব বিধির প্রোক্তঃ শূত্রানা মন্ত্র বর্জিতঃ”

অর্থাৎ শূত্রদের বেদমন্ত্র উচ্চারণের অধিকার নেই। ব্রাহ্মণ শূত্রের পরিচয় বিবেচনা করতে মহাভারতে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মন্তব্য করেছেন বৈনিক নিয়ম, বিধি, আচরণ যারা পালন করেন তারা ব্রাহ্মণ আর যারা তা করেননা তারা শূত্র। বেদই হিন্দুদের আকরগ্রন্থ। তাকে নির্বিবাদে অনুসরণ করাই হিন্দুদের কর্তব্য।

ঠাকুর বলেছেন— বেদের ভয় দেখিয়ে মতুয়াদের জপ করা যাবেনা। মতুয়ারা বেদকে মানেনি না, অতএব এই শাস্ত্রের কঠোর অনুশাসন বা নির্দেশিকায় তারা ভয় যায় না। বেদপাঠ করতে তারা অনিচ্ছুক তাদের অধিকার-অনধিকারের প্রশ্নই ওঠে না।

“কুব্জুরের উচ্ছিন্ন প্রসাদ পেলে খাই।
বেদবিধি শৌচাচার নাহি মানি তাই।।”

অর্থাৎ মতুয়ারা বেদকে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে স্বীকার করে না। অতএব বেদের কোন অধিকার নেই এদের উপর খবরদারি করার।

মনুবাঈরা বলেছে— সেই যথার্থ ধর্মিক যে ধর্মের অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে। এমনকি একখানি অনুশাসন শাস্ত্র মনুসংহিতা। এই গ্রন্থে উল্লেখ আছে, জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় ভেদে কার স্থান কোথায়, কার কী দায়িত্ব, কার অধিকারের সীমারেখা কোন পর্বস্ত, নারী-পুরুষ কার কেমন আচার বিচার হবে। এই শাস্ত্র শ্রুত, তৃত, স্বামী, স্ত্রী, ব্রাহ্মণ, শূত্রের কর্মের পূরণকার, তিরস্কার ও শাস্তির নির্দেশিকাও আছে। শাস্ত্র গ্রন্থে পূজা, পার্বন, যাগ, যজ্ঞ, তন্ত্র, মন্ত্রের যে নির্দেশ আছে তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলাই বিধি সম্বন্ধ।

ঠাকুর হরিচাঁদ হিন্দুধর্মের সংস্কারাজ্ঞান অযৌক্তিক লোকচার ও শাস্ত্র অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বসেছেন। তিনি চেয়েছিলেন শ্রেনীহীন, শোষণহীন এক নতুন মানব সমাজ গঠন করতে। তিনি বলেছেন—

“জীবে দয়া নরমে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা।
ইহা ছাড়া আর যত সব ক্রিয়া দ্রষ্টা।।”

মতুয়াদের ক্ষেত্রে মানুষকে ভালবাসা, কর্মনিষ্ঠা ও সং জীবনযাপন ভিন্ন অন্যকোন অনুশাসন বা শাস্ত্রীয় বিধি পালনীয় নয়। ধর্মীয় ও সামাজিক বিপ্লবকে পরিনতির দিকে পৌঁছে দিয়েই ঠাকুর হরিচাঁদ মাত্র ছেবট্টি বৎসর বয়সে ইহজগৎ থেকে বিদায় নেন। তখনও তাঁর অনেক ভাবনা, চিন্তা, পরিকল্পনা ফলবতী হতে বাকি কিন্তু প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে তাঁকে বিলায় নিতে হল। বিদায় বেলায় শোকাকুল ভক্তবৃন্দকে তিনি সাঙ্ঘ্যনা দিয়েছিলেন এই বলে— তিনি তাঁর পুত্র, গুরুচাঁদের ভিতরই অবস্থান করবেন অর্থাৎ তাঁর অসমাপ্ত কর্ম-ভাষা গুরুচাঁদই বাস্তবায়িত করবেন।

পিতৃ দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই প্রথমে ঠাকুর গুরুচাঁদের স্বরণ হয়েছে:-

“মোর পিতা হরিচাঁদ গেছে বলে মোরে
বিদ্যা শিক্ষা স্বজাতিকে দিতে ঘরে ঘরে।।”

তাই তিনি সমগ্র দেশবাসীকে গ্রামে গ্রামে পাঠশালা নির্মাণ করার নির্দেশ দিলেন—

“সবাকারে বলি আমি যদি মানো মোরে।
অবিধানপূত্র যেন নাহি থাকে ঘরে।।
খাও বা না খাও তাতে
ছেলে পিলে শিক্ষা দেও, এই আমি চাই।।”

বিভিন্ন স্থানে সভা সমাবেশ করে ঠাকুর তাঁর অনুরাগী ভক্তবৃন্দকে বিদ্যালাতের মাহাত্ম্য কথ্যে লাগলেন। জাতির উন্নতির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন বিদ্যার্জন। বিদ্যা ছাড়া কথাই নাহি বিদ্যা কর সার।

“বিদ্যা ধর্ম, বিদ্যা কর্ম, অন্য সব ছার।”

তাঁর উপদেশ মান্য করে ভক্তবৃন্দ গ্রামে গ্রামে পাঠশালা নির্মাণে মনোনিবেশ করলেন, বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণে অক্ষম হলে বৈঠক খানা, প্রাঙ্গন বা গোশালাতেও বিদ্যার্থীরা সমবেত হয়ে মনোযোগের সঙ্গে বিদ্যার্জন করত। দূর গ্রাম থেকে গুরুমশাই আসতেন। বিভিন্ন বাড়ীতে আশ্রয় নিতেন, অতি সামান্য পারিশ্রমিকে সন্তুষ্ট হয়ে পাঠ দান করতেন। প্রাথমিকের পাঠ উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল, তারপর মহাবিদ্যালয় থেকে বিদেশ গমনে উদ্বুদ্ধ হলেন মেধা ছাত্রগন।

ঠাকুর তাঁদের আহ্বান জানিয়ে বললেন— এবার দেশের শাসন কার্যের সঙ্গে তোমাদের সম্পৃক্ত হতে হবে, তার জন্য রাজকার্য বা চাকরী গ্রহণ করতে হবে।

“দেশের শাসন যন্ত্র যে যে ভাবে চলে।
কিছু নাহি বোঝা যায় চাকুরি না পেলে।।”

কিন্তু সরকারি চাকরী প্রাপ্তি বড়ই কঠিন। সমাজের নিম্নবর্গের মানুষদের চাকরী হত না। ঠাকুর গুরুচাঁদ সি.এস.মিড সাহেবের সহায়তায় নিম্নবর্গের শিক্ষিত যুবকদের সরকারী চাকরীপ্রাপ্তির জন্য সংরক্ষনের সুযোগ অর্জন করলেন। এই সমাজের উচ্চশিক্ষিত যুবকবৃন্দ যোগ্যতানুসারে বিভিন্ন সরকারী সম্মানীয় পদে অধিষ্ঠিত হলেন।

তৎকালে সাধারণ পরিবারের আর্থিক অবস্থা এমনই ছিল সকলের পক্ষে উচ্চ শিক্ষালাভ সম্ভব ছিল না, তা ছাড়া সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রও ছিল সীমিত। তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় কী হবে ঠাকুর তাঁদের ব্যবসা-বানিজ্য মনোযোগী হতে বললেন—

“আর শুন বলি কথা লক্ষী লভিবারে।
বানিজ্যে বসতে লক্ষী মানিও অন্তরে।।”

কিন্তু ব্যবসায় সততা থাকা বাঞ্ছনীয়। অর্থলাভের জন্য যেন মানুষকে ঠকানো না হয়, শ্রম ও নিষ্ঠাকে অবলম্বন করে সংভাবে ব্যবসা করা যায়, সততাই ব্যবসার মূলধন হওয়া উচিত। ঠাকুর বললেন—

“বানিজ্য সাধুর কর্ম মহাজনে কয়।
মহাজন হলে তার মহামন হয়।।”

সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে ব্যবসা করা বড়ই কঠিন কেননা প্রাথমিক ভাবে কিছু আর্থের প্রয়োজন হয়। তার জন্য ঠাকুর নিজে অর্থ ধার দিলেন, যোগ্যতা ও বুদ্ধি অনুসারে বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন ব্যবসাতে নিয়োগ করলেন। চাকরী না হলেও ছোট বড় ব্যবসার মাধ্যমে ধন উপার্জনে সক্ষম হলেন স্বশিক্ষিত যুব শ্রেণী। তাঁদের সদিচ্ছা, প্রচেষ্টা ও স্বাবলম্বন দেখে ঠাকুর গুরুচাঁদ আনন্দে আপ্ত হতে বললেন—

“বিদ্যা চাই, ধন চাই বসন, ভূষণ চাই
হাতে চাই জজ মেজিস্ট্রেট।
সাগর ডিঙ্গাতে চাই দেখি সেথা কিবা পাই
কেন রব মাথা করে ছেট।।”

সমাজের একাধিক মানব, যাদের বিদ্যালয় ও ব্যবসা করার সামর্থ্য ও যোগ্যতা নেই, তাঁরাও তো সমাজে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে চান। তাঁদের জীবন জীবিকার জন্য ঠাকুর কী উপদেশ দেন, সেই কথা জানার জন্য তাঁরা ঠাকুরের সমীপে এসেছেন। ঠাকুর তাদের মানবতাকে উপলব্ধি করতে পেরে—পরম স্নেহের সুরে বললেন— তোরাই তো অন্নদাতা। তাদের শ্রমেই সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ অন্নগ্রহণের সুযোগ পায়। কৃষিকর্ম না থাকলে সমাজ বাঁচে না।

“সর্ব কার্য হতে শ্রেষ্ঠ কৃষিকার্য হয়।
এ কার্য না করা আমাদের ভাল নয়।।”

জমি, মাটি মাতৃসম। মাটি না থাকলে ফসল উৎপন্ন হ’ত না, মাটি না থাকলে মানব সভ্যতার অস্তিত্ব থাকত না। তাই তাকে বলা হয় ধরিত্রী। নিজের মায়ের মত তাকে শ্রদ্ধাভক্তি করা উচিত।

“মন দিয়ে কৃষি কর, পূজ মাটি মায়।
মনে রেখ বেঁচে আছে মাটির কৃপায়।।”

মৃত্যু সমাজের অনুগামী যারা, তাঁরা স্বভাবতই কৃষিনির্ভর। কৃষিকর্মই তাঁদের প্রাথমিক জীবিকা। তাঁদের পক্ষে এই কাজ সহজ ও স্বাভাবিক। ঠাকুরের উপদেশে তাঁদের জীবন-জীবিকার প্রতি কোন হীনমন্যতা রইল না উপরন্তু কৃষিকার্যের প্রতি অধিক আগ্রহশীল হলেন।

সাধারণ গৃহস্থ মানুষ যারা অনেক পরিবারের বিনিময়ে বেঁচে থাকেন, সামান্য অর্থসঞ্চয় করেন। ঠাকুর তাঁদের সর্বজন মিতব্যয়ী হবার উপদেশ দিয়েছেন। ধনবান বাবু সমাজকে অন্ধ অনুকরণ করতে মান্য করেছেন। বারো মাসে তেরো পার্বন বা বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে তাঁরা বেন অর্থের অপচয় না করেন, সদুপায় অর্জিত সঞ্চয় হওয়া আবশ্যক। তাই ঠাকুর বলেছেন—

“বিবাহ শ্রাদ্ধেতে সবে কর ব্যয় হ্রাস।
শক্তির চালনা, সবে রাখ বারমাস।।”

ঠাকুরের চিন্তা ও ভাবধর্ম অনুসরণ করে সুদীর্ঘ কালের একটি অমঙ্গল জাতি কিনা, চাকরী, ব্যবসা, কৃষিকার্যের মাধ্যমে ধনে মানে প্রতিপত্তি অর্জনে অগ্রসর হলেন। তাঁরা ভাবলেন সার্বিক উন্নতি হয়ে গেল। পরম প্রেমময় রাজর্ষি গুরুচাঁপ তাঁদের কাছে ডেকে বললেন— ধন সম্পদ আপেক্ষা আত্মপরীক্ষা অনেক বড় বস্তু। দাসত্বের মত মানি মানব জীবনে আর কিছু নেই। রাজকুমার, শাসন ক্ষমতা দবল করতে না পারলে তোমাদের দাসত্ব থেকে মুক্তি নেই।

“ধর্মের পালক রাজা জানিবে নিশ্চয়।
রাজশক্তি বিনা কিছু বড় নহি হয়।।”

যদি ধর্মকেও রক্ষা করতে হয় সে ক্ষেত্রেও রাজশক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে। সম্রাট আশোক যেমন বৌদ্ধধর্মকে রক্ষা করেছিলেন, পুনরুদ্ধারিত করেছিলেন। দেশের রাজা যে ধর্ম পালন করেন, প্রজাবৃন্দও স্বভাবতঃ সেই ধর্ম অনুসরণ করেন। ধর্মপ্রচারে রাজার যে ক্ষমতা সে ক্ষমতা আর কারও থাকতে পারে না এবং রাজা যদি ধর্মিক হন প্রজাবৃন্দও ধর্মপথে বিচরণ করেন।

“যে ধর্মে রাজা আছে সেই ধর্ম রাজা।
ধর্ম রাজ্যে বাস করে ধর্মশীল প্রজা।।”

জাতির উন্নতির জন্য ধর্মের রূপান্তর ঘটানোর প্রয়োজন হতে পারে, যুগে যুগে সব ধর্মেরই সংস্কার হয়েছে। ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থারও পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাকে সুসংগঠিত করতে হলে তখন রাজশক্তিকে হাতিয়ার করতে হয়—

“জাতি, ধর্ম, যাহা কিছু উঠাইতে চাও
রাজশক্তি তাকে যদি যাহা চাও পাও।।”

সমাজের অতি সাধারণ মানুষ, ঠাকুরের রাজনৈতিক তত্ত্বকথা উপলব্ধি করতে পারলেন না। ঠাকুর স্পষ্টভাবে তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার করে দিলেন— ক্ষমতা মন্দির দবল কর পরবর্তীকালে যার প্রতিফলিত শোনা গিয়েছিল বাবাসাহেব আম্বেদকরের মুখে। ঠাকুর বললেন—

“আইন সভার যাও আমি বলি রাজা হও
দূর কর এ জাতির বখা।।”

ঠাকুর গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন— বিদ্যাহীন, শিক্ষাহীন সাধারণ মৃত্যু ভক্তবৃন্দ নামে প্রোমে মাতোয়ারা হয়েই আনন্দ পায়, ঠাকুরের প্রতি আত্মনিবেদন করে সঙ্গীতে কীর্তনে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে তুষ্টি পায়, স্বার্থ মৃত্যু ভাবধর্ম তারা জানতে চায়না। ভক্তা, কঁশি, সিঙ্গার জ্ঞানধনিত তারা বিভোর হয়ে যায়, তাঁদের ভক্তি ও বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটে গড়াগড়ি, মাতামাতি ও উচ্চনিদ্রাসে। ঠাকুর তাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন—

“কান্দাকাদি ঢালাঢালি কতকাল করে গেলি
কী ফল বা পেলি তাতে বল।
কর্ম ছেড়ে কান্দে যেই তার ভাগ্যে মুক্তি নেই
হবি নাকি বৈরাগীর দল।।”

অর্থাৎ কর্মবিহীন ভক্তির প্রয়োজন নেই। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় চাই। কর্মই গার্হস্থ্য জীবনের মেরুদণ্ড। কর্মশূণ্য বৈরাগ্য মতুয়া ধর্মের লক্ষ্য নয়। একজন আদর্শ মতুয়ার কর্তব্যই হল হাতে কাম, মুখে নাম ও মানুষকে ভালবাসা।

মতুয়া দর্শন, সমাজ, রূপান্তরের ধর্ম, সমাজ পরিবর্তনের ধর্ম। তার জন্য মানুষটিকে সচেতন করতে হবে জাগরণের বাণী শুনিয়ে আন্দোলন মুখী করে তুলতে হবে। এই সব কথা কীর্তনের আসরে চলে না, বিভিন্ন অঞ্চলে সভা, সমাবেশ করে মানুষকে সংঘবদ্ধ, ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। আন্দোলন ব্যতীত সমাজ সংস্কার বা পূর্নজাগরণ ঘটে না।

“ঘরে ঘরে আন্দোলন প্রয়োজন হল।
সভা কর, সভা কর প্রভুজী হাঁকিল।।”

ঠাকুর গুরুচাঁদ ঋষিত্ব লাভ করেও রাজনীতিকে গ্রহণ করে ছিলেন অন্তর থেকে, সুদীর্ঘ কালের অবহেলিত, বঞ্চিত, উৎপীড়িত, নিরক্ষর, দরিদ্র জাতীকে রাজা হবার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন তাই তিনি রাজর্ষি গুরুচাঁদ।

ঠাকুর গুরুচাঁদ বলেছেন— জাতিকে জননীর মত শ্রদ্ধা করতে হবে। জাতির উন্নয়নই সর্বকনের ধ্যানজ্ঞান হওয়া উচিত। যে কোনো উন্নয়নকে বাস্তবায়িত করতে হলে আগে ত্যাগ স্বীকার করা প্রয়োজন। শ্রম, বুদ্ধি, অর্থ, সময় যার যতটুকু সাধ্য ত্যাগ করতে হবে স্বার্থত্যাগ করতে না পারলে অপরের কল্যাণ করা যায় না।

“জাতির উন্নতি লাগি হও সবে স্বার্থত্যাগী
দিবারাত্রি চিন্তা কর তাই
জাতিধর্ম জাতি মান জাতি মোর ভগবান
জাতি ছাড়া অন্য চিন্তা নাই।।”

মতুয়া ভাবাদর্শকে মাধ্যম করে ঠাকুর হরিচাঁদ গুরুচাঁদ সমাজ সংস্কার করতে চেয়েছিলেন, সমাজের দলিত পতিত মানুষকে ব্রাহ্মণ্যবাদী শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্য স্বতন্ত্র মতুয়া ধর্মপ্রচার করেন। এই ধর্ম মানব কল্যাণে তথা বিশ্ব কল্যাণের ধর্ম।

গ্রামবাংলার জাগরণে মতুয়া আন্দোলন

সমুদ্র বিশ্বাস

হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্ম ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে গুরুচাঁদ ঠাকুরের মৃত্যু ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ১২৫ বছরের মতুয়া আন্দোলন বৃহৎ বাংলার সবচেয়ে শক্তিশালী গণসংগ্রাম। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের প্রকৃত অগ্রদূত হরিচাঁদ ঠাকুর। আর মতুয়ারা নবজাগরণের সংগ্রামী বার্তা বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার দায়ভার নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হল বস্তাবাদী মানবিক মতুয়াদের এই আন্দোলন ইতিহাসের পাঠ্য স্থান পেল না কেন? মতুয়া আন্দোলনের এই ‘চেপে রাখা ইতিহাস’ যত প্রকাশ্যে আসছে ততই পাঠক-শ্রোতা সত্য-মিথ্যার দোলাচলে ভুগতে থাকেন। তথ্য সূত্র ঝুঁজতে থাকেন। কিন্তু কোথায় পাবেন তথ্যসূত্র? শাসক-শোষক শ্রেনীর অশ্রিত লেখক পণ্ডিতেরা তাঁর প্রভুর বিদ্রোহী শক্তি অর্থাৎ চেপে রাখা প্রতিবাদী কৃষি সমাজ, মুটে-মজুরদের আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদার সংগ্রাম কি লিখবেন? না, লিখবেন না। লেখেনও নি। যা লিখেছেন তার বেশিরভাগটা বিকৃত। প্রাচীন ভারতের ঋষিরা ইতিহাসের উপাদান নিয়ে বেদ, রামায়ণ, মহাভারত রচনা করেছেন। বহু পুরাণ (Mythology) রচনা করেছেন। ইতিহাস রচনা করেননি। ফলে, আমামান যাযাবর (নর্ডিক) অর্থদস্যু ও তাদের উত্তরসূরী ব্রাহ্মণ্যবাদী চোখে উৎপাদনশীল শ্রমজীবী মানুষ দাস-দস্যু, রাক্ষস-খোঙ্কস, দত্তা-নানো নামে পরিচিতি পেয়েছে। মুসলমান রাজত্বে ইতিহাসের হাতেখড়ি হলেও তা বড় একপেশে। ইংরেজ শাসনে ইতিহাস চর্চার খেল মলচে গেল বললে। ইতিহাস যা দাড়ালো তা হলো ব্রিটিশ শাসনের জয়গান। জনগনের ইতিহাস কোথায়? নেই। কোথাও নেই। যেটুকু ছিটে-ফেটা আছে তা অনেকটা হকার্স ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের মতো। যে কোন দিন হকার ছিলেন না। আগামী একশো বছরে তার বংশের কারো প্রয়োজন হবে না হকারি করার। তিনি একটি শ্রমবিমুখ জাতিতে জন্মেছেন। শাসকের দালালি ও দাসত্ব ভালো বোঝেন। বোঝেন ভালো ভালো মানবতাবাদী বুলি ঝাড়তে। সঙ্গে আছে ছল-চাতুরি শিক্ষার সার্টিফিকেট। সেরা সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা সেরা নম্বর লেখা আছে তাতে। কাজে কাজেই তিনি পণ্ডিত। আর পণ্ডিত সর্বত্র পূজ্যত্বে। বাস্! তিনি মহাপুরুষ। ভালো ভালো মানবতাবাদের বুলি বা বাণী দেবেন। স্বর্গ-নরক বোঝাবেন। শিল্প করবেন, সাহিত্য করবেন। কৃষকের, জেলে, শ্রমিকদের কি করলে ভালো হবে তার পথ বাতলাবেন। আর সেই পথে সকলকে চলতেও হবে। প্রয়োজনে শাসনের যীতাকলে শোষণ ও গ্রহসন করবেন। ফল কি? তাঁতির মেয়ের গায়ের শাড়ী থাকবে ছেঁড়া, জেলে পাতে থাকবে না মাছ, কৃষকের ভাতে থাকবে কাঁকড়া। আর পণ্ডিত শিক্ষিত বাবুর ছেলেমেয়েরা বাবে টিফিন সবজী, গোবিন্দভোগ চাল, কাঁটালি কলা, ইলিশ-রুই-কাতলা, গলদা-বাগদা, কাঁকড়া-কজুপ। একজন কৃষক বা শ্রমিকের সম্মানকে জলে পাঠালে মাছ ধরে দেখাবে। জমিতে পাঠালে ফসল ফলিয়ে দেখাবে। বিদ্যা

শিক্ষার জন্য ন্যূনতম পরিবেশ দিলে স্কুলের সেরা ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকায় স্থান করে দেখাবে। আর বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর 'বাবু'দের সন্তানদের প্রশ্ন চুরি করে দিলে কিংবা প্রতিটি Subject এ দু-তিনটে করে টিচার দিলে ক্লাসের First Boy হলেও হতে পারে। কিন্তু বাকি দুটোতে ঠুটো জগন্নাথ মানে অকর্মের টেকি। অথচ এই বাবুর ছেলেই বাবু হয়ে বুদ্ধিজীবী তক্কা নিয়ে প্রাণহীন শিল্প করবেন। পুরস্কার পাবেন, বাহবা কুড়োবেন। আর তার রচনা বা কাহিনী গদগদ হয়ে মুখস্থ করবে কৃষিজীবী শ্রমজীবী মানুষের সন্তান। ঐকটিক তাঁদের স্বার্থসিদ্ধির পঠন-পাঠন করতে না পারলে 'সংরক্ষণ' নামক গালি খাবেন। S.C. অর্থাৎ সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মেছেন। এদের দাসত্ব করবার আলাদা জায়গা ছেড়ে দাও। আর নাক সিটকিয়ে বলো— ব্যাটা SC, ST। এভাবে এগিয়ে চলবে বর্ণবাদী শিক্ষা ও ইতিহাস চর্চা। আর এই কারণেই গরীব দুখি জনসাধারণের ইতিহাসের উপাদান পত্তিতি চর্চায় খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রকৃতপক্ষে কৃষক জনসাধারণের নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের ইতিহাসকে আড়াল ও বিকৃত করে ভারতবর্ষের নামে, কেবল নগর্যসংখ্যক শোষক গোষ্ঠীর ইতিহাস ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রচনা করা হয়েছে। আর এই মেদবুদ্ধ উপকাহিনীমূলক ইতিহাসকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলে চালানো হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী শাসক ও স্থানীয় শোষকদের অনুসরণকারী দেশীয় ঐতিহাসিকদের লেখা বিকৃত ইতিহাসে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের প্রকৃত পরিচয় ঢাকা পড়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ইতিহাসি' প্রবন্ধে লিখেছেন, "দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মাহুদ-এর আক্রমণ ইহাতে লর্ড কার্জনকে সাধারণ্যে গর্বোন্মত্ত করল পর্যন্ত বাহ্যে কিছু ইতিহাস কথা তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে বিচিত্র কুহেলিকা, তাহা স্বদেশ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টির সহায়তা করে না, দৃষ্টি আবৃত করে মাত্র। তাহা এমন স্থানে কৃত্রিম আলোক ফেলে বাহ্যে আমাদের দেশের নিকটই আমাদের চোখে অন্ধকার ইহায়া যায়।"

ঐতিহাসিকদের মনে রাখা উচিত, যারা সুদূর অতীতকাল থেকে বংশপরম্পরায় জমি ভোগদখল করে আসছেন; কসল ফুলিয়ে সন্তানাদি ভরণ-পোষণ করছেন; সমাজ ও সভ্যতার ধারক-বাহকের কাজ করছেন; ইঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই বিনা অপরাধে ও বিনা কারণে কিছু ধড়িবাঁজ মানুষ রাষ্ট্রের ভয় দেখিয়ে, কিসব আইন প্রণয়ন করে তাদের জমির ভোগ দখল কেড়ে নিল। কৃষক শ্রমিক হয়ে পড়ল দাস বা প্রজা বা ভাগিদারী চাষ। কিংবা সকল সম্পত্তির উপর এমন বেশি পরিমাণে রাজস্ব চাপানো হল যা দেওয়ার ক্ষমতা ওই কৃষক-শ্রমিকের নেই। আর সরকার জমিদার মহাজনের কাছে আবেদন নিবেদন করেও কোন ফল হয় না। তখন ওই কৃষক-শ্রমিক তাঁর জমি-সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার জন্য হাতে অস্ত্র তুলে নেবেন, সশস্ত্র সংগ্রাম করবেন; এটাই স্বাভাবিক। সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের গবেষণা হাতে এসেছে। তাঁরা সংগ্রামী কৃষকদের দাস্যকারী জনতা, উচ্ছৃঙ্খল জনতা, বংশ পরম্পরায় দাসপ্রবণ,

ইতরজন, ডাকাত, লুণ্ঠনকারী, খনি প্রভৃতি নামে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ আবার সাধ করে তাঁর গ্রন্থের নাম লিখেছেন, 'Civil Disturbances'। বা এ জাতীয় অসম্মানকর কথা। ফলে, মতুরাদের গর্বের ইতিহাস পাওয়া দুস্কর। অপমান ও অসম্মানসূচক বাক্য পড়তে পড়তে একসময়ে এই সকল কৃষি সমাজ ভাবতে ভুলে যায় যে তারা না থাকলে সভ্যতা অচল হয়ে পড়ে। রাজা মহারাজা, মন্ত্রী-এম.এল.এ., এম.পি. ও ধনী ব্যবসায়ীদের কেরামতি সাজে না। ধনিক শ্রেণির পেটে অন্ন জোটে না। মতুরা আন্দোলনের স্বরূপ সন্ধান করতে গেলে তাদের সমাজ ও সংস্কৃতির উপর চোখ রাখতে হবে। যতই চেপে রাখার বা ঢেকে রাখার চেষ্টা হোক না কেন মতুরারা অর্থাৎ নমজাতি তাদের অস্তিত্বের স্বীকার করিতে বাধ্য করেছেন। স্বক্বেদে, পুরাণে, বৈদেশিক পর্যটক, বৌদ্ধধর্ম কথা, মুসলিম ও ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার নথিপত্রে তার যথেষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক বঙ্গদেশ দখল করার পর বস্ত্র, রেশম ও লবণ শিল্প ব্রিটিশ বণিকদের হাতে চলে যায়। সুদূর অতীতকালে নমরা এবং এ সময়ে নমজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া মানুষেরা বস্ত্র ও রেশম শিল্পের মূল কারিগর। অবশ্য লবণশিল্প তখনও স্বনামে নমরাই ধরে রেখেছিল। অতি প্রাচীন কাল থেকে নমরা সমুদ্রের জল রৌদ্রে শুকিয়ে লবণ তৈরী করতো। বঙ্গদেশে লবণ তৈরীর প্রধান কেন্দ্র ছিল মেদিনীপুর, খুলনা, বাবুরগঞ্জ, নোরাখালি, মোংলা, চট্টগ্রাম অঞ্চল সমূহ। লবণ তৈরীর বেশিরভাগ অঞ্চলগুলি 'নমপাড়া' নামে পরিচিত ছিল। ততদিনে নমদের চন্ডাল বা চাড়া বল গালি দেওয়ার ফলে নমপাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাড়া বল পাড়াও বলা হতো। ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রাধান্য পালয়ুগের বৌদ্ধধর্ম নমদের চন্ডাল বা চাড়া বল আখ্যায়িত করে। কারণ, পালরাজাদের ভিত্তি গড়ে নমরা গোপাল কেসিংহাসনে বসিয়ে। Calcutta Review, N.K. Sinha-র Midnapur Salt Papers, J.C. Sinha-র Economic Annals of Bengal, Henry Beveridge-এর History of Bakarganj প্রভৃতি গ্রন্থে এর যথেষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

সুদূর অতীতকালে নমরা দুটি ভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের সংকর ঘটিয়ে পাট গাছের জন্ম দেন। এক সময় পাটজাত ব্রহ্ম দেশ-বিসে দেশে রপ্তানী হতো। এই পাট আবিষ্কার নমদের। আয়ুর্বেদ চর্চা প্রায় কম বেশি সকল সমাজ ব্যবস্থায় চালু ছিল। সব চাইতে বেশি গাছ গাছড়া থেকে গুণ্ডু তৈরী করতেন ভারত সভ্যতার গ্রাম্য সমাজ। নমজাতি তার মধ্যে অন্যতম। নমদের নিজস্ব উন্নত চিকিৎসা বিদ্যা ছিল। তার নাম চাঁদসী চিকিৎসা। বর্তমান সরকারী অবাংলোয় এই চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ পেয়েছে। সমাজ সচেতন করার জন্য যেমন সাম্যবাদী দর্শন ছিল তেমনই সেই দর্শনকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য 'গ্রাম সভা' ছিল। গ্রামসভা বা হাট কমিটির পরিচালনায় কবিগান ছিল। ছিল ভাটিয়ালী। সারি-জারি প্রভৃতি। বিজয় উৎসব ছিল নৌকাবাইচ। জলদসু বা স্থলদস্যুদের হাত থেকে বাঁচার জন্য সবাইকে সজাগ ও সংকেতদেওয়ার

মাধ্যমে ছিল জয়ভাঙ্গা। জয়ভাঙ্গা বাজানো মানে শত্রু আক্রমণ করতে আসছে সকলে তৈরী হও। বিজয়ী হতে হবে। নমস্কের কটি, ঘাস, খড়, আর হোগলা পাতা দিয়ে ঘর বানানো এক কথায় অসাধারণ। নমস্কের নৌকা বানানোর জুড়ি মেলা ভার। নমস্কের ধান চাষ, দশ-পনেরো হাত জলের নিচে ধান লাগানো, ৪২২ রকম ধান আবিষ্কার পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। প্রকৃতপক্ষে, নমজাতি উৎপাদক শ্রেণীর। ফলে, তাঁদের সমাজ সংসারে যা যা প্রয়োজন তা তারা নিজেরাই সংগ্রহ করে নিতে পারে। কারো ওপর নির্ভর করতে হয় না। তার ওপর সমবটনে বিশ্বাসী। আর এই কারণে রাষ্ট্র ও বাজার, শাসন ও শোষণের দরকার হয়নি। আর তাই অনায়াসে গোপালকে ধরে এনে সিংহাসনে বসিয়ে দিতে পারেন। B.M. Funt-এর 'Pual Revolution in East India' এবং শোভন সুন্দর বাগচীর 'পাল যুগের সমাজ' বই দুটিতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। মূলতঃ রাষ্ট্র ব্যবস্থার বাইরে থাকার ফলে সভ্যতা গড়ার কারিগর নমজাতি নানান সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ক্রমে ক্রমে একটা বড় অংশের নমস্কের কুসংস্কার ও ধর্মীয় মৌলবাদ গ্রাস করে। অজ্ঞানের অন্ধকারে পড়ে থাকা প্রান্ত মানুষজনকে আলোর পথ দেখান নম মতাদর্শের ধারক বাহক স্বয়ং হরিচাঁদ ঠাকুর।

বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার সফলা ডাঙ্গা গ্রামে ১৮১২ সালের ১১ মার্চ হরিচাঁদ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। হরিচাঁদের প্রকৃত নাম হরিদাস বিশ্বাস। সাম্যবাদী দর্শনের চোখে গরীব দুখি কৃষক মানুষজনের মনের অন্ধকার দূর করতেন বলে আপনজনেরা তাঁকে ঠাকুর বলে সম্বোধন করতেন। চাঁদের মিষ্টি জোৎস্না পৃথিবীকে সুন্দর মোহময় করে তোলে তেমনি হরিদাসের মানবপ্রীতিতে বাংলার কৃষিজীবীদের জীবন আলোকময় হয়ে ওঠে। ফলে, সাধারণ মানুষ ভালোবেসে হরিদাসকে হরিচাঁদ বলে ডাকতেন। চাঁদ কখনো চাঁদ কখনো গ্রাম্য উচ্চারণ। যশোবন্ত বিশ্বাস ও অন্নপূর্ণা বিশ্বাস, সেই কৃষক সম্প্রদায়ের পাঁচ সন্তানের মধ্যে হরিচাঁদ দ্বিতীয় ছিলেন। অন্য চার সন্তানের নাম কৃষ্ণদাস, বৈষ্ণবদাস, স্বরূপদাস ও গৌরীদাস। যশোবন্ত বিশ্বাস বৈষ্ণবধর্মে গভীর অনুরাগী ছিলেন বলে সকলে তাকে যশোবন্ত বৈরাগী বলে সম্বোধন করতেন।

বৃহৎবঙ্গের জঙ্গল অর্থাৎ বাদাবন কেটে জনবসতি গড়ে তুলেছিলেন নমজাতির মানুষেরা। সেই সুদূর অতীতকাল থেকে কৃষি ও কুটির শিল্পের দক্ষতার ভিত্তিতে গড়ে তুলেছিলেন পাড়ুরাজ্যের রাজধানীর মতো নগর-বন্দর। পৃথিবীর বিভিন্নদেশে তাঁদের সম্পদ সৃষ্টি ও বিপণনের সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এরপর নানান ঘাত-প্রতিঘাত আর উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে কয়েক হাজার বছর। নমরা স্বনামে তাঁদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাদের জীবন সংগ্রামের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বাস্তববাদী দর্শনের ওপর ভিত্তি করে উনিশ শতকে মতুরা আন্দোলন গড়ে ওঠে। দীর্ঘকাল ধরে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পেষনে

বাংলার শ্রমজীবী সমাজের মধ্যে ধর্মীয় কুসংস্কার অনুপ্রবেশ করতে থাকে। জাতপাত, ঘৃণা-বিদ্বেষ আর বিভ্রান্তি মূলক অপধর্ম গোটা বাঙালি জাতিকে গ্রাস করে ফেলে। বিভাগে রাস্তাকাটা, একশালিক বা দুইশালিক সেবা গ্রামা বা স্বল্প শিক্ষিত মানুষদের কুসংস্কার হলেও গণেশের মূর্তিকে দুধ খাওয়ানো, পাড়ায় পাড়ায় বা স্টেশন চত্বরে শনি পূজো দেওয়া প্রভৃতি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কুসংস্কার ভুরিভুরি দেখা যায়। এইসব অপশিক্ষা আর টোল পণ্ডিতদের জাতি বিদ্বেষ, পুরোহিত শ্রেণীর নীতিকথা, তুচ্ছতাক, পূজো-পার্বণের খরচের পড়ে বঙ্গের প্রতিবাদী গরীব কৃষক সমাজ ন্যূন হয়ে পড়ে। হরিচাঁদ ঠাকুরের মতুরা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নুইয়ে পড়া গ্রামীণ কৃষক-কারিগররা মাথা উঁচু করে বাঁচতে শেখেন। বাংলার সম্পদ সংগ্রহকারী, সম্পদ উৎপাদনকারী ও সংগৃহীত সম্পদের সমবটনে বিশ্বাসী নমস্কের জাতসুলভ বাস্তব সম্মত একটি চলমান দর্শন, আদর্শ বা মতাদর্শ ছিল। ত্রয়োদশ-চতুর্দশশতাব্দীর লেখা 'শূণ্যপুরাণ'-এ রামাই পণ্ডিত লিখেছেন— 'গাইল পণ্ডিত রাম নম সপ্তসার'। যা নমস্কের 'সপ্তনীতি' নামে পরিচিত। সে সময়ে নমরা যে আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠায় মর্যাদার আসনে ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 'শূণ্যপুরাণ' বলছে—

নমসব পড়াল পণ্ডিত চারিজন।

পণ্ডিতে দক্ষিণা দিল রজত কাঞ্চন।।

নমজাতির এই প্রবহমান 'সপ্তনীতি'কে পাথের করে হরিচাঁদ ঠাকুর একটি গণআন্দোলনের রূপ দেন যা 'মতুরামত' নামে পরিচিত। আদর্শগত ও উদ্দেশ্যগতভাবে 'মতুরামত', মতুরা মতাদর্শ বা মতুরা আন্দোলন সমার্থক। 'মতুরাধর্ম' শব্দটি একটি প্রতিষ্ঠানিক ধর্মের (Religion) রূপ নিয়েছে। এ ধরনের পরিবর্তন স্বাভাবিক নয়। অন্ধ-গোঁড়া মানসিকতার প্রভাব পড়তে পারে। ব্রাহ্মণপ্রভাবমুক্ত থাকাই নমস্কের জীবন দর্শনের মধ্যে অন্যতম। বঙ্গদেশের অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে এর কোন মিল নেই। কারণ, এরা জন্মান্তর, পাপ-পুণ্য, ভগবান-শয়তান কিছুই মানে না; বিশ্বাসও করে না। হরিলীলামৃত বলেছে— "পুণ্যকে যে দেয় না স্থান, পাপ কেন ছার। তারা মানবতাবাদে বিশ্বাসী। বিপদগ্রস্ত অসহায় মানুষদের শক্তি-সাহস ও ভালোবাসা দিয়ে পাশে থাকে তাদের জীবন শিক্ষা ও কর্তব্য বলে মনে করে। সেইজন্য এ জাতিকে পাপ-পুণ্য বোধ কাজ করে না। ব্রাহ্মণধর্মসহ অন্যান্য রাজশক্তির আশ্রিত ধর্ম এই সমাজে পাপ পুণ্যবোধ ঢুকিয়েছে। বুদ্ধিমান নয়, চালাক-চতুর ও ভক্ত ধড়িবাঁজ বানানোর প্রাণপণ প্রচেষ্টা করেছে। তা না হলে, এ সমাজ এত পূজোপাঠ প্রিয় হয়ে পড়ত না। এতটা ব্যক্তিস্বার্থপর হয়ে উঠত না। বিশেষ করে যারা ব্যক্তি বা তার পরিবারের বিশেষ মানুষজনের কল্যাণ কামনায় মিথ্যা, জালিয়াতি, ঘুসের আশ্রয় নেয়। জুয়াখেলা, মদখাওয়া, নারীকে অসম্মান করা এ জাতির জীবনে ছিল না। পৃথিবীর সেরা জুয়াড়ি মহাতারতের যুধিষ্ঠির। যে কিনা নিজের সহোদর ভাইদের পাশাপাশি স্ত্রী দ্রৌপদীকে পর্যন্ত বাজি ধরে। নারীর এতবড় অসম্মান পৃথিবীর

ইতিহাসে বিরল। রামায়ণের রামচন্দ্রের সীতা পরিত্যাগ মানব জাতির কলঙ্কজনক ঘটনা আর এসব বাঙালি সমাজে প্রবেশ করেছে। এসবই আর্থ সংস্কৃতি বা ব্রাহ্মণ্যধর্মের কসল বঙ্গদেশের গারো বিদ্রোহ বা পাগলপন্থী বিদ্রোহ, ওয়াহাবী বিদ্রোহ, ফরাজী বিদ্রোহ নমজাতি অংশগ্রহণ থাকলেও তা ধর্মের কারণে নয়, তা জমিদার-তালুকদার-মহাজন গোষ্ঠীর অত্যাচারে বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য।

অনেকে প্রশ্ন করেন হরিচাঁদ ঠাকুর মৈথিলি ব্রাহ্মণ ছিলেন কিনা? না। হরিচাঁদ ঠাকুরের পূর্বপুরুষেরা ধড়িবাড় ব্রাহ্মণ্যবংশের ছিলেন, তেমন কোন তথ্যসূত্র পাওয়া যায়নি। শ্রীশ্রীহরিলীলামতের আদি সংস্করণে এ ধরনের কোন উল্লেখ নেই। রাঢ় দেশ থেকে দূরত্বে দূরত্বে লক্ষীপাশা হয়ে সফলাভাঙ্গা-ওড়াকান্দিতে তাঁদের বসবাস। নিজেন্দরের ব্রাহ্মণ বংশজাত এইরোগ এক সময় গোটা পিছিয়ে পড়া এবং পিছিয়ে রাখা সমাজের মনে বাসা বেঁধে ছিল। মুসলিম শাসনে বাঙালি ব্রাহ্মণ সমাজ সম্মানের সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারতো। রাজকার্যে মন্ত্রণালতা হিসাবে চাকরি করতেন। শূদ্র কায়স্থরা ব্যবসায় প্রভূত উন্নতি করে। সমাজে সম্মান পেতে শুরু করে। ব্রিটিশ রাজত্বে — শূদ্ররা 'কায়স্থ' নামে পুরোপুরি ব্রাহ্মণদের দলভুক্ত হয়। তবে ব্রাহ্মণ-বন্দির পরে তাদের সামাজিক মর্যাদা। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বঙ্গের প্রায় সকল জল-চল, জল-অচল সম্প্রদায় অবশ্যই ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও মত অনুযায়ী অস্পৃশ্য, অতি অস্পৃশ্য সকলেই ব্রাহ্মণ-বন্দি-অক্রিয় মর্যাদা পাওয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি করেন। নমরা এর ব্যতিক্রম নয়। ইতিমধ্যে তাদের ওপর আরোপিত চন্ডাল বা চাড়াগালি মোচন সংগ্রাম শুরু হয়েছে। একদিকে ব্রাহ্মণ্য জাতিবাদী অত্যাচার-অসম্মান অন্যদিকে মুসলিম মানুষজনের সঙ্গে ক্রমাগত দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়া নমসমাজকে জঞ্জরিত করে তোলে। তাঁদের এক অংশের মানুষ ব্রাহ্মণ্য দাবি করেন। একটি বড় অংশ তার বিরোধিতা করেন। এই সূযোগটা ব্রাহ্মণ্যবাদী মানুষও কাজে লাগান। নমজাতির বিজ্ঞানেরা ছিন্ন করেন যে, স্বকীয়তা কিছুটা হলেও বজায় থাকে যদি ব্রাহ্মণ্যসমাজের সঙ্গে থাকা যায়। এই সমাজের নারীরা স্বাধীন কিন্তু মুসলিম সমাজে নারী বোরখার অন্তরালে চলে যায়। আর ব্রাহ্মণ্যধর্ম ততদিনে সর্বভারতীয় হিন্দুধর্ম এই শব্দ গ্রহণ করেছে। আর যেহেতু 'সিদ্ধু-হিন্দু' অঞ্চলের নাম অনুসারে হিন্দুস্থান সেহেতু বঙ্গের নমরাও তাদের হিন্দু বলে মেনে নেয়। কেননা, নামের সঙ্গে 'শূদ্র' শব্দটি যোগ করে দেওয়া হয়। সমাজ পণ্ডিতদের হাতে অন্যকোন পথও ছিল না। তবে নমজাতির সঙ্গে শূদ্র যোগে 'নমশূদ্র' রূপে মেনে নেওয়ার বিরুদ্ধে অনেক সভাসমিতি হয়। Parliamentary Report, The Englishman 1881, 1894, Statement by Joti Bhushan Mitra 1903, Statement by Alakenda Mulkhopadhyaya 1909 প্রভৃতিতে এর কিছু কিছু তথ্য উল্লেখ রয়েছে। ১৯১১ সালের পর থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত বর্তমান, বাঁকুড়া, নদীয়া, বীরভূম বরিশাল, খুলনা প্রভৃতি জেলার নমরা 'নম' হিসাবে পরিচিতি ফিরিয়ে আনার জন্য

বিভিন্ন জায়গায় সভা সমিতি করেছেন। সেই সব সভা সমিতিতে অংশগ্রহণ করেছেন এমন মানুষ কিছুদিন আগেও জীবিত ছিলেন। এখনও কেউ কেউ জীবিত আছেন।

ইংরেজ বণিকেরা এদেশে একদল কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। যারা গোমস্তা, বেনিয়ান, জমিদার প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিলেন। কোম্পানীর ওই সকল কর্মচারীরা যে ভরকের নির্বাহিতা শুরু করেন তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আর এই কারণে বাংলার গ্রাম সমাজের ভিত্তি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এই চরম ভাঙনের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য মতুরা আন্দোলনের দুটি ধারা প্রবর্তন করেন। একটি ধারা হল সন্ন্যাস বা বৈকালিক মহোৎসব। যার ধারক-বাহক গোলোক পাগল, হীরামন পাগল, দশরথ বিশ্বাস, লোচন গোসাই, বিচরন পাগল, মহানন্দ পাগল প্রমুখ পাগল, গোসাই যারা মানুষের সার্বিক উন্নতির জন্য দ্বাদশনীতি পালনের নির্দেশ দেন—

করিবে গার্হস্থ্য ধর্ম লয়ে নিজ নারী।
গৃহে থেকে ন্যাসী বানপ্রস্থ ব্রহ্মচারী।।
গৃহধর্ম রক্ষা করে বাক্য সত্য কর।
বানপ্রস্থী পরমহংস তার তুল্য নয়।।
পরনারী মাতৃতুল্য মিথ্যা নাহি কবে।
পরদৃষ্টিতে দুঃখী সদা সজরিত রবে।।
দীক্ষা নাই করিবে না তীর্থ পর্যটন।
মুক্তি স্পৃহা শুণ্য নাই সাধন-ভজন।।
গৃহ ধর্ম গৃহ কর্ম করিবে সকল।
হাতে কাম মুখে নাম শক্তিই প্রবল।।
জীবে দয়া নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা।
ইহা ছাড়া আর বত সব ক্রিয়া ভ্রষ্টা।।

দ্বিতীয় ধারার অন্যতম শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব পণ্ডিত রঘুনাথ সরকার। গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম সহযোগী। শিক্ষা-ব্যবসা ও চাকরির সুবাদে নম সমাজে সচ্ছলতা আসে। শিক্ষিত সমাজ গণ আন্দোলনের জন্য নিজস্ব মুখপাত্র প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। বাংলার কৃষক সমাজের মুখপত্র প্রকাশে অগ্রণী ভূমিকা নেন স্বয়ং গুরুচাঁদ ঠাকুর। ১৯০৬ সালে আদিত্য চৌধুরীর সম্পাদনায় ওড়াকান্দি থেকে মাসিক পত্রিকা 'নমঃশূদ্র স্কুল' প্রকাশিত হয়।

আদিত্য চৌধুরী নাম ওড়াকান্দী বাসী।
সম্পাদক হন তিনি আনন্দোত্তে আসি।।
কর্মাক্ষয় সাজিলেন সুরেন্দ্র ঠাকুর।
সম্পাদকরীর নাম হইল প্রভুর।।

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর Cast, Protest and Identity in Colonial India The Namasudras of Bengal-এ লিখেছেন— "From the october 1907 issue of their journal 'Namasudra Shurid' we learn that the delegation had met the lieutenant Governor Sir Lence Lot Hare, and expressed their hopes that the British Government in India might remain for ever"। ১৯০৯ সালে রিচিচরণ সরদার ডায়মন্ড হারবার থেকে 'ব্রাহ্মকবিত্রি বাঙ্কব' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯০৮ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় 'নমঃশূদ্র পত্রিকা'। ১৯০৯ সালে খুলনার বাগের হাট থেকে 'জাগরণ' পত্রিকা প্রকাশ পায়। ১৯০৯ সালে দৌলতপুর থেকে আরও একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার নাম 'মুক্তিবর্তা'। ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয় 'নমঃশূদ্র হিতৈষী'। ওই একই সালে জননায়ক মুকুন্দ বিহারী মল্লিকের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে 'পতাকা' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তবে কেশবচন্দ্র দাশের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'নমঃশূদ্র' পত্রিকাটি ব্রিটিশ সরকারের কাছে বিপজ্জনক হওয়ায় ১৯১০ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। আর অন্যদিকে গুরুচাঁদ ঠাকুরের পত্রিকা জনমানসে ক্রমশ অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষ রিপোর্ট প্রকাশ পায় In 1908 The circulation of Namasudra was 500, while that of Surid 550, in 1910, the year of the nationalist take over, the circulation of 'Namasudra' went down to 300 while that of 'Surid' of 450; but in 1911, The year of census while the circulation of Namasudra remind at 300 that of 'Surid' shot up to 700.

গুরুচাঁদ ঠাকুর একদিকে যেমন রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার প্রস্তাব দিয়েছেন, তেমনি সাধারণ কৃষিজীবী গরীব মানুষদের সতর্ক করে বলেছেন—

অর্থহীন বিপ্যাহীন যারা এইভাবে।
রাজনীতি ক্ষেত্রে তারা শাস্তি নাহি পাবে।।
সবলে দুর্বলে যদি করিবে মিলন।
সবলে বাড়িবে বল, দুর্বলের মরণ।।

আবার বাংলা ভাগের পক্ষে থাকবে নাকি বিপক্ষে থাকবে এই নিয়ে যখন গোটা কৃষক

সমাজ বিচলিত তখন গুরুচাঁদ ঠাকুর তাদের বলেন—

আমরা হরিদ্র সবে ঘরে নাহি অন্ন।
দেন্য দায়ে বাধা সবে চির অবসন্ন।।
বিভাগ হউক দেশ অথবা জুড়ুক।
যা আছে রাজার মনে সেভাবে করুক।।

রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতি-অর্থনীতি জীবনের প্রায় সব দিকেই সমান দৃষ্টি ছিল হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের। মতুরা আন্দোলনের কর্মব্যক্তিরাজ তাদের সাধনমত সমাজের পদক্ষেপে সমান নজর রাখার চেষ্টা করতেন। আবার হরিচাঁদ ঠাকুর, গুরুচাঁদ ঠাকুর সহ গোলক পাগল, হীরামন পাগল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গকে কেন্দ্র করে নানা লৌকিক-অলৌকিক কাহিনী গড়ে উঠেছে। ফলে, জনমানসে বিভ্রান্ত ছড়িয়ে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল মতুরাদের দুর্গাপূজা। হরিচাঁদ ঠাকুর নিজে কখনও দুর্গাপূজা করেন নি। তবে তাঁর অনুগামী শ্রদ্ধা দেবী দুর্গাকে নিয়ে নানা ঘটনা ঘটিয়েছেন। তার মধ্যে অন্যতম হল রাউত খামার নিবাসী হীরামন গোখামীর দুর্গাপূজা। সেখানে বাংলার দুর্গাপূজার প্রচলন শুরু হলেও তথাকথিত হিন্দু অস্পৃশ্য বা অতি অস্পৃশ্য সমাজের সে পূজা মন্ডপে প্রবেশের অধিকার ছিল না। তবু দু-একটি ঘটনা চোখে পড়ার মতো। বেথড়ি গ্রামের ধনী ব্যবসায়ী গোবিন্দ বিশ্বাস এবং তার ভাই চৈতন্য বিশ্বাস পাগল হীরামনকে অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। যদিও এই বিশ্বাস পরিবার কৃষ্ণভক্ত ছিল। বারোমাসে তের পার্বনের মত অত্যন্ত ধুমধামের সঙ্গে এই বিশ্বাস বাড়িতে দুর্গাপূজা হত। ১৮৫৪ সালে মহা অষ্টমীর দিনে হীরামন পাগল দুর্গাপূজা দেখার জন্য বেথড়ি গেলেন। পূজা মন্ডপের একপাশে বসে ব্রাহ্মণ পূজারীর পূজা প্রণালী দেখতে দেখতে নীরবে কাঁদছিলেন। পূজা চলাকালীন মা দুর্গে, মা দুর্গে বলে প্রতিমার গলা ছড়িয়ে ধরে তার কোলে উঠতে গেলে সবাই ধরাধরি করে তাকে সরিয়ে আনেন। পূজারী গোলকও তাকে নানাভাবে বুঝিয়ে দেবীর কোলে ওঠা থেকে বিরত রাখেন। কিন্তু হীরামন পাগল কিছুতেই বুঝতে চান না। তিনি বলেন—

মার সেবা আস্তে কিছু প্রসাদ লইব।
মায়ের কোলেতে বসি স্তন দুধ পিব।।
এই কথা বলতে না বলতেই ছুটে যায় মাটির প্রতিমার কাছে। তারপর—

ভানহস্ত প্রতিমার বক্ষঃপরে দিয়া।
বৃদ্ধাঙ্গুলী দিয়া স্তন দেখেন টিপিয়া।।
এতেও মায়ের কোন রকম সাড়া না পেয়ে আক্ষেপের সুরে বলেন—

এই মা যদি সেই মা হত
তবে দেখামাত্র আমাকে চিনতে পারত।

তারপর অভিমানের সুরে নিজেকে হনুমানের সঙ্গে তুলনা করেন। 'মা যদি সত্যি থাকে তবে তাকে যেন দেখা দেন' - এই বলে চিৎকার করেন। উপস্থিত সকলে হীরামনের এ পাগলামী তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেন। কেউ কেউ হাসি ঠাট্টা করেন। হীরামন পাগলামি আচমকা রেগেই ওঠে দুর্গা প্রতিমার ওপর। তারপর বলেন—

সুশীলা সুশীলা মত নিষ্ঠুরতা দেখি।
ভিতরে খড়ের বঁড়ি দুধ পিয়াবা কি।।

কিছু সময় এমনে করে দুর্গা প্রতিমাকে ভর্ৎসনা করার পর মতুয়ারা শিশুর মতো কাঁদা শুরু করেন হীরামন। তারপর বলেন—

দেখিলাম এই বাড়ি পূজার প্রণালী।
নীলপদ্ম বিনা পূজা খুশি হয়ে নিলি।।
সেই প্রভু হরিচাঁদ হৃদপদ্মে রাখি।
দেবদেবী পূজাচর্চা চক্ষে নাহি দেখি।।

নেহাৎ গোবিন্দ চৈতন্য আর তাদের পরিবারের অনেকেই আমাকে প্রচণ্ড ভালবাসে ও এদের বাড়িতে আসি। চোখের সামনে পড়ে গেলি বলে তোর পূজা দেখলাম। এই কথা বলুনরায় কান্না করতে লাগলেন হীরামন।

দেখিতে দেখিতে প্রতিমার চোখে জল।
করুণ করিছে অটল যেন টলমল।।
হীরামন বলে মার দয়া উপজিল।
অমনি যাইয়া স্তনে মুখ দিল।।
ঈষৎ চুষক মাত্র স্তনে মুখ দিয়া।
ওড়াকান্দি স্ত্রীধামেতে চলিল খাইয়া।।

হীরামন পাগলের এই দুর্গা পূজা দেখার কাহিনী সত্য ও মিথ্যাকে মিশিয়া রসরাজ তাঁর চন্দ্র সরকার করেছেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের জীবনে কোন মূর্তিপূজা ঘটেনি। তিনি কোন অনুষ্ঠানে গেছেন, তেমন কোন তথ্যসূত্রও নেই।

১৯০২ সালে ওড়াকান্দি ঠাকুর পরিবার প্রথম দুর্গাপূজা হয়। হরিচাঁদ ঠাকুরের নাতি শশীভূষণ ঠাকুর পরপর চারটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। পুত্র সন্তানের জন্য বাড়ির সকলে উদগ্রীব হয়ে ছিলেন। অবশেষে শশীভূষণ ঠাকুর ও অনঙ্গমোহিনী দেবীর সন্তান ওই বছরেই প্রথমরজন ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে যিনি পি.আর.ঠাকুর নামে পরিচিতি লাভ করেন। প্রথম পুত্র সন্তানের জন্মে শশীভূষণ ঠাকুরের মনে ভীষণ আনন্দ হয়। তিনি ওড়াকান্দির বাড়িতে দুর্গা পূজা করছেন এই আশা তাঁর পিতা গুরুচাঁদ ঠাকুরের কাছে প্রকাশ করলেন। সে সময় ঠাকুর বাড়িতে বারুণীমেলা আর কিছু মেয়েলি পূজা ছাড়া অন্য কোন পূজা হতো না। কাজে কাজেই গুরুচাঁদ ঠাকুর দুর্গাপূজা করার সম্মতি দিলেন না। বরং বললেন—

দশ হাতা বেটি আসি দশ হাতে খায়।
ওর পূজা দিতে গেলে রাজা হতে হয়।।
আমরা সামান্য লোক নাহি অর্থ কড়ি।
বিশেষতঃ অল্প স্থান বিল মধ্যে বাড়ি।।

বাবার দুর্গা পূজা করার অনিচ্ছা শুনে শশীভূষণ ঠাকুর মনে খুব দুঃখ পান। পরপর দুদিন অনাহারে থাকেন। কলকাতার ব্রাহ্ম ও বাবু সমাজের সন্তানদের সঙ্গে ভাল ভাব ছিল শশীভূষণ ঠাকুরের। চাঁদসী ভাঙারদের কয়েকটি পরিবার ও শশীভূষণ ঠাকুরের মাতৃবংশের সকলের ইচ্ছা ছিল যে, শশীভূষণ দুর্গাপূজা করুক। খানিকটা পারিবারিক কলহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তৃতীয় দিনের সকালে গুরুচাঁদ ঠাকুর দুর্গাপূজা করার অনুমতি দিয়ে দেন। তারকচন্দ্র সরকারের ভাষায় —

শোন শশী অদ্য নিশি দেখেছি স্বপন।
দশভূজা পূজা লাগি কর আয়োজন।।
আমারে স্বপনে দেবী বলিল বচন।
মনোসাধে পূজা নিবে আমার ভবন।।
যশোহরবাসী এক ব্রাহ্মণ সূজন।
চন্দ্রীকৃতব মন্ত্র নাকি করেছে লিখন।।
সেই স্তব মন্ত্রে পূজা এই বাড়ি হবে।
ব্রাহ্মণ আসিয়া নিজে পুঁথি দিয়া যাবে।।

যথারীতি ঠাকুর বাড়ি দুর্গাপূজার আয়োজন শুরু হয়। বোধন পূজার দিনে দুর্গা দুর্গা বলে ঠাকুর বাড়ি এলেন একজন ব্রাহ্মণ ঠাকুর। নাম কল্লতরু ভট্টাচার্য্য। তিনি গুরুচাঁদ ঠাকুরের সামনে হাত জোড় করে বললেন— আমি যশোহরে বাস করি। দেবী চন্দীর আদেশে আমি

এখানে এসেছি। তিন দিন আগে স্বপ্নে আমি নৈবধানী পাই—

শুন যিহঁ চন্দী নীতি করেছ রচন।
 তব প্রতি প্রীতি আমি ভাষার কারণে।
 ওড়াকান্দি হরিচাঁদ অবতীর্ণ হল।
 লীলাসাস করি প্রভু নিজ লোকে গেল।
 তস্যপুত্র রূপে যিনি তিনি মোর গুরু।
 মহাকাল মহেশ্বর বাঞ্ছা কল্পতরু।
 তারপুত্র রূপে যিনি শ্রী শশীভূষণ।
 দশভূজা রূপে মোরে করিবে পূজন।
 //////////////////////////////////////
 চন্দীজ্ঞতি লয়ে তুমি করছ গমন।
 তোমার রচিত গীতি সেথা পাঠ হবে।
 গুরুচাঁদ কাছে তুমি এই স্তব দিবে।
 আর বলি গুরুচাঁদে বলিও বচন।
 পূজা ঘরে নমস্কার না করে কখন।
 গুরুর প্রণাম আমি নিতে নাহি পারি।
 বিনয়ে বলিও কথা করজোড়ে করি।

মহাধুমধামের সঙ্গে ১৯০২ সালেই প্রথম ওড়াকান্দি ঠাকুরের বাড়ী দুর্গাপূজা হয়। বিজয় দশমীর পরে শান্তি সভা হয় গুরুচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশে। কয়েক বছর যেতে না যেতেই ওড়াকান্দি ঠাকুরের বাড়ী দুর্গাপূজা বন্ধ হয়ে যায়। এই দুর্গাপূজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পিছনে একটি ঐতিহাসিক কারণ আছে। ১৯০৬ সালে অস্ট্রেলিয়ান খ্রিস্টান মিশনারীর অন্যতম ধর্মপ্রচারক ডা. সি.এস. মীড-এর সঙ্গে গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সেইসময় খৃষ্টান মিশনারীর নানান সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ করতেন। গুরুচাঁদ ঠাকুর ডা. সি.এস. মীডকে তার মিশনারী পরিচালনার জন্য অনেক জমি দিলেন। শুধু তাই নয় গ্রামবাংলার নিরক্ষর অবহেলিত সমাজ সম্পর্কে নানাভাবে জানালেন। প্রকৃতপক্ষে, দুজনেই পরস্পরের প্রতি টান হওয়ার বিশেষ কারণ ছিল। ডা. মীড মনে করতেন যেহেতু একটা বিশাল জাতির প্রাণপুরুষ হলেন গুরুচাঁদ ঠাকুর তাই গুরুচাঁদ ঠাকুরকে বোঝাতে পারলে ব্যাপক মানুষকে সে খৃষ্টান ধর্মে দিক্ষা দিতে পারবেন তেমন গুরুচাঁদ ঠাকুর দেখলেন এই বিশাল অস্পৃশ্য নিরক্ষর পণ্ডিত্য জীবনযাপনকারী জাতিকে শিক্ষিত করতে ব্যাপক অর্থ এবং সরকারী সহযোগিতা দরকার। সুতরাং ডা. সি.এস. মীডকে দিয়েই এই পিছিয়ে রাখা সমাজের উন্নতি করাতে হবে।

মীড ভাবে গুরুচাঁদ নিব নিজ দলে।
 গুরুচাঁদ ইচ্ছা কার্য করাব কৌশলে।।

কিন্তু যতই মীড সাহেব গুরুচাঁদ ঠাকুরের কথায় কাজ করুন না কেন, সমাজ উন্নয়নের জন্য মীডসাহেবের কাজকর্মকে যত প্রশংসাই করুন না কেন, কাজের কাজ হচ্ছে না কিছুই। অর্থাৎ কেউই খৃষ্টান ধর্মে দিক্ষা নিচ্ছেন না। বরং মতুরার সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এমন কী মীড সাহেব নিজেই ক্রমশ গুরুচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত হয়ে যাচ্ছেন। কাজেই একদিন মীড সাহেব জানতে চাইলেন— খৃষ্ট ধর্ম যদি আপনার কাছে এত সুন্দরই হবে তবে আপনি তা গ্রহণ করছেন না কেন? বরং আপনার গৃহে মাটির তৈরী দুর্গাপূজা কেন হয়? আপন সমাজ কেন অন্ধ কুসংস্কার ছেড়ে আমাদের এই বিশ্ববন্দিত মুক্তধর্ম খৃষ্ট ধর্মে আসছেন না? নানান অহিলার মীডকে সমস্যা দি বোঝালেন এবং বললেন খুব শীঘ্রই এই বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করবেন। আসলে তখনও পর্যন্ত গুরুচাঁদ ঠাকুর মীড সাহেবকে দিয়ে যে যে কাজ করাবেন তার অনেক বাকি ছিল। ১৯১০ সালের ১৬ মে বিকাল বেলায় গ্রামের কিছু মোড়ল এবং বেশ কিছু পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গণ্যমান্য ব্যক্তিকে নিয়ে গ্রামবাসীদের সামনেই আলোচনা সভা করেন। আলোচনা সভায় গুরুচাঁদ ঠাকুর বলেন—

ডক্টর মীডের কথা কিছু মিথ্যা নয়।
 মেটে মূর্তিপূজা করা বড়ই অন্যায়।।
 আরো আমি দিনে দিনে বুঝিতেছি সার।
 খ্রিষ্টধর্ম তুল্য ধর্ম নাহি কিছু আর।।

একথায় গ্রামের কিছু মানুষ অসন্তুষ্ট হলেও ডা. মীড খুব খুশি হলেন। আসলে গুরুচাঁদ ঠাকুর যা চেয়েছিলেন তাই হয়েছে। দুবছরের মধ্যে মীড সাহেব যা যা কাজ করেন তা এক কথায় অসাধারণ—

স্কুল হল দূরে গেল চন্ডালদ্র গালি।
 নমজাতি ক্রমে হল প্রতিপত্তিশালী।।

দুর্গাপূজা বন্ধ হওয়ার কয়েক বছর পর অর্থাৎ ১৯১০ সালে গুরুচাঁদ ঠাকুরের ছোট ছেলে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মারা যান। সমাজের ব্যাপক উন্নতি ও পরিবর্তন হলেও গুরুচাঁদ ঠাকুরের পরিবারে বেশ কিছু দুর্ঘটনা ঘটে। তার মধ্যে অন্যতম হল সন্তানের মৃত্যু, পরিবারের ও নিকটতম কয়েকজন আত্মীয়ের নানারকম ব্যাধি। বঙ্গভঙ্গ রোধের ফলে বেশ কিছু সাহের নেতৃত্ব স্থানীয় মানুষ গুরুচাঁদ ঠাকুরকে ভুল বোঝেন এবং তারা নানাভাবে তাকে অপদহ

করতে থাকেন। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা পুনরায় দুর্গাপূজার প্রচলন করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু গুরুচাঁদ কিছুতেই রাজী হন না—

দশভূজা পূজা মোরা করি পুনরায়।
দেবীপূজা হলে তাতে সর্বশক্তি হয়।।
প্রভু বলে এই কার্য আমি না করিব।
মরণের ভয়ে শেষে সেকতা ডাকিব।।

গুরুচাঁদ ঠাকুরের কথায় কেউ কেউ খুশি হলেন না। সবাই মনঃসুখে দিন কাটিতে আগসেন। বেশ কয়েক বছর এভাবে যাওয়ার পর ১৯১৪ সাল থেকে ওড়াকান্দী ঠাকুর বাড়িতে দুর্গাপূজা পুনরায় শুরু হয়। তারক চন্দ্র সরকার তার গ্রামে গুরুচাঁদের মুখে বসালেন— ‘জীর্ণা দীনা রুদ্রা এক নারী’ সে শিবের জলনা। এই বাড়িতে তার পূজা হোক এই তার প্রার্থনা। কাজে কাজেই দেবীর আকৃতি মেনে নেওয়া হল—

দেবী নিজে পূজা লাগি করিল বিনয়।
তাহারে বিমুখ করা উচিত না হয়।।

এত কিছু সত্ত্বেও নমস্কের জীবনে তেমন ঠাই মেলে না। গোটা মতুরা সমাজে একমাত্র আরাধ্য হলেন হরিতাঁদ ঠাকুর। গুরুচাঁদ ঠাকুর পরিবারিক ও আর্থীয় স্বজনদের চাপে পড়ে দুর্গাপূজার মতামত দিয়েছিলেন। নিজে কখনও দুর্গাপূজা প্রাঙ্গনে যেতেন না। যতদূর জানা যায়, পূজার করদীন তিনি বাড়িতেও থাকতেন না। পরিবারিক ও আর্থীয় স্বজনের চিঠি, আত্মকথা, গান, তারক চন্দ্র সরকারের হাতের লেখা পাতুলিপি, সরকারী নথিপত্রে কোথাও দুর্গাপূজায় গুরুচাঁদ ঠাকুর অংশে গ্রহণ করেছেন তার উল্লেখ নেই। আসলে দেবদেবীর উত্থান সম্পর্কে গুরুচাঁদ ঠাকুরের সম্যক ধারণা ছিল। হিন্দু ব্রাহ্মণধর্মের জটিলতাকে নিজে এবং নিজের সমাজকে কখনই টেনে নিয়ে যান নি। সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত দেবীপূজা বিতর্কমূলক। হরিতাঁদ ঠাকুর ১৮৩৩ সালে স্থানীয় জমিদারদের সঙ্গে বিরোধের পর সফলভাঙ্গা ত্যাগ করে ওড়াকান্দি চলে আসেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী শহরে বসবাসকারী পতন্ত্র কলার বাবু জমিদারদের বেশিরভাগ অর্থ আসত জমিদারি থেকে অর্থাৎ কৃষকেরা গাছের ঘান করিয়ে যে ফসল ফলাতেন তা বিক্রি করে। বেশিরভাগ কৃষক তিন মাসের খোরাকি পেতেন। ছলে-বলে নিরক্ষর কৃষকদের ঠাকুরে জমিদার-জোতদারদের বিদ্যাস বহল জীবনযাপন চলত। দেশি-বিদেশি ব্যবসারীদের কাছ থেকে গরীব চাষি মজুরদের চড়া দামে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে হত। বলা যায় ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন পাসের পর গরীব কৃষক পরিবারে আর্থিক ধ্বংস নামে। সামাজিক নির্বাসন বেড়ে যায়

বৎসন। জমিদার, জোতদার, মহাজন বা আর্থিক সম্পদ বড় কৃষক কর্তৃক জোর করে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে সারাদিন কাজ করার পোশাকি নাম বেগার খাটি। দরিদ্র কৃষকগুলোর এই বেগার খাটি ছিল বাধ্যতামূলক। এই বেগার খাটির বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিবাদে মূখর হয়ে ওঠেন গোটা মতুরা সমাজ।

বঙ্গদেশে দাস ব্যবস্থা প্রচলন ছিল। কাজ দেওয়ার নাম করে শক্তপোক্ত তরুন বা মাক বয়সি জেলে, মাঝি, মুটে কৃষক অর্থাৎ গ্রামবাসীদের দাস হিসেবে বিক্রয় করে দেওয়া হত। ১৮৪৬ সালে নম মতুরাদের প্রতিবাদে দাসপ্রথা সরকারিভাবে নিষিদ্ধ হয়। সেকালে হাজার একটি মানবস্বত্ব হুমুপ্রথা ছিল। তার নাম ছিল নরবলি প্রথা। হিন্দুধর্ম অনুযায়ী অশুশ্রাব্য-অভিঅশুশ্রাব্য সমাজের সুলস, সুঠাম, সবল ছোট ছোট বাক্স-কিশোরদের ধরে নিয়ে তত্ত্বসাধক বা আত্মিক মন্দিরের সামনে বা তত্ত্বসাধনাস্থলে বলি দিতেন। হরিতাঁদ ঠাকুর পুণ্য অর্জনের নামে এই জখনা প্রথা বন্ধ করার জন্য মহোৎসবে সকলকে নরবলি প্রথার অসারতা সম্পর্কে বোঝাতেন। জল কয়েক বছরের মধ্যেই বিভিন্ন জেলার নাম মতুরাদের গ্রাম সত্তায় ছড়িয়ে পড়ে। ফলে হাজার হাজার বছর ধরে জাকিয়ে ফরা ভাববাদী ধর্মের নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে মানুষ সচেতন হতে শুরু করেন। সে সময়ে ‘শান্তি বিক্রয়, নামে একটি অমানবিক কৌশল প্রচলিত ছিল। শহরের বা গ্রামের ধনী বাবু সম্প্রদায় শান্তি বিক্রয় করতেন। কোন ধনী বাবু বা মহাজন বা তাঁদের অকর্মনি বিলাস প্রিয় লস্কট পুত্র বা আর্থীয় কাউকে খুন, ধর্ষণ বা শান্তিযোগ্য বা নিশ্চিত কারাবাসের সম্ভাবনা থাকলে ওই অপরাধী বা তার পরিবার কোন আর্থিকভাবে দুর্বল কোন মানুষকে কিছু টাকার লোভ দেখিয়ে কখনো বা তার পরিবার বা সন্তানদির ভরন পোষণের আর্থিক দায়ভার নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতেন। সরল বিশ্বাসী নিরক্ষর গরীব মানুষ বারুর কথায় বিশ্বাস রে ওই সব শান্তিযোগ্য অপরাধ নিজেদের কাঁখে তুলে নিয়ে শান্তিভোগ করতেন। অপিকা, কুশিকা, ধর্মীয় ভয়ভীতি ও চরম দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে ব্রাহ্মণধর্মীদের এই চালাকি ‘শান্তিবিক্রয়’ করার প্রতিবাদে নম মতুরারা গ্রামে গ্রামে সভা করে সমাজ সচেতন করতেন। হরিতাঁদ ঠাকুরের মতুরা মতাদর্শ প্রকৃত পক্ষে নমদের প্রবাহমান জীবনের প্রকৃতি ও সমাজ বিশ্লেষণ থেকে অর্জিত যন্তুবাদী দর্শন, যা শ্রমজীবী সমাজের যুক্তি-বিজ্ঞানভিত্তিক সাম্য ভাবনায় উদ্ভূত।

নমদের যোহেতু নিজস্ব একটি সামাবাদী মতাদর্শ ছিল, সেইহেতু, সুন্দর সুখে জীবনযাপন করার জন্য তাঁদের কারো প্রতি নির্ভর করতে হত না। বিশেষ করে থাকার জন্য ঘর-বাড়ি, খাওয়া-পালা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে তারা নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা করে নিতে পারতেন। আর এই কারণেই এদের ভয়ও নেই ভগবানও নেই। এই অহংকার অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর কাছে বিঘ্নময় হয়ে ওঠে। দীর্ঘকাল রাষ্ট্র ব্যবস্থার বহির্বিহরে থাকার জন্য অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ এদের অশুশ্রাব্য করে রাখে। চতাল বা চাঙাল নামে গালি বাচক শব্দ

এদের ডাকা হত। শুধু তাই নয়, সরকারের কাছে এসে দাসপ্রবণ জাতি রূপে পরিচিতি ঘটান হয়। এমনকি তৎকালীন ব্রিটিশ কারাগারগুলোতে নম কদীদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হত। ১৮৪২ সাল থেকে নমরা জমিদার-জোতদার, সুদখোর মহাজন, ব্রিটিশ সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদার ও সাম্যের অধিকারে আপোশহীন সংগ্রাম শুরু করেন। যার ফলস্বরূপ ১৮৭৩ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী গোনাপাড়া হাটে এই নম মতুরারা জমিদার-জোতদার-উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে সাম্যের দাবীতে সাধারণ ধর্মট ডাকেন। এই আন্দোলনের ফলে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার নড়েচড়ে বসেন। সরকার বাহাদুর আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। শেষে ১৮৭৩ সালের ৭জুন বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর এল.সি.অ্যান্ট সরকারি আদেশ নামা করে কারাগারে বৈষম্যমূলক কার্যকলাপ বাতিল করেন। লোকচক্ষুর আড়ালে থাকা এই ঐতিহাসিক আন্দোলন পৃথিবীতে বিরল। এনিয়াতে প্রথম।

হরিশাঁই ঠাকুর তার অনুগামীদের পিতা-মাতা, স্ত্রী-কন্যা ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণের বিরোধিতা করে বলেছেন—

সংসারে থেকে যার হয় ডাবোয়
সেই সে পরম সাধু জানিবে নিশ্চয়।

পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, আত্ম হরিশাঁই বিশ্বাস করতেন না। বিশ্বাস করতেন না দীর্ঘকাল বা গুরুদেবে। তারক চন্দ্র সরকার তার হরিশাঁইমৃত লিখেছেন—

দীক্ষা নাই করিবে না তীর্থ পর্যটন
মুক্তি স্পৃহা শূণ্য নাই সাধন-ভজন।

মতুরাদের তিনি বলতেন—

করিবে গার্হস্থ্যজীবন লয়ে নিজ নারী
গৃহে থেকে ন্যাসি বান্ধা হু ব্রহ্মচারী।

অর্থাৎ টাকা পরগা খরচ করে তীর্থে তীর্থে ঘুরে না বেড়িয়ে, গুরুদেবের নিকট থেকে যানে অর্থহীন বীজমন্ত্র না নিয়ে, অদীক ব্যক্তি (ঈশ্বর, ভূত-প্রেত বা শয়তান) বা বিদ্য নিয়ে সাধন-ভজন, কৃচ্ছসাধন না করে, চরিত্র পবিত্র রেখে, সত্য বাস্তব মুখে বলে, নিজ বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে সুখে থেকে, পিতা-মাতাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে, গৃহের কাজকর্ম সম্পাদন করে,

পরিতোষে কর্ম করাই গৃহী মানুষের জীবনধারণের প্রকৃত কর্তব্য। অলীক এ অমানবিক শাস্ত্র-বিধির বিরোধিতা করায় গোঁড়া উচ্চবর্গের গণ্ডিত সমাজ, জমিদার, জোতদার, মহাজন ও সদ্য গজিয়ে ওঠা শহরের 'বাবু' শাস্ত্রদায় একত্রিত হয়ে মতুরাদের নানারকম অত্যাচার শুরু করেন। যার জালিয়ে দেওয়া, পুকুরে বিষ দেওয়া, বাড়ি ভাঙচুর, জোরপূর্বক ধান কেটে নেওয়া, সামাজিক ব্যক্তি মতুরাদের প্রতি ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। সামাজিক গণ্ডনা ও আর্থিক দুর্বস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নম-মতুরারা ঐক্যবদ্ধ হন। হরিশাঁই ঐক্যবদ্ধ মতুরাদের জোর কসমে এক ফসলী জমিকে তিন ফসলী কৃষিকাজ করার পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন—

সর্ব কার্য হতে শ্রেষ্ঠ কৃষি কার্য হয়
ত্রিফলা না করা আমাদের ভাল নয়।

কৃষিকাজের পাশাপাশি ব্যকসায় কীভাবে ধন লাভ করা যায় হরিশাঁই সে শিক্ষাও দিলেন—

নিজহাতে ব্যবসা করেন হরিশাঁই
বাণিজ্য প্রণালী শিক্ষা সবে কৈল দান

নম মতুরাদের সমাজ রক্ষার প্রশাসনিক দায়িত্ব ছিল নমগাঠিয়াল। সুবল চালি, যশা বাড়ি, কালু সর্দার প্রমুখ লাঠিয়ালরা নীলকর সাহেব ও তার সাক্ষরপত্রের ভাড়া করে পিটিয়ে মারতেন। বিভিন্ন সরকারী নথিতে উল্লেখ মেলে দান, খাজনা, পুঞ্জো-পার্বন উপলক্ষে কর আদায়, নীলচাষ করায় পুলিশ চৌকিদার দিয়ে সামাজিক অত্যাচার সহ নারী নির্বাক্ত এমন পর্যায়ে পৌছেছিল যে, মতুরা লাঠিয়ালরা করেকজন নায়েব ও অত্যাচারী নীলকর সাহেবকে নীল জুগানোর কড়াইতে শেঁক করে মেরে ফেলেন।

১৮৭৮ সালে হরিশাঁই ঠাকুরের মতুরার পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র গুরুচাঁদ মতুরা আন্দোলনের দায়িত্ব পালন করেন। গুরুচাঁদ ঠাকুর লক্ষ্য করলেন শিক্ষা-বাহ্য্য ও রাজনীতিই খেটে খাওয়া মানুষের সার্বিক উন্নতির চাবিকাঠি। ১৮৮০ সালে গুরুচাঁদ ঠাকুর ওড়াকান্দিতে নিজের বাড়িতে পাঠশালা স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা আন্দোলনের গতি সঞ্চার করেন। তিনি তাঁর অনুগামী ও সহযোগী মানুষজনকে মুক্তকণ্ঠেই আহ্বান জানান—

সবাকারে বলি আমি যদি মানো মোরে
অবিদ্বান পুত্র কেন নাহি থাকে ঘরে।

গুরুচাঁদ ঠাকুর জানতেন যে, মানুষকে তার মনুষ্যত্বের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার জন্যই সর্বস্তরে শিক্ষা প্রচার করা একান্ত দরকার। তাই জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মাথোই শিক্ষা আন্দোলন ছড়িয়ে দিলেন— কবি মহানন্দ হালদারের ‘গুরুচাঁদচরিত’-এর অংশ।

শিক্ষা আন্দোলন হবে প্রভু করে দেশে দেশে
ভকত সূজন যত তার কাছে আসে
নম সাহা তেলি মালি আর কুস্তকার
কাপালি মাহিষ্য দাস চামার কামার।
পোদ আসে তাত্তি আসে আসে মালাকার
কতই মুসলমান আসে ঠিক নাহি তার।

নারীর প্রতি অমানুষিক অত্যাচারের চিত্র বদলানোর জন্য গুরুচাঁদ ঠাকুর (১৮৪৬-১৯৩৭) পিতা হরিচাঁদ ঠাকুরের পথ অনুসরণ করলেন। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন, স্ত্রীলোক গৃহলক্ষী হয় তখন যখন সে শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী হয়। তাই নারী শিক্ষার বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য গুড়াকান্দিতে নিজের বাড়িতে প্রথম পাঠশালা করেন—

নারী শিক্ষার তরে প্রভু আপন আলয়
শান্তি সত্যভামা নামে স্থল গড়ি দেয়।

নারী ও পুরুষদের আলাদা আলাদা স্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরী করেন। মহিলাদের মাতৃকালীন পরিসেবার জন্য মিশনারীদের সহযোগিতায় নারী কল্যান স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষা বিস্তারের মশাল গুরুচাঁদ ঠাকুরের হাতে দীপ্তমান হয়। বলা যায়, শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয় গোটা অন্ধকার বাংলা। সে সময় শিক্ষিত কৃষক সন্তানেরা সরকারি চাকরি দাবী করলে মনুর বিধান শুনিয়ে ভদ্র বাঙালি পণ্ডিত সমাজ তাদের কঠোর শাস্তির জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান। সমগ্র প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে গুরুচাঁদ ঠাকুরের সরকারি চাকরির দাবির আন্দোলন আরও তীব্র হল। ১৯০৭ সালে পূর্ববঙ্গে সর্বপ্রথম ‘Representation of Communities in Government Services Act, 1907’-এর মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের ব্যাপারে তথাকথিত নিম্নবর্ণ ও মুসলমানদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ১৯০৭ সালেই গুরুচাঁদ ঠাকুরের পুত্র শশীভূষণ ঠাকুর সাব-রেজিস্ট্রার পদে যোগ দিলেন। ১৯০৮ সালে কুমিল্লায় ময়িক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং তারিনী বল সরকারি ডাক্তার হিসাবে চাকরিতে যোগ দিলেন।

হরিচাঁদ ঠাকুর বুঝে ছিলেন কোন হিন্দুর প্রতিক্রিয়া তখনই সম্ভব যখন দুটি ভিন্ন শক্তি

মুখোমুখি দাঁড়ায়। তাই তিনি তার স্বজাতিকে তাদের প্রবহমান জীবন আর্পণকে শ্রমবিমুখ ক্ষমতা লোভীদের বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে দিলেন। পরবর্তীকালে গুরুচাঁদ ঠাকুর ব্রাহ্মণ্য রাজনীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। যারা অবহেলিত, ঘৃণিত, যারা চিরকাল বুক উজাড় করে দিল পেল না কিছুই, তাদের উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানালেন—

‘বিদ্যা চাই ধন চাই রাজকার্য চাই’। তিনি বুকেছিলেন—

যে জাতির দল নেই
সে জাতির বল নেই
যে জাতির রাজা নেই
সে জাতি তাজা নেই।

বাংলার খোটে খাওয়া মানুষজনদের সঙ্গে নিয়ে সভা-সমিতি করে, পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে শক্তিশালী সংগঠন করেন। যার মাধ্যমে তথাকথিত অস্পৃশ্য, অতিঅস্পৃশ্য সমাজকে সতর্ক করেছেন, উদ্বীপ্ত করেছেন। পিছিয়ে রাখা ৯০ শতাংশ মানুষের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে এক সংগ্রামী সজাগ বার্তা দিলেন—

“বিদ্যা যদি পাও কাহারে ডরাও
কার ঘারে চাও ডিন্কা।
রাজশক্তি পাবে বেদনা ঘুটিবে
কালে হবে সে পরীক্ষা।”

১৯৩৭ সালের ইলেকশ্যানে গোটা বাংলা থেকে ৩২ জন পিছিয়ে রাখা সমাজ থেকে নির্বাচিত হন। এদের মধ্যে থেকে ১২ জন ছিলেন নমজাতির মানুষ। যাদের মধ্যে অন্যতম যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল, বিরাট চন্দ্র মন্ডল, পি.আর.ঠাকুর, রসিক লাল বিশ্বাস প্রমুখ। বিশেষ উল্লেখযোগ্য মহারাষ্ট্রে পরাজিত হওয়া প্রতিভাধর ডা. বি.আর.আফেনকরকে গুরুচাঁদ ঠাকুরের উত্তরসূরীরা ভোট দিয়ে জিতিয়ে গণ পরিষদে পাঠিয়েছেন। তবে একথা সত্য গুরুচাঁদ ঠাকুর একদিকে যেমন রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার প্রস্তাব দিয়েছেন, তেমনি সাধারণ কৃষিজীবী গরীব মানুষদের সতর্ক করে বলেছেন—

“অর্থহীন বিদ্যাহীন যারা এই ভবে

রাজনীতি ক্ষেত্রে তারা শাস্তি নাহি পাবে।
সবলে দুর্বলে যদি করিবে মিলন
সবলে বাড়িবে বল, দুর্বলের মরণ।”

১৯৩৭ সালে গুরুচাঁদ ঠাকুরের মৃত্যুর পর সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে মতুয়া আন্দোলন তার স্বতন্ত্রতা হারিয়ে ফেলে।

পথ ভোলা মতুয়া সমাজ

সুশান্ত সরকার

যীরা স্বর্গ নরকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না তাঁদের অনেকেই সংসঙ্গে স্বর্গবাস অসংসঙ্গে নরকবাস উপমাটি ব্যবহার করেন। এখানে সঙ্গ শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্গ শব্দটিকে ব্যাপকার্থে সময়, পরিবেশ, পরম্পরা, ইতিহাস সমকাল, অর্থনীতি, সংস্কৃতি এমনকি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। ভারতীয় উপমহাদেশে যতসংখ্যক মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, শিখ আছেন, তাঁদের বংশলতিকার উপর দিকে তাকালে দেখা যায় যে তাঁদের পূর্বপুরুষরা ভারতে চালু চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার নীচের থাকে চাপা পরা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, ১৯১১ সালে আই.এফ.এ. শীল্ড জরী মোহনবাগান দলে এক রেভারেন্ড চটিচ্ছে ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষ কোন ধান্দায় খৃষ্টান হয়েছিলেন জানা না গেলেও তাঁর বংশধররা চার্চের পয়সায় ফান্ডেড এম.জি.ও. খুলে বসেছেন।

বেশীর ভাগ ধর্মাস্ত্রিত কিন্তু হিন্দুধর্মের বিপক্ষজনক কাঠামোর বাইরে যাবার অধিকার পাননি। তাই এখনো দলিত খৃষ্টান, দলিত শিখ, দলিত বৌদ্ধ (বরুয়া), ওবিসি মুসলমান সমাজ বিজ্ঞানীদের আলোচিত বিষয় কারণ ইসলাম, খৃষ্ট ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, শিখ ধর্ম জাতিভেদকে মান্যতা দেয় না। প্রকৃতপক্ষে এসবই তিমিসিল (যারা তিমি মাছকেও গিলে খেতে পারে) মনুবাাদের কারু কৌশল।

হিটলারের দৈরাচারী অস্তিত্ব যেমন ইহুদী থেকে কম্যুনিষ্ট সকলকেই ধ্বংশের মুখে নিয়ে গিয়েছিল, মনুবাদ তথা ব্রাহ্মন্যতন্ত্র তেমনই দাসত্বমুক্তির সামান্য প্রচেষ্টাকে হয় গিলে নিয়েছে বা বিনাশ করার চেষ্টা করেছে।

মতুয়াদর্শন - যুগ সন্ধিক্ষণে আবির্ভাব

অভিনেতাদের আজ রাজা কাল প্রজার পোষাক পরতে হয়। সমাজ পরিবর্তনকারীদের জীবনযাপন বিপরিতধর্মী। সময়, চেতনার মানের সংগতিপূর্ণ হাঙ্গা লড়াই চালাতে চালাতে যুগসন্ধিক্ষণে কামারের এক ঘা মারেন তাঁরা। শ্রী চৈতন্য যখন বৈষ্ণবধর্ম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হিন্দুধর্মকে মন্দির-পুরোহিতদের বেড়াজাল থেকে উদ্ধার করে ধর্মকে আমজনতার মাঝে নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন এবং কিছুটা সফলও হয়েছিলেন তখনই তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় এবং তাঁকে সর্বগ্রাসী হিন্দু ধর্মের নতুন এক অবতার হিসেবে চিত্রিত করা হয়। এর বহু কাল বাদে বৈষ্ণব পরিবারে জন্ম হরিচাঁদ ঠাকুরের (১১ই মার্চ-১৮১২)। প্রধানত অধুনা বাংলাদেশের ৪টি জেলার নামে সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাঁর জীবন যাপন এবং কর্মকান্ড যা ক্রমাগত: অন্য সম্প্রদায় এমনকি নব্য মুসলমানদেরও আকৃষ্ট করে। অশিক্ষিত হরিচাঁদ ঠাকুর বৈষ্ণব ধর্মের

উত্থান এবং আদর্শগত পতন (অথবা ব্রাহ্মণবাদের ভোজ্য পরিণত হওয়া) নজরে রেখেই সতর্কভাবে বেশকিছু নির্দেশিকা চালু করলেন যা পরবর্তীকালে মতুয়াদর্শনে নীতিকথা হিসাবে গৃহীত হয়। এর মধ্যে বৈষ্ণববাদের প্রভাব খুবই ক্ষীণ উপরন্তু শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের নিত্যদিনের জীবনসংগ্রামের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং মোটামুটিভাবে তাত্ত্বিক বস্তুবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বর্তমানে মতুয়াদর্শনকে গবেষকদের ভাষায় “লোকধর্ম”, “গৌণধর্ম” নামে ব্যবহৃত হলেও প্রকৃতপক্ষে (বি)দ্রোহীধর্ম (ছিল)। বোড়শ শতাব্দীর ইউরোপিয় দর্শন প্রত্যক্ষবাদ (যাহা দেখিব তাহা বিশ্বাস করিব যা দেখিব না তা অসম্ভব) এর সাথে মতুয়া দর্শনের বেশ মিল পাওয়া যায়।

মতুয়া দর্শনের উপর ভাববাদী আক্রমণ

ধারণা (১) মতুয়া ধর্ম কি জন্মলগ্নেই ভাববাদের মারণ ব্যাধীতে আক্রান্ত যা তাকে বিপথগামীতার দিকে নিয়ে যায়?

ধারণা (২) হরিচাঁদ, গুরুচাঁদের ভেঁকধারী তৎকালীন অনুগামীগণ এবং স্বার্থায়েবী বংশধরদের বাড়্যাত্রে বা অনীহায় কি একটি প্রতিবাদী ধর্ম আর পাঁচটি ধর্মের মতো প্রতিষ্ঠানিক ধর্মে পরিণত হয়েছে?

প্রথম ধারণার কারণ জানা কঠিন নয় তার তা গবেষকদের শ্রমসাধ্য কাজ বলে মনে হয়।

২য় ধারণাঃ মতুয়া ধর্মের উৎসকাল এবং পরবর্তীকাল অথবা শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত রচনা এবং প্রকাশনা সংক্রান্ত যতরকম বিতর্ক এখনও পর্যন্ত গবেষণা ধর্মী বই এ প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে এ সিদ্ধান্তে আসার যথেষ্ট উপকরণ আছে। “লীলা মৃত” এর বহু সংস্করণ এবং মুদ্রনে এই প্রশ্নের কোন সন্দুভ নেই যে হরিচাঁদ ঠাকুরের বংশলতিকার এঁদের মৈথিলীয় ব্রাহ্মণ কুলজাত হিসাবে লীপিবদ্ধ আছে কেন? তৎকালীন ব্রাহ্মণদের বহু বিবাহের অভ্যাস জানা সত্ত্বেও শুদ্রবংশীয় কন্যাকে বিবাহ এবং ফলে সমাজচ্যুত হওয়ার আবাড়ি গল্পে বানানোর প্রয়োজন ছিল কি? ছাপাখানার মালিকের নারাজ হওয়া অথবা মালিকের অনুপস্থিতিতে কর্মীদের দিয়ে লীলা মৃত ছাপানোর গল্পে তো মসলা ফিল্মকে হার মানায়। বংশলতিকার - (শ্রী শ্রী রামদাস ঠাকুরের (মৈথিলীয় ব্রাহ্মণ) পুত্র চন্দ্রমোহন গুরানী রাজলক্ষীকে বিবাহ করিয়া সমাজচ্যুত হন) - ভেজাল মিশ্রিত তথ্য আজও সংশোধিত হয়নি।

পুরুষানুক্রমে বৈষ্ণব ঘরানায় প্রতিপালিত ঠাকুর পরিবারে জন্মাবার ফলে হরিচাঁদের মায়াবাদ এর প্রভাব কাটানো সহজ ছিল না। তবুও দরিদ্র জনতা (বিশেষতঃ নমোসম্প্রদায়) যতটা বেশী দেব-দেবীর সাথে সম্পর্ক কাটিয়ে নিত্যদিনের সমস্যা সংকুল জীবনকে উন্নততর স্তরে নিয়ে যেতে পারে তার প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন হরিচাঁদ ঠাকুর। আজকের সময়ে দাড়িয়ে অতি সহজেই বলে দেওয়া যায়, যে তৎকালীন পদ্ধতিতে বেশ কিছু ত্রুটি ছিল। যে কোন ধর্মীয় দর্শন বা রাজনৈতিক তত্ত্বকথাকে কালের সময় বিচারে বিশ্লেষণ করাই শ্রেয়।

সহপাচ্য করার জন্য শিশুদের দুধে জল মিশিয়ে খাওয়ানো হয়। মতুয়া ধর্মের বিষয়ে সমস্ত

রচনাই পাঠকালে এই “দুধ” এবং “জল” পৃথক করে পর্যবেক্ষণ এবং আলোচনা করাই উপযুক্ত পদ্ধতি।

এটা না করার কুফল দাড়িয়েছে যে অবলিলাক্রমে হরিচাঁদ - গুরুচাঁদকে শিব - ব্রহ্মার অবতার বলে চালানো হচ্ছে। যে কোন মতুয়া ধর্ম সম্মেলনে হরিচাঁদ - গুরুচাঁদ চর্চা যদি তাদের প্রতি প্রকৃত সত্যতা স্বীকা রেখে করা যায় তবে ভাবাবেগের কান্নার রোল বা ভক্তি অশ্রুর বিসর্জনের বদলে প্রতিটি সভা একটি দলিতমুক্তির তথ্য মানবমুক্তির উদ্দেশ্যে নিবেদিত হবে। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী ধর্মীয় জনসমাবেশের রেকর্ড-এলাহাবাদে কুস্তগান- ৫ কোটি। সাগরমেলায় স্নানও অসংখ্য মানুষ করে। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের লাগোয়া তো গঙ্গা আছেই। কালিঘাটের মন্দিরের পাশে পচা খালটি ও পবিত্র স্নানের জায়গা। যদিও মতুয়া ধর্মে কামনা পূরুরে পুণ্যস্থানের কথা আছে তবুও আজ যদি হরিচাঁদ - গুরুচাঁদ বৈঠক থাকতেন এবং তাঁদের ভক্তদের ঠাকুরনগরের পুকুরে “চান” দেখতেন তবে মেহনতী মানুষের স্বাস্থ্য সচেতনতায় স্নানের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে নতুন নির্দেশিকা চালু করতেন। স্নানের মাধ্যমে দেহতত্ত্ব, মন শুদ্ধির নকলনবিশীল এই অগুণ্ড প্রতিফলন পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (who)- ২০১০ এপ্রিল ভারত বিভাগের রিপোর্টে জানা যায় যে ভারতে রুগ্ন মানুষের ৭৫ শতাংশের রোগ উপশম হয় বিনা চিকিৎসায়। ১৫ শতাংশ ভুল বা সঠিক চিকিৎসায়। বাকি ১০ শতাংশের সঠিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা প্রয়োজন। রোগীর মানসিক দৃঢ়তা রোগ উপশমের প্রধান উপায়। মতুয়া সম্প্রদায় সাধারণভাবে Balanced diet - রোগ দূরীকরণের উপায় মনে করে যা কোন মতে Faith healing - নয়।

এক দ্রোহী দর্শনের উপর রাজনৈতিক “ভেসেকটমি” আক্রমণ

মতুয়া ধর্ম প্রধানতঃ দলিত দরিদ্র জনগণের ধর্ম যা প্রায়ই শাসক ব্রাহ্মণাধর্মের সমান্তরাল পথে হাঁটার চেষ্টা চালিয়েছে। ফলে মতুয়া ধর্মাবলম্বীরা কৃষক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে জমিদারতন্ত্রকে ধাক্কা দেবার কাজ করেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর আত্মনে বর্ধমান মেলায় হাট গোবিন্দপুরে প্রজাকৃষক পার্টির সম্মেলনে ৫ জন মতুয়া প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। মতুয়া ধর্ম চর্চায় “ক্রিফলা” শব্দটি একাধিকবার এসেছে তা ভূমিহারা কৃষকদের তেজাগার দাবির সমার্থক। এ কারণে বহুবার গুরুচাঁদ ঠাকুরকে তাঁর পরিবারের অন্য ভাগিদারদের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে হয়। নীলবিশ্রোহের শেষপর্বে মতুয়াদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। মতুয়া ধর্ম কি পরিবারতন্ত্রকে মান্যতা দেয়? গুরুচাঁদ ঠাকুরের পুত্র শশীভূষণ ছাড়াও অন্য পুত্র সন্তান ছিল যাদের একজন সুখ্যাকুমারের পুত্র ভগবতি ঠাকুর উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। তাহলে শশীভূষণের পুত্র প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর কেন যোগ্যতা বলে মতুয়া পতাকাবহনের একমাত্র অধিকারী হোলেন? গোপাল সাধুর আর্থিক সহযোগিতায় বিদেশ গিয়েছিলেন বোলে? কিংবা তাঁর স্ত্রী কোন রসায়নে সর্বজনপ্রণয়া হোলেন? বংশলতিকায় হরিচাঁদ গুরুচাঁদের অন্যান্য

বংশধরদের হিন্দু পাওয়া গেলেও তাঁদের পরিচিতি নিজস্ব, উত্তরাধিকার সূত্রে নয়। স্বশিক্ষিত হরিচাঁদের বৈশ্ববিক গুণাবলী গুরুত্ব গ্রহণ করতে পেরেছিলেন বলেই মতুরা ধর্ম সর্বজন শিক্ষা, বিলাসহীন জীবনযাপন, স্বাস্থ্য সচেতনতা, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের মাঝে এক ব্যাপক সংখ্যক দলিত সম্প্রদায়কে আত্মমর্যাদায় বলীয়ান হোতে শিখিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরেকে অন্যান্য বংশধররা একাজ করার সাধ বা সাধ্য দেখাননি। হরিচাঁদ-গুরুচাঁদের মতো দূরদর্শিতা তাঁদের বংশধরদের মধ্যে ছিলনা বলেই তাঁদের ইতিহাসের পাতায় উল্লেখ থাকার যৌক্তিকতা নেই।

কে এই পি. আর. ঠাকুর?

চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যোগেশ্বরনাথ মন্ডলকে নিয়ে গবেষণা করেছেন হৈপায়ন সেন। গণপরিষদে যোগেশ্বরনাথের মনোনীত প্রার্থী ছিলেন বি. আর. আশ্বেদকর। গণপরিষদের মহাযজ্ঞস্থানা থেকে যা তথ্য পাওয়া যায় তাতে বি. আর. আশ্বেদকর গণপরিষদের দলিত সমাজের সমস্যা তথা মানবমুক্তির পক্ষে যতবার আলোচনা বা বিতর্ক তুলেছেন, সে সময় আর এক সদস্য পি. আর. ঠাকুর নীরব থাকতেন। পি. আর. ঠাকুর যে দলের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন তাদের নির্দেশেই পি. আর. ঠাকুরের হীরণ্য নীরবতা। দলিত সমাজের সমস্যা প্রসঙ্গে তাঁর এই ঐকান্তিক ভূমিকা হরিচাঁদ-গুরুচাঁদের প্রতি প্রাপ্য সম্মান দেয় না।

মার্কিন সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের সহযোগীতায় কম্পিউটারের আবির্ভাব, যা এখন মাঝে মধ্যেই মার্কিন সরকার সহ অন্যান্য স্বার্থাধেয়ী মহলকেই বিব্রত করে। ইন্টারনেটে গুগল, উইকিপিডিয়া, তথ্য জ্ঞানার অধিকার এবং ইন্ডো-বুটিশ এডুকেশন আর্কাইভ থেকে জানা যাচ্ছে যে পি. আর. ঠাকুর নামে কোনও বার-এট-ল (চলতি কথার বিলেত ফেরত ব্যারিটার)র অস্তিত্ব নেই।

রাজনৈতিক ফেরীওয়ালারা কালিঘটি-আলিমুদ্দিন আর ঠাকুরনগরের দূরত্ব কমিয়ে ফেলেছে। ভেটিব্যাংক বড় লোভনীয় বস্তু। ২০০৩ সালে যে দলগুলি ২ কোটি মানুষের নাগরিকত্ব দুই সংসদে হাত তুলে বাতিল করেছিল তারাই এখন মতুরাদের মধ্যে “ট্রায়ের ঘোড়া” চুকিয়ে দিয়েছে। হরিচাঁদ গুরুচাঁদকে নিয়ে যারা বাণিজ্য করছে, তাদের মধ্যে হরিচাঁদ গুরুচাঁদের বংশধররা থাকলেও, পথভোলা মতুরা সমাজ তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করুক যে মতুরা ধর্মের জনকল্যানকামী পবিত্রতা যে কোন মূল্যেই রক্ষা করতে হবে। মতুরা ধর্ম দলিত,পতিত শোষিত মানুষের সম্মানবোধ জাগ্রত করে। দেবতা ব্রাহ্মণ-আলৌকিকতা-কুসংস্কার-সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা মতুরা ধর্মে পড়ার কথা নয়। মতুরা সমাজ রাজ অনুগ্রহ চায় না। সর্বহারার দলিতদের গণতান্ত্রিক শাসন চায়। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের আগে সামাজিক ক্ষমতায়ন চায়। মতুরা ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে ভক্তিরস নয়, শক্তি রস জাগ্রত হোক।

জাতিভেদে নারীদের সাধনার বাধা

ক্ষিতিমোহন সেন

ক্ষিতিমোহন সেন(১৮৮০-১৯৬০) কালীতে সংস্কৃত শিক্ষা করেন।

এখানে তাঁর ‘জাতিভেদ’ গ্রন্থের একটি অধ্যায় সংকলিত হলো।

এমনিই কলিকালে সমুদ্রযাত্রা, নিষিদ্ধ। তার উপর কলিতে নিয়মেরও কড়াকড়ি। তাই এখনকার দিনে জাতিভেদ ও বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার আচারবিচার মাথায় রাখিয়া বিদেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করা অসাধ্য। ভারতে লোক ধরিতেছে না, বেকারের অন্ত নাই, অথচ বাহিরে যাওয়ার উপায় নাই—ফিজি, ট্রিনিডাদ প্রভৃতি দেশে যাঁহারা গিয়াছেন তাঁহারা সেখানে জাতিবর্ণের সকল অনুশাসন মানিয়া চলিতে পারেন নাই। তাই এখন তাঁহাদের আর ভারতে ফিরিবার উপায় নাই। ভারতের সঙ্গে তাঁহাদের যোগসূত্র একেবারে ছিন্ন হইয়াছে। যাঁহারা ব্রহ্ম শ্যাম প্রভৃতি দেশে গিয়া সেই দেশীয় কন্যা বিবাহ করেন তাঁহারা দেশে ফিরিতে হইলে স্ত্রী পুত্র কন্যা বিসর্জন দিয়া আসেন। সেই স্ত্রী পুত্র কন্যাদের পিতার ধর্মে আশ্রয় নাই। কারণ পতির বা পিতার জাতিতে তাঁহাদের স্থান কোথায়?

দেশে বিদেশে জাতি বাঁচিয়া চলা কঠিন। তাই দেশ-বিদেশের নৌযুদ্ধবিদ্ভাগে কি জাহাজচালনায় খালসী লঙ্কর ও সারেং প্রভৃতির কাজ আমাদের কাছে রক্ষ। বহু বেকার লোকের হয়তো ইহাতে অন্নসংস্থান হইত। এইসব কাজ করিয়া নোয়াখালী চট্টগ্রামবাসী ও দক্ষিণভারতীয় বহু মুসলমান সুখে জীবিকা অর্জন করিতেছেন, এইসব কাজ তাঁহাদেরই একচেটিয়া। পূর্বে চট্টগ্রামের হিন্দু পটিনীরা সমুদ্রযাত্রায় পটু ছিলেন। এখন সেখানে সব নাবিক মুসলমান। সমুদ্রযাত্রা হিন্দুদের পটে নিষিদ্ধ হইলে কালিকটের জামোরিন আপন হিন্দু নৌজীবী প্রজাদের মুসলমান করিয়া শাস্ত্রের সম্মান রক্ষা করেন।

জাতিভেদপ্রথায় সর্বাপেক্ষা ক্ষতি হইয়াছে নারীর। পূর্বে কন্যাদের বিবাহ হইত যৌবনে। তাই তাঁহাদের যথারীতি শিক্ষার দিবার সময় থাকিত এবং তাঁহারা শিক্ষা পাইতেন। বেদে কন্যাদেরও ব্রহ্মচর্যের কথা দেখা যায়—

ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দত পতিম্। অথর্ব, ১১,৭, ১৮

পরশরমাধবে আচারকাণ্ডে বিবাহপ্রকরণে যমবচন উদ্ধৃত করিয়া দেখান আছে পুরাকালে কুমারীদের মৌলীবন্ধন অর্থাৎ উপনয়ন হইত। কন্যারা তখন বেদও অধ্যয়ন করিতেন। সেই গ্রন্থেই হারীতোক্ত বলিয়া উদ্ধৃত বচনে বলা হইয়াছে নারীদের মধ্যে দুইটি শ্রেণী দেখা যায়। একদল ব্রহ্মবাদিনী, অন্যদল স্যোবধু।

উপনয়নের পর গুরুগৃহে থাকিয়া নারীরা রীতিমত জ্ঞানলাভ করিতেন। উত্তরচরিত নাটকে ভবভূতি তাহার একটি সুন্দর চিত্র দিয়াছেন। ভবভূতির কালকে হয়তো কেহ কেহ প্রমাণ না

মনে করিতে পারেন কিন্তু গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা নারীরা যে শিক্ষালাভ করিতেন সে কথা বহু প্রাচীন গ্রন্থে মেলে। কুরুক্ষেত্রের নিকট একটি আশ্রমে ব্রহ্মচারিণী শাণ্ডিল্যানুহিত তপসিজি লাভ করেন (মহাভারত, শল্যপর্ব, ৫৪, ৬)। মহাভারতে আর একটি স্বয়ংক্রিয় বিবরণ পাই; তিনি ব্রহ্মচর্যপালন করিয়া তপস্যায় রাত থাকিয়া বৃদ্ধ হইয়া পড়েন, পরে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করা প্রয়োজন এই উপদেশ শুনিয়া বৃদ্ধকালে বিবাহ করেন (শল্যপর্ব, ৫২ ২০)।

সুলভা নামে এক মনস্বিনী নারী মুনিব্রতধারিণী হইয়া তপশ্চর্যা করেন (মহাভারত, শান্তিপর্ব ৩২০, ১৮০)।

সিদ্ধা ব্রাহ্মণকন্যা শিবা যথারীতি সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়া পরে সিদ্ধা হন (মহাভারত উদ্যোগপর্ব, ১০৯, ১৯)।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বলেন, পতিরতা সতী সামবেদোক্ত মন্ত্রে পূজা করিবেন (শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড ৮৩ অধ্যায়, ১৩০)।

স্থানান্তরে বলা হইয়াছে মহর্ষি নারদও হরিভক্তিময় গান শিক্ষা করিতে জাম্ববতী, সত্যভামা, রুক্মিণী এমনকি রুক্মিণীর সহচরীদের কাছেও শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন (লিঙ্গ পুরাণ, উত্তর ভাগ, তৃতীয় অধ্যায়, ৮৯-১০০)।

বেদ ও শাস্ত্রীয় জ্ঞান হইতে বঞ্চিত নারীরা সত্য সত্যই শূদ্রা হইয়া উঠিলেন। কিনা শিক্ষা শূদ্রতা দূর হইবে কিসে?

পূর্বে কন্যারা বড় হইয়া নিজে ইচ্ছামত পতিকে নির্বাচন করিতেন। বরণ করা হয় বলিয়া নাম বর। অনেক ক্ষেত্রে কন্যারা নিজে পছন্দ করিয়া গান্ধর্ব মতেই বিবাহ করিতেন। মনু এইরূপ বিবাহ স্বীকার করিয়াছেন (৩, ২১)। পরাশরমাধবেও গান্ধর্ববিবাহের বৈধতা স্বীকৃত হইয়াছে। পরাশরমাধবেই দেখা যায় বৌধায়ন কেবল প্রভৃতিও গান্ধর্ববিবাহকে স্বীকার করেন অগ্নিপূরাণেও গান্ধর্ববিবাহের বৈধতার কথা আছে (১৫৪ অধ্যায়)। বেদে মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে গান্ধর্ববিবাহের ভূরি ভূরি উল্লেখ পাওয়া যায়।

জাতিভেদ যখন প্রবল হইয়া উঠিল তখন কন্যা বড় হইয়া কাহাকে বরণ করিবে, বা ঠিকমত জাতিকুলের হইবে কিনা, এইসব উদ্বেগ আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্রমে জাতিভেদকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে গিয়া পছন্দ-অপছন্দের বালাই জন্মাইবার পূর্বেই বাল্যকালেই কন্যাদিগকে বিবাহ দেওয়া হইতে লাগিল। বরণের দ্বারা বিবাহের বদলে কন্যাদান পৌরীদান প্রভৃতিই প্রবর্তিত হইল। এইজন্যই স্মৃতিতে অল্প বয়সে কন্যাদের বিবাহ দিব্যর জন্য এত পীড়াপীড়ি।

জন্মশতবর্ষে কল্পনা দত্ত যোশী

মানিনী চট্টোপাধ্যায়

আমার শাওড়ী মা কল্পনা দত্ত যোশী এবং স্বস্তর মহাশয় স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। স্বস্তর মহাশয় পি.সি. যোশী অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টির এককালে সর্বভারতীয় সম্পাদক ছিলেন। এরা দুজনেই অসংখ্য যুবককে বাম, গণতান্ত্রিক এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে আকৃষ্ট করেন। কল্পনা দত্ত আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রথম স্তরের বিপ্লবী নেত্রী ছিলেন। আমি পি.সি. যোশীকে দেখিনি কিন্তু ১৯৮৩ সাল থেকে কল্পনা দত্তকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি। তাঁদের পুত্র তাঁদের সাথে বিবাহের সূত্রে আমরা একই সাথে দীর্ঘকাল বসবাস করেছি।

কল্পনা দত্ত একজন সর্বার্থে মাতৃসমা স্নেহপ্রবণ মানুষ ছিলেন। তিনি তাঁর যৌবনের বিপ্লবী জীবনের ঘটনাগুলি স্মৃতিচারণ করতে পছন্দ করতেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন (মৃত্যু-১৯৯৫) আমি তাঁর সম্পর্কে কিছুই লিখিনি।

কল্পনা দত্তের সম্পর্কিত ভাই সুবোধ রায় (বুকু), যিনি চট্টগ্রাম বিদ্রোহের অংশীদার ছিলেন, আমাকে বেশ কিছু অপ্রকাশিত রচনা দেন এবং ঐ সংগ্রামের অন্য সংগঠক কর্মী সমর্থকদের সাথে আলাপ করিয়ে দেন। বার মাধ্যমে আমি আমার শাওড়ীমা কল্পনা দত্তের বিপ্লবী জীবনের অনেক ইতিহাস জানতে পারি।

পারিবারিক জীবনে তাঁর সাহচর্য আমাকে বিস্মিত করত। অত্যন্ত সাধাসিঁথে জীবন যাপন, রসিকতাবোধ এবং একই সাথে মানসিক দৃঢ়তা সম্পন্ন মানুষ আমি কমই পেয়েছি। ৭৫ বছর বয়সেও তিনি দিমির মানুষঠাসা বাসে যাতায়াত করতে পিছপা হোতেন না। তিনি যে বৃহত্তর গম গণতান্ত্রিক পরিবারের সদস্য ছিলেন, সেখানে তিনি আদর্শ স্থানীয় ছিলেন। তাঁর অতীত বিপ্লব জীবনের সহজতা তাঁর পরবর্তী জীবনেও প্রভাব ফেলেছে। তিনি নিজের পোশাক নিজেই পরিষ্কার করতেন। ঘরের রান্নার কাজেও উদ্যোগী ভূমিকা নিতেন। যতদিন না পর্যন্ত গর্ভকাজনিত কারণে স্মৃতিভ্রংশ হয়েছিলেন, নিয়মিত ব্যায়াম করতেন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাঁর কথাবার্তায় তাঁর প্রিয় চট্টগ্রামের কথা ঘুরেফিরে আসতো।

আমার রচিত বই: ডুঅর ডাই, চট্টগ্রাম বিদ্রোহ-১৯৩০-৩৪তে কল্পনা দত্ত ছাড়াও অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে প্রীতিলতা ওয়াদেদার একটি আকর্ষণীয় চরিত্র। এই দুই মহিলা ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনে চিরস্মরণীয় হওয়া উচিত।

কল্পনা দত্ত যোশী কারাগার থেকে মুক্তি পাবার পর প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে গৃহে সুখভোগ এবং গৃহের বাইরে খ্যাতি সংগ্রহের চেষ্টা করেন নি। উপরন্তু মৃত্যুর কয়েক বছর আগে পর্যন্ত সমস্ত ধরনের গনতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন। চট্টগ্রাম বিদ্রোহ নিয়ে নানা ফিল্ম, নাটক দর্শক অনুগ্রহ পাচ্ছে এটা এই আত্মকেন্দ্রীক পরিমন্ডলে অত্যন্ত সুসংবাদ।

অগ্নিকন্যা কল্পনা

আনন্দময়ী মুখোপাধ্যায়

অধুনা বাংলাদেশের চট্টগ্রামের শ্রীপুরে ব্রিটিশ ভারতের রাজকর্মচারী বিনোদবিহারী দত্তগুপ্তের নিবাস। বাড়ির পরিবেশ মোটেই স্বাধীনতা আন্দোলনের অনুকূল নয়। এ ঘরেই মা শোভনবালার কোল আলো করে এলেন কল্পনা, মায়ের আদরের ডুলু, ১৯১১ সালের ২৭ জুলাই। কিন্তু চট্টগ্রামের বাতাসে ছিল স্বাধীনতার কানাকানি, ঘরে ঘা দেশপ্রেমী-বিপ্লবী, পাহাড়ে-পাহাড়তলিতে। এমনই বাতাবরণে কল্পনা বড় হয়ে উঠলেন অভিজাত পারিবারিক পরিবেশ পেয়েছিলেন কল্পনা, লেখাপড়ার অটল সুযোগ। অত্যন্ত মেধাবী কল্পনার ছিল বই পড়ার নেশা। কানাইলাল, ক্ষুদ্রিকার জীবনী, পথের দাবী ইত্যাদি স্বদেশী বই পড়ে ফেলেন অতি অল্পবয়সে। চট্টগ্রামের দেশপ্রেমের পরিমন্ডলে এইসব বই তাঁর হৃদয়ের গভীরে স্বদেশপ্রেমের বীজ প্রোথিত করেছিল।

চট্টগ্রামের শ্রীপুর স্কুলেই অল্প ও সংস্কৃতে লেটার সহ ম্যাট্রিকুলেশানে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। এবার থামলে চলবে না। উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতার বেধুন কলেজে। এখানে ছিল গুপ্ত রাজনৈতিক বাতাবরণ। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি হয় এই পরিমন্ডলে। কল্যাণী দাশের ছাত্রী সংস্থা নাম লেখালেন কল্পনা। সেই শুরু হল তাঁর পথচল্যা। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দেশমাতাকে ভালবেসেছেন, সেবায় থেকেছেন অকুণ্ঠ।

পাশাপাশি চলেছে তাঁর পড়াশুনা। সারাজীবনই তিনি পড়াশুনা চালিয়ে গেছেন— তা গৃহবন্দী থাকুন আর জেলেই থাকুন।

১৯৩০ সালে ১৮ এপ্রিলে ঘটনা সেসময়ের বিখ্যাত সাহিত্যপত্রিকা 'নায়ক'-এর বিশেষ সংখ্যা। সংবাদপত্রটি নিয়ে সবাই হৈ চৈ শুরু করেছে— চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, টেলিফোন টেলিগ্রাফের অফিস ধ্বংস, রিজার্ভ পুলিশ লাইন অধিকার। প্রতিটি কাজ সুসম্পন্ন করেছে চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবী তরুনদল। তাদের ঘরের ছেলেরা। প্রীতি, কল্পনা দু'জনেই ভাবতে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভাবছে আমাদের জন্মভূমি চট্টগ্রামে এতবড় ঘটনা ঘটে গেল আম-এসময় কলকাতায়— কোনও সাহায্যই করতে পারলাম না।

প্রীতি আর কল্পনা দু'জনেরই মন চলে গেছে চট্টগ্রামের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে। পড়াশুনায় মন আর বসছে না— তাঁরা চট্টগ্রামে গিয়ে বিপ্লবী তরুনদলের সঙ্গে যোগ

দিয়ে প্রত্যক্ষ আন্দোলনে সামিল হবার জন্য মনে মনে তৈরী হতে থাকলেন।

প্রীতিলতা ওয়াদেদার ও কল্পনা দত্ত দু'জনের দেখা বেধুন কলেজে। কল্যাণী দাশের ছাত্রী সংস্থা। দু'জনেই চট্টগ্রামের মেয়ে— একজন শ্রীপুর আর একজন ধলঘাটের। বছর দু'-এক আগে পরে এসেছিল সমমনস্ক দুটি মেয়ে— চট্টগ্রামের দুই অগ্নিকন্যা। মাস্টারদার বিপ্লবী ছায়ায় ঘাসের কর্মকাণ্ড— ঘাসের গড়ে ওঠা।

প্রত্যক্ষ সংগ্রামে মেয়েদের আসা মাস্টারদা পছন্দ করেননি। মেয়েরা অন্তঃপুরে থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহায্য করবে আর তৈরী করবে নতুন নতুন মানুষ, সত্যিকারের দেশপ্রেমী, অদম্য স্বাধীনতা প্রেমী— এমনটাই ইচ্ছা তাঁর। তবু এই দুই কন্যার আগ্রহে তাদের পারদর্শিতার কাছে মাস্টারদা তাঁর সিদ্ধান্ত বদল করতে বাধ্য হন। এদের নিতেই হল বিপ্লবী কাজকর্মে প্রত্যক্ষভাবে। শর্ত ছিল নিজেদের শারীরিক মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে এই গুরুভার বহন করবার জন্যে। কঠোর অনুশীলনের মধ্যে প্রীতি, কল্পনা দু'জনেই ছোরাখেলা, লাঠিখেলা, নানান অস্ত্র-চালনার কৌশল আয়ত্ত করেন। পুরুষের পোশাকে সজ্জদ হতে হবে। রাত-বিরেতে একা চলাফেরা তো করতেই হবে। দেশের কাজে এদের কাছে এসব সামান্যই বোধ হয়েছিল।

কল্পনা ১৯৩১ সালে জানুয়ারী মাস অবধি বেধুন কলেজের ছাত্রী। কল্পনা দত্ত ছুটিতে গিয়েছিলেন চট্টগ্রামে। আর ফেরা হয়নি। চট্টগ্রাম কলেজেই অস্ত্র অনার্স নিয়ে বি.এস.সি.-তে ভর্তি হলেন। এই সময় বিপ্লবী দলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গভীর হয়। বারবার তিনি চট্টগ্রামেই ফিরে যেতে চাইতেন। পরিনত ব্যাসেও দেখি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি ফিরে গেছেন সেই পর্বতসঙ্কুল তাঁর মাতৃভূমিতে-জন্মভূমিতে।

১৯৩১ সালে যখন কল্পনার মাত্র আঠারো বছর বয়স তিনি ডিনামাইট ফাটিয়ে অনন্ত সিংহ ও গনেশ ঘোষকে জেল থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব পান যদিও তার আগেই ধরা পড়ে তাঁকে গৃহবন্দী হতে হয়।

কল্পনার গুপ্ত নাম ছিল রমা। বিপ্লবীদের খবর আদান-প্রদানের জন্য গ্রামের ভিতর দিয়ে যাত্রা করতেন। পুলিশের খাতায় তাঁর নাম উঠে যায়। রাতের অন্ধকারে পুরুষের ছদ্মবেশে কট্টালির গোপন আস্তানায় মাস্টারদা ও নির্মল সেনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য যাবার পথে গ্রেপ্তার হন। ১০৯ ধারায় ডবঘুরে বলে মামলা দায়ের করেছিল পুলিশ। প্রমাণ অভাবে ছাড়া পান। ছাড়া পাওয়ার পর গোপন আস্তানায় থাকার নির্দেশ দেন মাস্টারদা। গোপন অবস্থাতেও কল্পনা পালন করে গেছেন সব নির্দেশ।

প্রীতি আর কল্পনা (তৎকালীন নাম রানী আর ভুলু) দু'জনেরই যৌথভাবে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের কথা হয়। কিন্তু তার সপ্তাহখানেক আগেই পলাতক জীবন শুরু হয় তাঁর।

প্রীতিলতার পরেই কল্পনা চট্টলার জনমানসে ও পুলিশের কর্মচাকর্যে চিত্তার কারণ হয়ে জেগে রইল। কল্পনার রাজকর্মচারী পিতার কাছে কোনও সহানুভূতি পাননি তাঁর এই দেশপ্রেমী জীবনে— তিনি ঢালাও ছকুম দিয়ে রেখেছিলেন ওই মেয়েকে যেখানে পাবে কেটে ফেলবে। কিন্তু ছদ্মবেশী কল্পনার নাগাল পাওয়া সোজা ছিল না। তরুন কিশোর বালকের জামা কাপড়ে কল্পনার কল্পিত মূর্তির বাইরে অন্য উপস্থিতি। মাষ্টারদা তার দায়িত্ব তারকেশ্বর দত্তদারের উপর অর্পণ করেন। পরবর্তীকালে তারকেশ্বরের প্রধানতম কর্মসিদ্দিনী হয়েছিলেন কল্পনা দত্ত। পরম নির্ভরতায় এই পরমপ্রিয় ফুটদার (তারকেশ্বর) সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো চলেছেন, গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তেও তিনি তাঁরই নির্দেশের অপেক্ষা করেছেন।

কল্পনাকে কেন্দ্র করে এক নারী বাহিনীর অভিযান পরিকল্পনা করেছিলেন মাষ্টারদা প্রীতির স্থানটি পূর্ণ করতে। কিন্তু সেই বাহিনী গঠন করতে যোগ্য ব্যক্তির অভাব বোধ করেছিলেন তিনি। এরকম পরিস্থিতিতে কল্পনার হঠাৎ অন্তর্ধানের পর অন্যান্য সন্দেহভাজন মেয়েদের গতিবিধির উপর পুলিশের নজর বেড়ে যায়। পুরুষ বেশে মালকোচা মারা খুতি, হাফসার্ট কল্পনার ঋজু দেহে সুন্দর মানাত, পূর্ব পরিচিতরাও সে ছদ্মবেশে বিভ্রান্ত হতো।

কুন্দপ্রভা, নির্মলা চক্রবর্তী, সুহাসিনী রকিত, নিরুপমা বড়ুয়া, বকুল দত্তদের আগ্রহে একদিন রাতে ছনরা গ্রামে দত্তদের দশভূজা বাড়িতে এক বৈঠক হয়। এই বৈঠক নেতা সূর্য সেন উপস্থিত হয়ে মেয়েদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই নারীবাহিনীর প্রধান ছিলেন কল্পনা দত্ত।

কিছুকাল ধরে মাষ্টারদা গৈরলা গ্রামের আশ্রয়কেন্দ্রে ছিলেন— কল্পনা মাষ্টারদার সাথে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করে ভারী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। এই গ্রামে গরীব গৃহস্থ বিশ্বাসীদের বাড়ির আশ্রয়ে ছিলেন। এঁদের অয়ের ভার নিয়েছিলেন বিপ্লবী নিষ্ঠাবান দেশকর্মী ব্রজেন সেনের বউদি নেত্র সেনের স্ত্রী। মাষ্টারদার মাথার দাম তখন দশহাজার টাকা।

১৯৩৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারী অর্থলোভী নেত্র সেনের প্ররোচনায় মাষ্টারদা গ্রেপ্তার হন। কল্পনা দুর্যোগ পেরিয়ে পালাতে সক্ষম হন।

চট্টলার নির্জন কারাকক্ষে মাষ্টারদার দুসহ দুঃখের মধ্যেও তাঁর পরিকল্পিত অসমাপ্ত কর্মকাণ্ড টেনে নিয়ে চলেছেন কল্পনা, সঙ্গী মহেন্দ্র, বিনোদ। নেতা তারকেশ্বর। মাষ্টারদার সাথে জেলের ভেতরেও যোগাযোগ সূত্র তৈরী— সূর্য সেনকে জেলের বাইরে আনার জন্য গভীর পরিকল্পনা শুরু হল— খুব সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে জেলের ভেতর সুখেন্দু দত্ত ও অমূল্য বিশ্বাসের সহায়তায়, সবচেয়ে তৎপর কর্মী তারকেশ্বর ও সহকারী কল্পনা। ২০/৩/৩৩ তারিখে এই পরিকল্পনা মোড় ঘুরে গেল, পরিকল্পনা গতি সাফল্যের কাছে এসেও বিফল হল।

প্রায় দু'মাস পর ১৮/৫/৩৩ তারকেশ্বর, কল্পনা গুপ্তকেন্দ্রে নতুন কর্মোদ্যোগের কথা ভাবছেন এমন সময় ২৪/২৫ জন পুলিশ মিলিটারি ঘিরে ফেলে তালুকদারের বাড়ি। তারকেশ্বর ও কল্পনা এই বিশাল বাহিনীর সাথে লড়াই সম্ভব নয় বোধ করে অনন্যোপায় হয়ে আত্মসমর্পণ করেন। প্রথমে কল্পনা পরে তারকেশ্বর।

মাষ্টারদা তারকেশ্বর ও কল্পনা দত্তের বিচার প্রহসন সতর্ক প্রহরায় সমাধা হয়। মাষ্টারদা ও তারকেশ্বর দত্তদারের ফাসির ছকুম হয়। কল্পনা দত্তের জন্য যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ধার্য হয়।

ব্রিটিশ সরকার শেষ পর্যন্ত দ্বীপান্তরে পাঠাতে পারেনি কল্পনাকে। কারাদণ্ডই হয়েছিল। যারা উদ্ভ্রাম দামাল তাঁদের শক্ত করে বেঁধে রাখতে হয়— তাই অন্য মহিলা বন্দীদের মুক্তি দিলেও ব্রিটিশ সরকার তখনও তাঁকে আটকে রাখে। ছয় বছর ধরে তিনি বন্দী জীবনযাপন করেন।

জেলে থাকতে তিনি গভীর পড়াশুনার মগ্ন হন। ধীরে ধীরে কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হন। জেল থেকে মুক্ত হয়ে দেখলেন তাঁর আন্দোলনের সঙ্গীরা অনেকেই যোগ দিয়েছে কমিউনিস্ট পার্টিতে। পুরোনো সহকর্মীদের অনুপ্রেরণায় শেষ পর্যন্ত তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

দেশের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে কল্পনা কাঁপিয়ে পড়েছেন। উদ্ধারের কাজে। কল্পনা দত্ত দেশমাতৃকাকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে উদ্ধার করতে যেমন ছিলেন অনলস তেমনই

মায়ের সন্তানদের পরিব্রাজনের কাজেও ছিল না তাঁর কোনও ভয় ভীতি কুণ্ঠা। দুর্ভিক্ষের পর চট্টগ্রামের প্রতিনিধি হয়ে যান বোম্বাই-এ। সেখানে পরিচিত হয় পি.সি. যোশির সাথে। ক্রমশ আকৃষ্ট হলেন পূর্ণ চাঁদ যোশির প্রতি। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন ১৯৪৩ সালে। তারপরেও চট্টগ্রামে থেকে কাজ করেছেন। দেশভাগ হয়ে যাওয়ার পর তিনি চট্টগ্রামে থেকে যান। পরবর্তী সময়ে দিল্লিতেই থাকতেন। সেখানে নারী আন্দোলনের অগ্রণী ভূমিকা নেন। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের মৈত্রী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। চট্টগ্রাম অভ্যুত্থান নিয়ে নানা বই লিখেছেন। সংগ্রাম ছিল তাঁর ধর্মনীতি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মানুষের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর সেই সংগ্রাম কখনও ব্যর্থ হতে পারে না। কল্পনার অতুলনীয় কর্মকুশলতা অনন্তকাল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে লেখা থাকবে।

জন্মের শতবর্ষে তাঁর প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা।

রোকেয়া, বোরকা ও আফগান নারী

ফরিদা আখতার

ভাষান্তর - উৎসাহ আহমেদ

৯ই ডিসেম্বর রোকেয়া দিবস। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জন্ম ও মৃত্যু দিবস একই সাথে পালনের দিন। রোকেয়ার জন্ম সাল (১৮৮০) জানা থাকলেও তার দিনক্ষণ জানা নাই। কিন্তু যখন তাঁর মৃত্যু হয় তখন তিনি নারী জাগরণের একজন পথিকৃত হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাই তাঁর মৃত্যুর তারিখ ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর আজ সকলেরই জানা। অবশ্য রোকেয়া খুবই কম বয়সে, মাত্র ৫২ বছর, মৃত্যুবরণ করেছেন। এই স্বল্পকালীন জীবনের মধ্যেও রোকেয়া শতাব্দির কাজ করে রেখেছেন। আমরা এক শতাব্দি ছেড়ে আর এক শতাব্দিতে এসেও রোকেয়ার কাজের গুরুত্ব যেন আরো বেশি করে উপলব্ধি করছি।

এখন রোকেয়ার জন্ম-মৃত্যু দিবস একই দিন পালনের এই উদ্যোগে সকলেই মেনে নিয়েছে। রোকেয়ার প্রকৃত মূল্যায়নই আমাদের কাম্য। এতে যেন কোন কমতি না হয়।

এবারের রোকেয়া দিবস সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে তাঁর বিভিন্ন মূল্যবান রচনার মধ্যে বোরকা লেখাটি আমার বারে বারে মনে পড়ছে। আফগানিস্তানের গ্রন্থ যখনই আসে তখন দেখা যায় আফগান নারীদের ব্যাপারে পশ্চিমা বিশ্বের আগ্রহ খুবই বেশি। মার্কিন রোমা হামলার পর যেদিন প্রথম কাবুলের পতন ঘটলো এবং নর্দান এলিয়েন্স কাবুল দখল করলো তখন বিশ্বের সকলের দৃষ্টি ছিল আফগান নারীদের মুখ দেখা যায় কি না। বিবিসি ও সিএনএন বারে বারে মহিলাদের খোঁজ করেছে। শেষে তারা দেখালো আফগান নারীর অবগুষ্ঠনমুক্ত চেহারা। ভাবখানা এমন, আহ কি সুন্দর। আফগান নারীদের কালো বোরকার ভেতর থেকে তাদের মুখখানা দেখার জন্যে কাতর পশ্চিম বিশ্ব। যখন একটি দুটি মুখ দেখা গেলো এটাকে বিশাল ব্যাপার হিসাবে ফলাও করে বারে বারে প্রচার করা হোল। বিদেশে অবস্থানরত আফগান নারীদের সাক্ষাতকার নেয়া হোল তারা এমন কি চায়, তারা কেমন খুশি ইত্যাদি কথা জানার জন্যে। সুখের কথা বিদেশে অবস্থানরত সকল আফগান নারী কিন্তু পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমের হাতে নিজেদের তেমন করে সঁপে দেন নি। তাঁরা বলেছেন, “তালিবানরা”* তাদের ওপর নিপীড়ন করেছেন ঠিকই কিন্তু পশ্চিমা মদদপুষ্ট নর্দান এলিয়েন্স এখন তাদের কজা করবে, এটা কোনোমতেই তাঁদের কাছে কাম্য নয়। পশ্চিমা প্রচার মাধ্যম যেভাবে আফগান নারীদের জন্যে মারাকামা দেখায় তার মধ্য দিয়ে তারা তাদের যুদ্ধবাজ কার্যকলাপকে ন্যায্য করতে চায়। তারা যেন বা নারীমুক্তির জন্যে ক্লাস্টার বোমা নিক্ষেপ করেছে! আফগানিস্তানের নারী সংগঠন ব্রাওয়ার পরিচর্যা জানিয়ে দিয়েছে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করতে চান। তাঁরা কারো খবরদারি চান না।

কবুল সামগ্রি নিয়ে। মার্কিন মহিলাদের শরীর থেকে চর্বি সরিয়ে তাঁকে সুন্দর হাতে হাবে, এটাই এখন সেই সমাজের চাহিদা। ছায়াছবি, বিজ্ঞাপন, ফ্যাশন পত্রিকা যেখানেই দেখেন না কেন, হাড় জিরাজিরে মার্কিন নারীর সৌন্দর্যই এখন একমাত্র গ্রহণযোগ্য। জোরান এবং জ্যান্ডুলিনের মতো মার্কিন নারীদের মেরদণ্ড ভেসে যাচ্ছে। বিজ্ঞাপনে তাঁদের হাতে মল এবং সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে কোটি ডলারের ফকসা হচ্ছে। মার্কিন মহিলারা বছরে ৩০০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেন শুধুমাত্র শরীরকে চিকন করার জন্যে। পর্নোগ্রাফি ইন্ডাস্ট্রির বাৎসরিক আয় ৫৬ বিলিয়ন ডলার। টাকার অঙ্কে হিসাব করে দেখলে বোকা যাবে কত বিশাল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে। জোরান এবং জ্যান্ডুলিন বলছেন তাহলে দূরদেশের “তালিবানরা” নারীদের বোরকা পরাচ্ছে বলে চোঁচামেচি করার আগে নিজ দেশের নারীকে বিকিনি পরিয়ে কী সর্বনাশ করছে তা দেখা দরকার।

নারীকে সুন্দর দেখাবার নাম করে কর্পোরেট ব্যবসা কি এখন অন্য দেশেও নেই? রাজ্য রাজ্য বিজ্ঞাপন দেখি মোটা শরীর চিকন করা হয়। বোকানো হয় এটা সুন্দর হওয়ার জন্যে জরুরী। নারীর ফর্সা হওয়াটাও জরুরী। তাই কোয়ার এন্ড লাভলী আজ মরে ধরে ব্যবহার হচ্ছে। ভরসা দেয়া হচ্ছে তাহলে রাজকুমার এসে বিয়ে করবে। এটাই কি নারীমুক্তি? এর জন্যে কি আমরা এতোদিন লড়াই সংগ্রাম করেছি? রোকেয়া কি আমাদের সেই শিক্ষা দিয়েছেন? এখন আমরা আধুনিক হতে চাই কিন্তু আধুনিকতার সাথে মুক্তি কতখানি আসছে তা যাচাই করে দেখছি না। নিথো বিতর্ক করছি বোরকা ভাল, না উলস থাকা দরকার। যেন বা শরীর থেকে কাপড় সরালেই মুক্তি আসে।

শেষ কথা হচ্ছে, কোন পর্দা অন্যায়ভাবে এবং জোর করে চাপিয়ে দেয়া আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ধর্মের নামে কিবা অন্য যেকোনো যুক্তিতে নারীর ওপর এই শাসন আর চলবে না। কিন্তু একই সাথে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে, অনেকটা ব্রেন ওয়াশ বা মগজ খোলাইয়ের মাধ্যমে ব্যবসার ঝামে পড়ে নারীর নিজের শরীরের ওপর অত্যাচার করাও কোনো মুক্ত মনের লক্ষণ নয়। এটা বুঝতে হবে প্রচার মাধ্যম আরোপিত সৌন্দর্য এবং ‘মুক্তি’ সত্যিকারের মুক্তি নয়। নারীর সবচেয়ে জরুরী কাজ হচ্ছে মনের দাসত্ব থেকে মুক্তি। সমাজের পুরুষতান্ত্রিক বেভাজল ভেসে দেয়া। নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা। রোকেয়ার কথা যদি মনে রাখি তাহলে শুধু এতটুকু মুকলেই হবে।

* তালিবী - Taliban শব্দটির প্রকৃত উচ্চারণ। (ইংরেজী বর্ণমালায় ‘৩’ বর্ণটি নেই)। আরবী ভাষায় তালিবী শব্দের অর্থ বিনাশী যা কোন মতেই নিন্দার্থক নয়। পশ্চিমী প্রচার মাধ্যমের অজ্ঞতা মিশ্রিত শব্দতানির নমুনা মাত্র।

আলোকের দূতী রোকেয়া

(১৯৯৪ রোকেয়া বাবিকীতে রোকেয়া স্মারক বক্তৃতা হিসাবে পঠিত)

রেজাউল হক

নারী স্বাধীনতা ও নারী-স্বাধিকার প্রচেষ্টাকে ইসলাম শুধুমাত্র অনুমোদনই দেয়নি বরং উৎসাহ যুগিয়েছে। দুর্লভপ্রাপ্ত মুসলিম নারীদের বর্তমানে দুর্লভ হা দেবে অনুসন্ধানীদের কথাটা মানতে কষ্ট হবে। ততোধিক আঁতকে উঠবেন মুসলিম সমাজের I.S.I. (ইসলাম স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউট) ছাপ মারা অভিভাবকগণ। সাক্ষা প্রমাণ হাজির করে অনুসন্ধানীদের অসিধাস যদিও বা দূর করা যায়, মাতব্বরদের টপানো যাবে না কিয়ুতাই কেননা অনুসন্ধানীদের শুধু জানতে হবে—আর মুসলিমদের হবে মানতে। আর বলাই বাহুল্য, জানা নয়, মানাই বস্তু।

সপ্তম শতাব্দীতে সারা পৃথিবীতে নারী কিরূপ নির্ধারিত ছিলেন, একথা বোকার জন্য বেশী কাঠ বড় পোড়ানোর প্রয়োজন নেই। বিশেষভাবে প্রাক ইসলামী আরব সমাজের নারীর প্রতি মনঃসংযোগ এখ চরমে পৌঁছেছিল যে, কন্যা সন্তান জন্মানের পর তাকে জীবন্ত কবর দেওয়া হত। ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর সেই অবহেলিত নারীর স্বীয় অধিকার রক্ষার ব্যাপারে এত সচেতন হয়ে উঠেছিলেন যে, তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার সামান্য সত্তাবনা দেখা দিলেই তারা প্রতিবাদী হয়ে উঠতেন। সামান্য সময়ের ব্যবধানে অবস্থার এই আমূল পরিবর্তনকে বৈশ্ববিক বলতে বাধা নেই। কোন তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে শুধুমাত্র একটি দৃষ্টান্ত দিলেই এই বৈশ্ববিক পরিবর্তনের অংকার ও প্রকার স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

“একলা ওমর ফারুক রাষ্ট্রদ্রোহের নিষেধে উঠিয়া, উপস্থিত মুহলমলগণকে অধিক পরিমাণ মোহর নির্ধারণ করিতে কঠোরভাবে নিষেধ করেন। সঙ্গে সঙ্গে যোদ্ধা করেন যে, অতঃপর কেহ চারিশত দেহহামের অধিক মোহর দিলে, আমি সেই অতিরিক্ত টাকা বাজেয়াপ্ত করিয়া নিব এবং তাহা মুহলমলগণের ব্যয়ভূতমানে দাখিল করিয়া দিব।” খোহরা শেষ করিয়া নীচে নামার সঙ্গে সঙ্গে একজন স্ত্রীলোক তাঁহার সম্মুখীন হইয়া বলিলেন।

‘অমীরুল মুমেনীন। আপনি এই অন্যায় নির্দেশ দিলেন কি করিয়া?’

‘কেন অনার্টা কোথায় হইল?’

‘অন্যায় নয়। আল্লাহ নারীদিগকে যাহা দিয়েছেন আপনি তাহা কাড়িয়া নিতে চাহিতেছেন?’

‘নারীদিগকে কোন অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলাম?’

দেখুন খলিফা, আল্লাহ বলিতেছেন “স্ত্রীদিগকে কেন্দ্রীয় যা স্থাপ পরিমাণ স্বর্ণ ও মোহর হিসাবে প্রদান কর।” সুতরাং স্ত্রীদিগকে ক্ষুণ্ণীকৃত স্বর্ণ মোহর দেওয়ার স্পষ্ট অনুমতি আল্লাহর কণ্ঠস্বর হইতে পাওয়া যাইতেছে। অঞ্চল আপনি মোহরের উচ্চতর পরিমাণ বাধিয়া দিতেছেন

মাত্র চরিশত দেহহামে।”

‘ঠিক কথা মহিলা, ওমর অসঙ্গত নির্দেশ দিয়েছিল, আর তুমি তাহা সংশোধন করিয়া দিলে। দেখিতেছি মদিনার নারীরাও ওমর অপেক্ষা বেশি অভিজ্ঞ।’

উপরোক্ত ঘটনাটি উদ্ধৃত করার পর মণ্ডলানা আবরাম খাঁ মন্তব্য করেছেন—‘প্রাক ইসলামী যুগে আরবের নারী সমাজের মর্যাদা শূণ্যাল কুকুর অপেক্ষা কোন অংশেই ভাল ছিল না—। সেই সমাজের একজন নারী নিকীক মনে দৃঢ় ভাষায় প্রকাশ্য জন সম্মেলনে প্রতিবাদ করিতেছেন—প্রবল প্রতাপাধিত খলিফা, মোহলেম জাহানের প্রধানতম অমীর, হযরত ওমর, অর্থপৃথিবী যাহার নামে কম্পিত হইত—সেই ওমর নিরীহ শিশুর ন্যায় নারীর প্রতিবাদ শ্রবণ করিতেছেন, সেই নারীর মহিমা কীর্তন করিতেছেন আবার মিশরে আরোহণ করিয়া নিজের ক্রটি স্বীকার করিতেছেন, নিজের পূর্ব নির্দেশ বাতিল করিয়া দিতেছেন। কিন্তু হায় আজ চন্দ্র সূর্যের প্রদীপ নিয়া মোহলেম জাহানের দিকে দিকে সন্ধান করিয়া দেখ। কুহাপি এই আদর্শের সামান্য একটু আভাসও খুজিয়া পাইবে না।’

আবরাম খাঁর এই আক্ষেপের অনুরণন শুনি সম-সময়ের এক নারী কণ্ঠে, “এই বিশাল জগতে কোন দেশ, কোন জাতি, কোন ধর্ম নারীকে কিছুমাত্র অধিকার দান করা দূরে থাকুক, নারীর আত্মাকেও স্বীকার করে নাই। একমাত্র ইসলাম ধর্মই নারীকে তাহার প্রাপ্য অধিকার দান করিয়াছে; কিন্তু ভারতবর্ষে সেই মুসলিম নারীর দুর্দশার একশেষ হইয়াছে।” সপ্তম শতাব্দীর সেই বেদুইন নারীর ন্যায় সমাজের অনিয়োজিত অভিভাবকদের প্রবল ক্রকটিকে উপেক্ষা করে তিনি তেজোদীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, “পাঠিকগণ আপনারা কি কোনদিন আপনাদের দুর্দশার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? এই বিংশ শতাব্দীর সভ্য জগতে আমরা কি? দাসী। পৃথিবী হইতে দাস ব্যবসা উঠিয়া গিয়াছে শুনিতে পাই, কিন্তু আমাদের দাসত্ব গিয়াছে কি? আমরা দাসী কেন? কারণ আছে।

আমাদের যথাসম্ভব অধঃপতন হওয়ার পর দাসত্বের বিরুদ্ধে কখনও মাথা তুলিতে পারি নাই; তাহার প্রধান কারণ এই বোধ হয় যে, যখনই কোন ভদ্রী মন্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন, অমনই ধর্মের সোহাই বা শাস্ত্রের বচনরূপে অস্ত্রাঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে। আমরা প্রথমতঃ যাহা সহজে মানি নাই, তাহা পরে ধর্মের আদেশ ভাবিয়া শিরোধার্য করিয়াছি। ...”

গত শতাব্দীর শেষপাদে এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালী অস্বর্ষস্পর্শা হিন্দু রমণীরা মুক্ত না হলেও তাদের বন্ধন শিথিল হতে শুরু করেছে। প্রতিবেশী মুসলিম নারীদের ক্ষেত্রে এই বন্ধন তখনও অটুট। অবরোধের বদ্ধ অঙ্কুরে তাদের “নারীকন্ডের উচ্চবুদ্ধিগুলি অন্ধুরে বিনষ্ট হওয়ার, নারীর অন্তর, বাহির, মস্তিষ্ক, হৃদয় সবই ‘দাসী’ হইয়া পড়িয়াছে।” যখন তাদের “স্বাধীনতা ও ওজস্বিতা বলিয়া কোন বন্ধন নাই—এবং তাহা লাভ করিবার প্রবৃত্তি পর্যন্ত লক্ষিত হয় না”— আলোকের দূতী বেগম রোকেয়া—মিসেস রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন—মুস্তফা আকাখা সৃষ্টি করলেন অবরোধবাসিনী নারীদের মধ্যে। “সমাজ মহাগোলযোগ বাধাইবে”

জেনেও তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কেননা, “সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত আগিতে হইবেই।”

এই মহীয়সী নারীর সামগ্রিক কীর্তি বিচার করে মোহিতলাল মজুমদার না বলে পারেন না, “বাংলার মুসলিম সমাজ এখনও যে যুগে চলিতেছে, হিন্দু সমাজের সেই যুগে একজন নারীর জীবন ও চরিত্রে এমন শক্তি ও সাহস, এমন নিষ্ঠা ও সত্য-নিপাঙ্গা বিরল ছিল বলিয়া মনে হয়। ... একালে হিন্দু সমাজেও এমন নারী চরিত্র বিরল।” রোকেয়ার কর্ম ও চিন্তার সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের পর আমরা মানতে বাধ্য হব, কবির এই মন্তব্য এমনকি আজকের বিশ্বব্যাপী নারী আন্দোলনের যুগেও সত্য।

১৯০৪ সালে ‘নবনূর’ পত্রিকার ‘আমাদের অবনতি’ শীর্ষক প্রবন্ধের মধ্যমে তাঁর বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশ ঘটে। তাঁর সমকালে বিরল মনন ও প্রজ্ঞা এবং সাহসের পরিচয় মেলে এই বলিষ্ঠ উচ্চারণে—

“আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ এই ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। পুরাকালে যে ব্যক্তি প্রতিভা বলে দর্শনের মাধ্যমে পরিচিত হইয়াছেন, তিনিই আপনাকে সেবতা কিংবা ঈশ্বর প্রেরিত দূত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।” ...

তবেই দেখিতেছেন, এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষ-রচিত বিধি ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুনিদের বিধান যে কথ্য শুনিতে পান, কোন স্ত্রী মুনির বিধানে হয়ত তাহার বিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতেন। ... যাহা হউক ধর্মগ্রন্থ সমূহ ঈশ্বর প্রেরিত কিনা তাহা কেহই নিশ্চয় বলিতে পারে না। ঈশ্বর যদি কোন দূত রমণী শাসনের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেন, তবে সে দূত বোধ হয় কেবল এশিয়ার সীমাবদ্ধ থাকিতেন না। যাহা হউক এখন আমাদের আর ধর্মের নামে নত মস্তকে নরের অবস্থা প্রভুত্ব সত্য করা উচিত নহে।” ...

সত্য এমন সরল আর বলিষ্ঠভাবে আর কোনও বঙ্গ-রমণীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়নি। “পুরুষের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ-ভিন্ন নহে—একই; তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই,” একথা যিনি বলতে পারেন, তাঁর বলিষ্ঠতা কখনও পুরুষ বিদ্বেষে পরিণত হতে পারে না। তাঁর ভাষায়, “আমি কোথাও স্বাতন্ত্র্যের প্রতি কটু শব্দ ব্যবহার করি নাই। ... কেবল রমণী হৃদয়ের ক্ষত দেখাইয়াছি। ঐ যে কথায় বলে ‘বলিতে আপন দুঃখ পরিনিদ্রা হয়;’ ... ভদ্রীর দুঃখ বর্ণনা করিতে শ্রান্তিনিদ্রা হইয়া পড়িয়াছে।” বিদ্বেষের অঙ্ক আবেগ নয়। নির্মোহ সমাজ বিজ্ঞানীর মুক্ত দৃষ্টিতে তিনি নারী জাতির অবনতির কারণ খোঁজেন, “পুরাকালে যখন সভ্যতা ছিল না, সমাজ বন্ধন ছিল না, তখন আমরা একগুপ দাসী ছিলাম না। মানুষ যেমন ক্রমে সভ্য হইয়াছে, গায়ে রঙ মাখা ছাড়িয়া কাপড় পরিতে শিখিয়াছে। তেমনই ক্রমেই বাহ্যবলে ও বুদ্ধি কৌশলে নারী জাতির উপর আধিপত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঈশ্বর এমন পক্ষপাতী নহেন যে, এক জাতিকে অন্য জাতির অধীন করিবেন। যে সমাজ রাজা ও প্রজার সৃষ্টি করিয়াছে, পুলিশ প্রভু ও বড় লাট প্রভুর মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করিয়াছে, সেই সমাজ নারীকে নরের অধীন করিয়াছে।”

এই যুক্তিনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মানসিকতা তিনি কিভাবে অর্জন করলেন— তা বুঝতে হলে তাঁর বেড়ে ওঠার কাহিনী জানা দরকার। যে কালে তিনি জন্মেছিলেন তখন তাঁর পক্ষে স্কুল, কলেজের শিক্ষা গ্রহণের কোন সুযোগ ছিল না। বাঙালী তথা ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা-প্রচলন তো দূরের কথা, এর প্রতি বিরূপতাই কাটেনি। সেই ঘোর অন্ধকার যুগে তিনি জন্মেছিলেন অধুনা বাংলাদেশের রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে। পিতা জহীর মোহাম্মদ আবু আলী সাবের অত্যন্ত রক্ষণশীল মানুষ ছিলেন। আরবী, ফার্সী ও উর্দু শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হলেও তিনি কন্যাদের বাংলা, ইংরাজী শিক্ষার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। নিজ কন্যাদের কঠোর পরী রাখার ব্যাপারে তিনি যত সতর্ক ছিলেন, তাদের লেখা পড়ার ব্যাপারে ছিলেন ঠিক ততটাই উদাসীন। “অবরোধ বাসিনী”র ২৩ সংখ্যক ঘটনায় এবং “নার্স নেলী” গল্পে তিনি তাঁদের পারিবারিক পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন।

মিসি করিমুন্নেসা ও দাদা ইব্রাহিম সাবেরের উৎসাহ ও প্রেরণার রোকেয়া বাড়িতে বাংলা, ইংরাজী চর্চা করতে পেরেছিলেন। মিসি করিমুন্নেসা তাঁর স্বপ্নের বাড়িতে মেম সাহাবের কাছে রোকেয়ার পড়ার ব্যবস্থা করেন—কিন্তু তাঁর পিতা জানতে পেরে কন্যাকে কলকাতা থেকে নিজ বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। বাড়িতে দাদা ইব্রাহিমের সাহায্যে গোপনে তাঁর বিদ্যাচর্চা অব্যাহত ছিল।

সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে বিবাহের পর শিক্ষা-চর্চার যাবতীয় বাধা অপসারিত হল এবং লেখক হিসাবে রোকেয়ার আত্মপ্রকাশ ঘটল। সাখাওয়াত স্ত্রী শিক্ষার পক্ষপাতি ছিলেন। তাঁর প্রেরণা ও উৎসাহে রোকেয়ার আধুনিক জ্ঞান চর্চার সুযোগ ঘটে। সুতরাং প্রথা গত শিক্ষা তিনি পেলেও, নিজ অধ্যাবসায়ের বলে তিনি যথার্থ অর্থেই একজন স্ব-শিক্ষিত মানুষ। তিনি নিজেই বলেছেন, “পাশ করা কন্যাকে” প্রকৃত শিক্ষা বলি না” শিক্ষার সংজ্ঞা দিয়েছেন তিনি এই ভাবে, “ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা দিয়াছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি করাই শিক্ষা।” T. S. Eliot যাকে universal intelligence বলেছেন। তার জেরেই ‘সাধারণের সহজ বুদ্ধিতে যাহা বুঝা যায়’ তাই বলতে পেরেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন, “একটি আত্মার পতন দর্শনে মহাত্মা নিউটন যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, সে জ্ঞান তৎকালীন কোন পুস্তকে ছিল না।” তিনিও তরুণ অদম্য জিজ্ঞাসা নিয়ে সহজ বুদ্ধিতে নারীজাতির অবনতি ও তার কারণ সন্ধান করতে চেয়েছেন। নারী মুক্তি প্রশ্নে যে সমস্যাগুলি আজকেও আলোচিত হচ্ছে, সেই সমস্যাগুলি তাঁর চোখেও ধরা পড়েছিল। নারী আন্দোলনের বর্তমান আলোচ্য বিষয়গুলির সঙ্গে যারা সম্যক পরিচিত, রোকেয়া রচনাবলী পাঠ পরলেই তারা অবহিত হবেন। আজকের মূল্যবোধ নিয়ে যদি আমরা তাঁর চিন্তাকে বিশ্লেষণ করি তবে অনেক ক্ষেত্রেই তাকে আপোষকারী মনে হতে পারে। আজকের নারীবাদীদের তুলনায় তাঁর চিন্তা ভাবনার অসঙ্গতি এবং সঙ্কটের অভাব ধরা পড়তে পারে। কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না যে কোন মহৎ প্রতিভার মত স্ববিরোধিতা তাঁর ক্ষেত্রেও অনিবার্য। রোকেয়ার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই সহজ সত্যগুলি বিস্মৃত হন বলেই আজকের চোখ নিয়ে বিচার করতে গিয়ে তাঁর মধ্যে অসঙ্গতি খুঁজে

পান। আবিষ্কার করেন ঐতিহ্যের সঙ্গে আপোষ। কিংবা সমসাময়িক প্রেক্ষাপট বহির্ভূতভাবে এবং তাঁর সামগ্রিক চিন্তা ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন ভাবে, নিজে প্রয়োজন ও খুশিমত ব্যাখ্যা করেন। ধর্মীয় কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে, মানবিক প্রজ্ঞার প্রয়োগ তিনিও করেন। “আমরা-ধর্ম গ্রন্থের কোন মতামত লইয়া আলোচনা করিব না — কেবল সহজ বুদ্ধিতে যাহা বুঝা যায়, তাহাই বলিব। অর্থাৎ স্বকীয় মত ব্যক্ত করিতেছি মাত্র।” কিন্তু আমরা জানি নারী মুক্তি যাবতীয় প্রশ্নের সাক্ষ্য প্রমাণ তিনি ইসলামীয় ঐতিহ্যের মধ্যে সন্ধান করেছিলেন। তাঁর সময়ের প্রেক্ষাপটে বিচার করলে বলতে হয়, তিনি বাস্তব বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছেন। প্রায় সমসাময়িক কাসিম আমিনের (১৮৬৫-০৪) সঙ্গে তুলনা করলে, তাঁর এই বাস্তব বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। মুফতি মোহাম্মদ আবদুহর এই অনুগামী চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে যে তিনি অবহিত ছিলেন তা বলা যায়—কেননা নারী মুক্তি প্রশ্নে বিশ্বব্যাপী বিশেষত মুসলিম জগতের আন্দোলনের প্রতি অনুসন্ধিৎসার পরিচয় আমরা তাঁর রচনাবলীতে পাই। ইসলামী ঐতিহ্য পরিভাষ্য করে তিনি ইউরোপীয় আদর্শের অনুকরণের কথা বলেছিলেন। ফলে তাঁর নারী মুক্তি আন্দোলন কোন স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে নি। রোকেয়াও যদি তাই করতেন—তবে তিনিও ব্যর্থ হতেন। শাস্ত্রে নারী স্বাধীনতার যে সীমিত স্বীকৃতিটুকু আছে—যার পরিচয় বক্তব্যের শুরুতেই দেওয়া হয়েছে—তাকেই পাখের করে তিনি সামনে চলেছেন। ধর্মীয় প্রভাবে আজ্ঞার একটি সমাজে, স্বধর্ম নিষ্ঠা তার পক্ষে অনিবার্য ছিল।

কিন্তু এই স্বধর্ম নিষ্ঠা কখনও তাকে সাম্প্রদায়িক করে তোলেনি। তিনি পন্থারূপ উপন্যাসের ‘নিকেনন’ অংশে তিনি বলেছেন, “ধর্ম একটি ত্রিভুজ আট্টালিকার ন্যায়। নীচের তলে অনেক কামরা, হিন্দু-ব্রাহ্মণ, শূদ্র ইত্যাদি বিভিন্ন শাখা; মুসলমান, —শিয়া, সুন্নি, হানফী, সাফী প্রভৃতি নানা-সম্প্রদায় এরূপ বৃক্ষান, —রোমান, ক্যাথলিক, প্রোটেষ্ট্যান্ট ইত্যাদি। তাহার উপর দিতলে দেখ, কেবল মুসলমান, —সবই মুসলমান; হিন্দু—সবই হিন্দু, ইত্যাদি। তাহার উপর ত্রিভুজে উঠিয়া দেখ, একটি কক্ষ মাত্র, কামরা বিভাগ নাই, অর্থাৎ মুসলমান, হিন্দু কিছুই নাই সকলে এক প্রকার মানুষ এবং উপাস্য। কেবল এক আল্লাহ। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উদ্দেশ্য কালে এই উদার মানবিক দৃষ্টিতে ধর্মের ব্যাখ্যা প্রায় বিরল। মন্তলানা আজাদের কোরানের ভাষা যারা পড়েছেন তারা ধর্মের অনুরূপ ব্যাখ্যা পাবেন। তাঁর কালে বিরল অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা ছিল বলেই, জনৈক হিন্দু লেখক হিন্দু নারীদের উচ্চ অবস্থান প্রমাণ করতে গিয়ে যখন বলেন, “ভারতে হিন্দুর আরাধ্য দেবতা নারী, তাহারা নারীরই উপাসক,” তার উত্তরে তিনি বলতে পারেন, “বেশ। বলি হিন্দুর আরাধ্য দেবতা কোন জিনিসটি নহে? পূজনীয় বস্তু বলিতে চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ-ইহার কোন পদার্থটি বাদ দেওয়া যায়? হনুমান এবং গো-জাতিও কি উপাস্য দেবতা নহে? তাই বলিয়া কি ঐ সকল পুস্তকে তাহাদের ‘উপাসক মানুষ’ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়া থাকে?” একথা বলার পর একবারও মনে হয় না যে তিনি স্বধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করার জন্য প্রতিযোগী একটি ধর্মের ত্রুটি নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন—যা সে সময় ভারতবর্ষে খুবই চালু ছিল। নির্যাতিতা নারী সমাজের স্বাভাবিক মুখপাত্রের অধিকার

বলেই তিনি অপর একটি ধর্মের সমালোচনা করতে পারেন। তাঁর সহজবুদ্ধিতে তিনি বুঝেছিলেন যে সাম্প্রদায়িকতার সবচেয়ে বড়ো শিকার মেয়েরাই। তিনি জানতেন বিশেষ কোন এলাকার নারীদের আপাতভাবে যতই স্বাধীন মনে হোক পৃথিবীতে এমন কোনদেশ নাই, এমন কোন জাতি নাই যেখানে নারীরা মুক্ত হয়েছে। “ডেলিশিয়া হত্যা” নামক একটি রচনায় তিনি বলছেন, “দূরের ঢোল শুনিতে শ্রুতি মধুর। সভ্যতা ও স্বাধীনতার লীলাভূমি লণ্ডন নগরীতে শত শত ‘ডেলিশিয়া বধকাব্য’ নিত্য অভিনীত হয়। হায়! রমণী পৃথিবীর সর্বত্রই অবলা।”

কিন্তু মুসলিম নারীর যত্না তাকে বিদ্ধ করেছে সব থেকে—এ যত্না তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ছিল। মুসলিম নারীর পশ্চাদগামীতা সামগ্রিকভাবে মুসলিম নারী-পুরুষের পশ্চাদগামীতা থেকে আলাদা করে দেখা যায় না—এটা তিনি তাঁর প্রথম বক্তৃতা থেকে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই সামগ্রিকভাবে মুসলিম সমাজের বিকাশের ভাবনাটিও তাঁর চেষ্টনাত্তে ছিল। মুসলিম সমাজ তখন ধর্মের এক অনড়, স্ত্যস্ত ব্যাখ্যা দ্বারা চালিত হত। এখনও হয় না কি? যাই হউক, মুসলিম মানসের আধুনিকীকরণের জন্য ধর্মের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা দিতে এবং মুক্ত চিন্তার প্রসার ঘটাতে যে সব মনীষীর অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে—রোকেয়া সেই সব ধর্ম-সংস্কারকদের অন্যতম হবার দাবি রাখেন। শুধুমাত্র নারী মুক্তিকামী একজন হিসাবে দেখলে, তাঁকে খণ্ডিত করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের এক সেমিনারে পঠিত একটি নিবন্ধে গৌতম নিয়োগী আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন, “কোন ঐতিহাসিক গবেষকই তাঁর সম সাময়িক যুগের প্রেক্ষাপট রোকেয়ার চিন্তা-ভাবনা ও ধর্ম নিয়ে আলোচনা করেননি, দুই বাংলাতেই।” মুসলিম নারী মুক্তির তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণে সহায়ক সমসাময়িক কিছু ঘটনাবলীর প্রতি, অত্যন্ত সন্তোষের সঙ্গে, সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মুসলমানদের তৎকালীন অবস্থায়, নারী মুক্তির চেতনা আশা করা যায় না। ইউরোপীয় সভ্যতার secular চিন্তার প্রভাবে নর-নারী সম্পর্কের নতুন মূল্যায়ন শুরু হয়েছিল। হিন্দু নারী জাগরণে এই সংস্কৃতির প্রভাব আগেই দেখা গিয়েছে। ইউরোপে নারী প্রগতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ভারতে প্রথম এসেছিলেন মির্জা আবু তালিব খান। ১৭৯৯ সালে তিনি ইউরোপ ভ্রমণ করেন। ইংলেণ্ডে অবস্থানকালে “প্রাচ্য নারীর স্বাধীনতা” বিষয়ে ফরাসী ভাষায় একটি প্রবন্ধ রচনা করেন যা “vindication of the liberties of the Asiatic woman” শিরোনামে অনুলিখিত হয়ে Asiatic Annual Register - এ ১৮০১ সালে প্রকাশিত হয় কিন্তু আবু তালিবের নারী স্বাধীনতা বিষয়ক চিন্তা মুসলমানদের ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রতি বিমুখতার কারণে কোন প্রভাব ফেলতে পারে নি। কিন্তু আশা করতে পারি একজন মুসলিমের চোখে ইউরোপীয় নারী প্রগতির সঙ্গশংস বর্ণনা রোকেয়াকে সাহস যুগিয়ে থাকতে পারে। আবু তালিব শেষ জীবন কলকাতায় অতিবাহিত করেছেন— তাঁর ফরাসী রচনার সঙ্গে রোকেয়ার পরিচয় খুবই স্বাভাবিক। কেননা তখন মুসলিম অভিজাত পরিবারে ফরাসী চর্চা অব্যাহত ছিল।

ইসলামী শাস্ত্রে নারী স্বাধীনতার সহায়ক হিসাবে ব্যবহারের নজীর রোকেয়া কি পেয়েছিলেন? মুমতাজ আলীর কথা উল্লেখ করতেই হয়, যিনি ইসলামী ঐতিহ্যের মধ্যে নারী মুক্তি অন্বেষণের পথিকৃত। দেওবন্দ মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষালাভের পর তিনি সৈয়দ আহমদের অনুগামী হন। “তাহজীব-আল-নিসওয়ান” নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে তিনি তাঁর নারী মুক্তি আন্দোলন শুরু করেন। “ছকুক-ই-নিসওয়ান” নামক গ্রন্থে তিনি নারী পুরুষের সমানধিকারের দাবি পেশ করেন। মুমতাজ আলীর চিন্তা ভাবনার সঙ্গে রোকেয়ার চিন্তাভাবনার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে রোকেয়ার চেয়েও তাকে Radical মনে হয়। এই বাংলা দেশেই নারী সমাজের উন্নতির জন্য অস্বহীন প্রয়াস চালিয়েছেন লুৎফর রহমান। এজন্য ‘নারীতীর্থ’ নামে একটি সেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন, যেখান থেকে প্রকাশিত হত ‘নারীশক্তি’ নামে একটি পত্রিকা। মওলানা আকরাম খাঁ নারী পুরুষের সমান মর্যাদার কথা বলেছিলেন। এবং তিনি রোকেয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন।

প্রকৃত নারী মুক্তি, শুধুমাত্র পুরুষদের একক প্রচেষ্টায় আসতে পারে না। রোকেয়া বলেন, “আমাদের উচিত যে, স্বহস্তে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করি। একস্থলে আমি বলিয়াছি, “ভরসা কেবল পতিতপাবন”; কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, উর্দ্ধে হস্ত উত্তোলন না করিলে পতিতপাবনও হাত ধরিয়া তুলিবেন না। ঈশ্বর তাহাকেই সাহায্য করেন, যে নিজে নিজের সাহায্য করে (‘God helps those that help themselves’). তাই বলি আমাদের অবস্থা আমরা চিন্তা না করিলে আর কেহ আমাদের জন্য ভাবিবে না। ভাবিলেও তাহাতে আমাদের ষোল আনা উপকার হইবে না।” বাংলার নারী আন্দোলনের নেতৃত্ব পুরুষদের হাত থেকে, রোকেয়াই প্রথম নারী, যিনি নিজের হাতে গ্রহণ করেছিলেন। ইতিপূর্বে হিন্দুনারী জাগরণের শেষদিকে নেতৃত্বে কিছু নারী এগিয়ে আসলেও তারা কেউই রোকেয়ার মত প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চতায় নিজেদের উন্নীত করতে পারেন নি, রোকেয়ার বিশিষ্টতা এখানেই।

রোকেয়া বলেছিলেন, “মুসলমানদের যাবতীয় সৈন্য-দুর্দশার একমাত্র কারণ স্ত্রী শিক্ষার উদাস্য।” এই উদাসীনতার বিপদ সম্পর্কে তিনি সতর্ক করেন। “যাহারা নিজেদের অর্ধেক লোককে মুখতা ও ‘পর্দা’-রূপ কারাগারে আবদ্ধ রাখে—তাহারা অন্যান্য জাতির, যাহারা সমানে সমানে স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন করিয়াছে, তাহাদের সহিত জীবন সংগ্রামে কিরূপে প্রতিযোগিতা করিবে?”

অবরোধ প্রথার নির্মমতা সম্পর্কে সচেতন হয়েও সরাসরি এর বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন গড়ে তুলেন নি। কেননা তিনি দেখেছেন শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু রমণীরা অবরোধ মুক্ত হয়েছেন। এও তিনি দেখেছেন যে সমাজের প্রান্তিক সীমানায় অবস্থিত রমণীরা অবরোধ না হলেও মুক্ত নয়। নারী শিক্ষা বিস্তারে তাই তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন।

রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত “সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল” মুসলিম মেয়েদের জন্য প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়। তবে বেথুন স্কুল যেমন বাঙালী হিন্দু নারী শিক্ষার পথিকৃৎ, মুসলিম নারী

শিক্ষার পথিকৃৎ তেমনি 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'।

ওধু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। কুসংস্কার, পশ্চাদগামী চিন্তা এবং নারী সমাজের বিরুদ্ধে বিরাজমান আক্রোশের বিরুদ্ধে নারী সমাজকে সংগঠিত করার জন্য তিনি গড়ে তুলেছিলেন 'আনজুমান-ই-খাওয়াতীনে ইসলাম'। এই সমিতি গড়ার পিছনে তিনি দেশপ্রেমিক আব্দুর রসূলের সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছিলেন। এই সমিতি স্বদেশী ও খেলাফত আন্দোলন কালে, মুসলিম নারীকে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহনে উৎসাহিত করেছিল।

বেগম শামসুর নাহার লিখছেন, "সাহিত্যের মধ্য দিয়া তিনি ভবিষ্যৎ নারী জাতির স্বাধীনতার যে গৌরবোজ্জ্বল স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, তাহারই কিঞ্চিৎ বাহ্য প্রকাশ দেখা যায় তাঁহার কর্মজীবনে।" তাঁর সমগ্র সাহিত্য-কীর্তি এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁর নির্দিষ্ট স্থান নিয়ে আলোচনা না করলেও তাঁর একটি অসামান্য সাহিত্যকীর্তি নিয়ে আলোচনা করতেই হয়। *Sultana's Dream* এর কথা বলছি। ইংরাজিতে রচিত এই গ্রন্থের বাংলা অনুবাদও তিনি করেছিলেন। রোকেয়ার অনুবাদ সুন্দর হয়েও বিক্ষিপ্ত, কিংবা বিক্ষিপ্ত হয়েও সুন্দর।

Sultana's Dream খুব সম্ভবত বাংলা-রচিত প্রথম Science fiction। যাইহোক *Sultana's Dream* এর বিশেষভাবে উল্লেখের কারণটি বলি। একটা ধারণা খুব চালু হতে শুরু করেছে যে, সমাজে পুরুষ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় ধর্মই একমাত্র দায়ী। কিন্তু বিজ্ঞান এবং আধুনিক দর্শনও যে পুরুষ প্রাধান্য বিস্তারে কম যায় না। একথা আমরা অনেকে ভেবেই দেখি না। নীতিশে, ফ্রেড প্রমুখ অনেকেই নারী যে পুরুষের চেয়ে প্রকৃতি গত ভাবেই নিকৃষ্ট, এ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছেন। আধুনিক জীববিজ্ঞানকে কাজে লাগানর চেষ্টাও দেখা যায়। *Sultana's Dream* এ রোকেয়া এসব তত্ত্বের জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন।

'সুপ্রাচ্য সম্প্রীতি'র গত এক অধিবেশনে হাসান আজিজুল হক রোকেয়ার কর্মজীবন পশ্চিমবঙ্গে রোকেয়ার চিন্তার প্রভাব কতটুকু পড়েছে জানতে চেয়েছেন। উত্তরটা কি হবে তা ইঙ্গিতও দিয়েছেন। তাঁর এই প্রশ্নের জবাব দেবার যোগ্যতা না থাকলেও পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসাবে জবাব দেবার দায় এড়াতে পারি না।

প্রথমতঃ স্বীকার করি। বেগম রোকেয়া পশ্চিমবঙ্গে একজন বিস্তৃত ব্যক্তিত্ব। সুতরাং, বলাই বেশি, তাঁর রচনাবলী বহু পঠিত নয়।

তবে রোকেয়ার চিন্তা ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা আবার সৃষ্টি হয়েছে। না হলে, বহু সেরীতে হলেও তাঁর সম্পর্কে আশাব্যাজক ঔৎসুক্য এপার বাংলায় আগ্রহ হত না, তবে যে মুসলিম নারীদের মুক্তির জন্য তিনি তাঁর কর্ম প্রচেষ্টার বেশিটা ব্যয় করেছেন, তাদের সম্পর্কে বলতে গেলে সত্যক হতেই হয়। সাধারণভাবে, ইত্যুক্ত মুসলিম নারী শিক্ষার প্রসার হলেও কিছুতেই তাকে সন্তোষজনক বলা যায় না। যে বিদ্যালয় তিনি রেখে গেছেন সেখানে মুসলিম ছাত্রীর স্বল্পতা ইতিবাচক কোন ইঙ্গিত বহন করে না। আজকের কোন রোকেয়ার পক্ষে

"অবরোধবাসিনী" এবং "বিয়ে পাগলা বুড়ো"-র আধুনিক সংস্করণ বের করার জন্য প্রয়োজনীয় মাল মশলা সংগ্রহে বেগ পেতে হবে না।

১২-১১-৯৪ তারিখের আনন্দবাজারের একটি খবরের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। বাহ্যিক অনেক স্বাধীনতা ভোগ করলেও সমাজে নারীদের নিরাপত্তা যে এখনও বাড়েনি তার জন্য বিস্তারিত পরিসংখ্যানের প্রয়োজন নেই। ঐ খবরে বলা হচ্ছে, ইউনিসেফের সহযোগিতায় মালদহ টাউন হলে Social Defence আয়োজিত শীর্ষক এক আলোচনাচক্রে পুলিশের বড় কর্তারাই স্বীকার করেছেন যে, নারী নির্যাতনের ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে ক্রমবর্ধমান। সুতরাং নারীদের দুঃখের এখনও অবসান হয়নি।

নারী মুক্তির জন্য পশ্চিমবঙ্গে এখন অনেক সংগঠন কাজ করছে। তবুও অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে কৈ? এটা কি খুব অসঙ্গত হবে, যদি বলি আজকে অনেক নারী সংগঠন গড়ে উঠেছে—কিন্তু একজনও রোকেয়া আমাদের মাঝে নেই। তাই এই ব্যর্থতা।

রোকেয়ার চিন্তা তাই ছড়িয়ে দেবার আজ খুব দরকার। একাজের সর্বোত্তম উপায় রোকেয়া রচনাকে পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্তি। সুদী সমাজ এগিয়ে আসবেন কি?

রোকেয়ার বিশাল ব্যক্তিত্বকে আমার মত অর্বচিনের পক্ষে প্রকাশ করতে চাওয়া অন্ধের হস্তি দর্শনের মত। তবুও অন্ধের অংশ বর্ণনা যদি সুদীজনের পূর্ণমনের আগ্রহ স্বীকৃতি করতে পারে—সেই আশাতেই এই প্রচেষ্টা।

রোকেয়া মৃত্যুর পর এ.কে.ফজলুল হকের দেওয়া স্বাক্ষরালি দিয়ে শেষ করছি।

"She was one of those gifted people who raised their own memorial by their own hands in their own life time."

অধিকার আদায়ের সংগ্রাম : নারী

মৈত্রয়ী চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিধ্বস্ত বিশ্বে যে শান্তির প্রচেষ্টা আরম্ভ হয় তার অন্যতম প্রথম পদক্ষেপ রক্ষিৎসংঘের জন্ম। ১৯৪৫-এ যে ঘোষণাপত্র তৈরী হয় তার প্রধান লক্ষ্য সমস্ত মানুষের মানবাধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া ও তাকে সুরক্ষিত করা। এর পরের ধাপে তৈরী হয় রক্ষিৎসংঘের আর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (১৯৪৬), ঠিক দুবছর (১৯৪৮, ১০ ডি:) পরে রক্ষিৎসংঘের সাধারণ সভায় গৃহীত হয় বিশ্ব মানবাধিকার সনদ। মানবাধিকার সুদৃঢ় করবার সপক্ষে প্রথম সার্বজনীন সিদ্ধান্ত। এই সনদের ভিত্তি যে ঘোষণাটি তা হল সব মানুষই জন্মের সময় স্বাধীন। তাদের সম্মান ও অধিকারের ভিত্তি সান্ব। দুর্ভাগ্যবশত: সাম্যের এই ধারণা ৫১ বছর পরেও বাস্তবায়িত হয়নি। ধর্ম, শ্রেণী, বর্ণ, জাত, লিঙ্গের ভিত্তিতে ক্রমাগত এক বৃহৎ সংখ্যক মানুষের ন্যায় অধিকার হরণ করা হচ্ছে। নারী ও পুরুষ উভয়েই অধিকারহীনতার শিকার, কিন্তু নারী স্বাধীনতা, সম্মান ও সমানাধিকার যেভাবে লক্ষিত হয়, পুরুষদের তা হয়না।

আমি তোমার মাটির কন্যা জননী বসুন্ধরা তবে আমার মানবজন্ম কেন বঞ্চিত করা

বিশ্ব জুড়ে নারীর ওপর প্রতিদিন নানা অত্যাচার ঘটে চলেছে। এই বিভিন্ন অত্যাচারকে সমাজ বৈধতা দিয়েছে ধর্মের নামে, ঐতিহ্যের অজুহাতে, প্রথা ও দেশাচারের দোহাই পেড়ে। এই অত্যাচারগুলির বিরুদ্ধেই আওয়াজ উঠেছে বিভিন্ন ধারার নারী আন্দোলনে। এইসব অত্যাচারের খতিয়ান দেখলেই নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

- ১। সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় ৭.৪ কোটি নারী সরকারি হিসাবে নিখোঁজ। জীবনের সর্বক্ষেত্রে বৈষম্যের এবং অবাধেলার এক নির্মম পরিসংখ্যান।
- ২। প্রথা বা পরম্পরার অজুহাতে আফ্রিকায় ও এশিয়ায় ১৩ কোটি মেয়ের যৌনাস্পের হানি করা হয় কোন না কোনভাবে। প্রতি বছর এই অত্যাচার বৃদ্ধির হার আগের বছরের থেকে ২০ লক্ষ বেশি।
- ৩। ভারতে ১৯৯৪ সালে নানা ধরনের নারী নির্বাসনের ঘটনার সংখ্যা ৮২,৮১৮। সরকারি ভাবে পরিসংখ্যানের বাহিরে আছে আরও অনেক ঘটনা। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯২-এ ৪,৪১২টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। ১৯৯৫-এ তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬৮৭৫।

- ৪। নেপালের একটি জেলা থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত ২৮৮৯ জন নাবালিকাকে দেহ ব্যবসায় পাচার করা হয়।

গত দশ বছরে ভারতে দেহব্যবসায় নাবালিকার চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

৯ কোটি দেহ পসারিনীর মধ্যে ৩০ শতাংশ নাবালিকা (১৪ বছরের কম)। এই চাহিদা বৃদ্ধির বাৎসরিক হার ১০ শতাংশ।

এই পরিসংখ্যান সামগ্রিক নির্বাসনের এক অনূচিত্র। অত্যাচারের ধরণ ও তার বিস্তৃতি। অভাবনীয়। ভারতে মেয়েদের ক্ষেত্রে বৈষম্যের বীজ পোতা আছে অসম ভূমি বণ্টনের নীতিতে। এর মূল বৃজতে গেলে ফিরে যেতে হয় দুহাজার বছর আগে বৈদিক যুগে। ভারতীয় ঐতিহ্যে নারীকে ভূমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করাটাকে এত স্বাভাবিক ভাবা হয় যে এটা অধিকার হরণের পর্যায়েই আসে না। এদেশের বিভিন্ন রাজ্যে কন্যাক্রয় হত্যা ও শিশুকন্যা হত্যা শুধুমাত্র দরিদ্র পরিবারেই সীমাবদ্ধ নেই। রাজস্থানের কয়েকটা গ্রামে শিশু কন্যা হত্যা এমন জায়গায় পৌছয় যে সেই গ্রামের মানুষরা বাহিরের লোককে বলে 'আমাদের তিন পুরুষ এই গ্রামে কোন বরযাত্রী আসেনি। তামিলনাডুতে শিশু কন্যা হত্যার প্রচলন সবচেয়ে বেশী সাঙ্গেমে। সেখানে সরকার অনেকগুলি সোলনা হাসপাতালের ও গ্রামের সীমানায় রেখে দিয়েছে যাতে শিশুকন্যাকে না মেয়ে সেখানে রেখে দেওয়া হয়। গুজরাট ও হরিয়ানার শিশু কন্যাদের জন্য নানারকমের সরকারি প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। উত্তর বিহারে অদিদি নামে এক বেসরকারী সংস্থা ধাইদের সচেতন করার কর্মসূচী নিয়েছে, কারণ ধাইদের দিয়েই সন্ধ্যাজাত শিশু কন্যাকে গলা টিপে মারা হয়।

শুচিত্র আসন টেনে টেনে

সব সংস্কৃতিতেই নারী দৈহিক শুচিতাকে নারীদের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ভাবা হয়েছে। শিল্পবিপ্লব এবং দুই মহাযুদ্ধের পর ও জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি আবিষ্কারের আগে প্রথম বিশ্বে দৈহিক শুচিতা রক্ষাকে ধর্মীয় আবরণে মহিমায়িত করা হত। গর্ভনিরোধক প্রথম বিশ্বে দৈহিক শুচিতা রক্ষাকে ধর্মীয় আবরণে মহিমায়িত করা হত। গর্ভনিরোধক বড়ি পাশ্চাত্যে নারীর জীবনে যৌনমুক্তির দরজা খুলে দেওয়ার পর নারীদের পবিত্রতা নিয়ে বাড়বাড়ি অনেক কমেছে। অবশ্যই গোঁড়া ক্যাথলিক দেশগুলিতে এখনও গর্ভপাত নিষিদ্ধ। এই প্রসঙ্গে আয়ারল্যান্ডের একটি ঘটনার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তেরো বছরের কিশোরীকে তার বন্ধুর বাবা ধর্ষণ করে। মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে পড়ে কষ্টের রোমান ক্যাথলিক রক্ষিৎব্যবস্থায় গর্ভপাত নিষিদ্ধ এমনকি ধর্ষিতারও। মেয়েটি বিদেশে যাবার অনুমতি চায়। সরকার তাও দেয় না। তখন নিরুপায় মেয়েটি আত্মহত্যার ঘমকি দিলে শর্তসাপেক্ষে তাকে বিদেশে গর্ভপাত করার অনুমতি দেওয়া হয়। এই ঘটনায় তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সরকার তখন গণভোটের আয়োজন করে। সেই গণভোটে জনসাধারণ বিপুল ভোটে শর্তসাপেক্ষে দেশের মধ্যেই গর্ভপাতের সপক্ষে রায় দেন।

খৃষ্টশতাব্দে বিয়ের কনে সাদা পোষাক পরে, কারণ রং পবিত্রতার প্রতীক। চার্ট কুমারী ছাড়া এই পোষাকে বিয়ের অধিকার আর কাউকে চার্ট দেয়নি। পাশ্চাত্যের পুরুষ মনে মনে অশ্রুত ঘোনির নারীকে বিয়ে করতে চাইলেও এখন আর তা বাধ্যতামূলক নয়। গর্ভনিরোধক বড়ি এবং এবং বাট-সত্তরের নারী আন্দোলন নারীকে দৈনিক পবিত্রতার জগৎ থেকে অনেকটা মুক্তি দিয়েছে।

দুভাগের কথা এশিয়া এবং আফ্রিকায় সামন্ততান্ত্রিক দুষ্টিভঙ্গীর প্রাধান্য থাকায় নারীর সতীত্বের ওপর অসম্ভব গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর ফলে নারীর নিজের দেহের ওপর কোন অধিকার নেই। তার যৌনতা কঠোরভাবে পরিবার ও সমাজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই নিয়ন্ত্রণ হয় বিভিন্ন কারণে। তার কয়েকটি আলোচনা না করলে নারীর মানবাধিকার হরণের প্রসঙ্গটি স্পষ্ট হবে না।

আচারভীরা নারী শাস্ত্রবাক্যে বীধা

নারীর নিজের দেহের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে ধর্মের নামে। আয়ারল্যান্ডের ঘটনা আগেই বলা হয়েছে। আমেরিকাতেও গর্ভপাত বিরোধী সংগঠনের গর্ভপাতের সমর্থক নারীদের ওপর এবং গর্ভপাতের কেন্দ্রগুলির ওপর প্রায়ই আক্রমণ চালান। এই রকম আক্রমণে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। গর্ভপাতের বিরুদ্ধে বাহিবলে নিষেধাজ্ঞা থাকায় ধর্মীয় বাহানায় একজন নারীর মা হওয়া বা না হওয়ার সিদ্ধান্ত বাধ্য পায়।

ভারতবর্ষে দেবদাসী প্রথাও ধর্মের নামে নারী নিপীড়নের এক জ্বলন্ত উদাহরণ। অল্পবয়সী মেয়েদের ইয়েগাম্মা অথবা প্রভু জগন্নাথের চরণে সারা জীবনের মত উৎসর্গ করা হয়। তাদের মতামত কখনও নেওয়া হয় না। এরপর সারা জীবন ঈশ্বরের সেবাদাসীর আড়ালে তাদের যৌন জীবনযাপন করতে হয়। বৃদ্ধ বয়সে নিঃশ্ব অবস্থায় এদের জীবন কাটে। নেপালে যে সব ছোট্ট মেয়ে কুমারী রূপে মন্দিরে পুজিত হয় তাদেরও অবস্থা করুণ হয় নারীত্বে উত্তীর্ণ হলে। তাদের তখন মন্দির ছেড়ে চলে যেতে হয়। এইসব মেয়েরা সংসার পায় না কারণ প্রচলিত ধারণা 'কুমারী' দেবী বিয়ে করলে সংসারের অমঙ্গল হয়।

নবাতন হিন্দু ধর্মের পবিত্রতা রক্ষায় নারী বলিগ্রন্থ। তার ওপরে সামাজিক অনুশাসন দেখিয়ে দিয়েছে শারীরিক শুচিতা। বিয়ের আগে এবং বিয়ের পরে বাধ্যতামূলক একগামিতা (Monogamy)। বৈধব্য জীবন নিয়ে আসে কঠোর অনুশাসন। এখন হিন্দুধর্মে বিধবা বিয়ে নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু বিধবার বিয়ে এখনও সমাজ ব্যাপকভাবে মেনে নেয় না।

বৈধব্যের সঙ্গে সঙ্গে নারীর জীবনে নেমে আসে অধিকারহীনতা। যার প্রকাশ কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা নবদ্বীপের বিধবাদের দুর্ভাগ্য। যার প্রকাশ বর্বর সতীপ্রথা যাকে শাস্ত্রের মোহাই দিয়ে মহিমাষিত করা হয়েছে। বৈধব্য নারীর যৌনতা নিয়ন্ত্রণের উদাহরণ।

আজি এ ভারত লজ্জিত হে

ভারতীয় সমাজে নারীর মূল্য নির্ধারিত হয় তার সন্তান ধারণের ক্ষমতার মাপকাঠিতে। আমরা গর্ভের সঙ্গে বলি পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভাব্য। বিবাহিতার প্রতি গুরুজনদের আশীর্বাদী 'পুত্রবতী ভব'। নারী পুত্রের মঙ্গলার্থে ব্রত পালন করে, তাই নীল যতীতে বলা হয় 'শিবের ঘরে দিয়ে বাতি জল খাওয়া পুত্রবতী।' বিচিত্র কি এহেন মূল্যবোধে নারীর সন্তানধারণের ক্ষমতা পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত হবে। তার বিবাহের সিদ্ধান্ত পরিবার নেয়। প্রথম সন্তান, কবে কজন সন্তান, সন্তানের লিঙ্গের ভিত্তিতে গর্ভপাত সবই পরিবার ঠিক করে।

আধুনিক প্রযুক্তি গর্ভস্থ অণুর ত্রুটি নির্ণয় করে। এর ফলে সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া যায়। এইদেশে এই প্রযুক্তি কেবলমাত্র ব্যবহৃত হয় গর্ভস্থ জুনের লিঙ্গ নির্ণয়ে। কন্যাক্রশ হলেই পরিবারের চাপে গর্ভপাত করান হয়। এর ফলে ভারতে প্রতি হাজার পুরুষে নারীর অনুপাত অসম্ভব কম। পৃথিবীর বেশীরভাগ দেশে কিন্তু প্রতি হাজারে নারীর অনুপাত পুরুষের থেকে বেশি।

ভারতের আর এক লজ্জা পণপ্রথা। উর্দু লেখিকা কুররতুলহীন হায়দার লিখে বলেছিলেন "আমরা অহিংসার বড়িই করি অথচ পৃথিবীর কোন দেশে পণ্য সামগ্রীর জন্যে মেয়েদের পুড়িয়ে মারা হয় না। আমরা স্কিভ, চিভি, গাড়ি, গয়নার জন্যে বৌদের পুড়িয়ে মারি।"

আবার কিরে যেতে হয় ২০০০ বছর আগের বেদ নির্ণিত ভূমি বন্টন ব্যবস্থায়। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাধ্যতামূলক সতীত্ব। তাই বাপের বাড়ির হেফাজত থেকে শওরবাড়ির হেফাজতে গেলে শুচিতা রক্ষার দায় শওর বাড়ি নেয় প্রচুর অর্থের বিনিময়ে। পারিবারিক হিংসার বড় কারণ হল নারীর পিতৃগৃহে ও পতিগৃহে ও পতিগৃহে অধিকারহীনতা। এই লিঙ্গভিত্তিক হিংসা এবং বৈধব্যকে সমাজ আইনী বৈধতা দিয়েছে ধর্মভিত্তিক আইনের মাধ্যমে। বেদেই আছে নারী ও শুদের প্রতি বৈধব্য সামাজিক ন্যায়।

যে মানব আমি সেই মানব তুমি কন্যা?

যখন ১৯৪৮-এ মানবাধিকার সনদ প্রকাশিত হয় তখন কিন্তু আলাদাভাবে মেয়েদের অধিকার নিয়ে কোন কথা বলা হয়নি। অনেক নারী সংগঠন মনে করে এই দলিলটিতে পিতৃতান্ত্রিক, এবং উপনিবেশিক দুষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। নারীর প্রতি পারিবারিক হিংসাকে প্রথম খসড়ায় আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়নি। মানবাধিকার সংগঠনগুলিও এই ব্যাপারে উদাসীন। শুধু রাষ্ট্রীয় হিংসাই মানবাধিকারের আওতায় থাকায় নারীর প্রতি মৌলবাদী নির্ধাতন, মতাদর্শের নিয়ন্ত্রণও পারিবারিক হিংসার মত উপেক্ষা করা হয়েছে।

ভারত ও পাকিস্তানসহ কয়েকটি দেশে নারীরা জাতি অথবা ধর্মীয় গণ্ডীর বাইরে বিয়ে করলে সেটাকে পরিবারের পক্ষে অসম্মানজনক মনে করা হয়। প্রতি বছর ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশে এই ধরনের বিয়ে করে পরিবারকে কলঙ্কিত করার জন্যে নারীকে নৃশংসভাবে

খুন করা হয়। বেগুনীকে মানবাধিকার লাভে বসে ভাবা হত না। তাই নারীর মানবাধিকারের স্বীকৃতির আন্দোলনের জন্যে ব্যাবসায়িক আয়োজিত সম্মেলনে যোগদান করা হয়— নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং গার্বহুজীবনে হিংস্রতা ও শোষণ নিরস্ত্রনে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণে রাষ্ট্রের দায়িত্ব রয়েছে। ঘরে এবং বাইরে নারীদের অধিকার অস্বীকার করার যুক্তির ভিত্তি জীবনের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা মন্যতা ও গোপনীয়তা মানবাধিকারের প্রাথমিক ধারণা গড়ে উঠেছে পুরুষাণী নৈতিক কাঠামোর ভিত্তিতে। মেয়েদের অধিকারের প্রমাণটা পরে এসেছে, অধিকারের ধারণার সঙ্গে জুড়ে আছে একটা রাস্তায় সংস্থা বা পুরুষ নির্মিত রাজনীতিক ভাবনার পক্ষে অথবা বিপক্ষে কাজ করে।

অমানবিক ডাইনি প্রথার বিরুদ্ধে সরকারের ভূমিকা নেতিবাচক। সম্প্রতি মানবাধিকার সংগঠনগুলি জমির লোভে নারীকে ডাইনি হিসেবে পুড়িয়ে মরার ঘটনার সরব হলেও পুলিশ এদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিতে ঘিণা করে। সরকারি প্রচার যথু জনগোষ্ঠীর নিজস্ব বিশ্বাস ও রীতিতে হস্তক্ষেপ না করার অজুহাতে চুপ করে থাকে।

যে হিংসার আলোচনা এতক্ষণ হল তা সম্পূর্ণ জিজ্ঞাসিতিক। যে কোন সরকারই একদলকেন্দ্রিক অথবা গণতান্ত্রিক, নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা বর্ধক্রে চলেছে। রাষ্ট্র উদ্যমীনে থেকেছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রে আন্দোলন ধরাবাধিকভাবে নারীর মানবাধিকারের স্বকলনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে গেছে। নারীর নাগরিক ও রাজনীতিক অধিকার ছাড়াও তারা বৈষম্যের জালগাগুলি চিহ্নিত করেছে।

সুযোগের অভাব — শিক্ষা, কাজ, আশ্রয়, স্বপ্ন, স্বাস্থ্য পরিবেশ।

হিংসা — যৌনতা ও প্রজননকমতার স্বাধীনতা।

অস্বীকৃতি — ঘরের সমস্ত কাজ (রান্নাবান্না সন্তানের লালন পালন, অন্য সদস্যদের খেতেভাল)

মাহা পাও তাই লও

উপগ্রোহিত ক্ষেত্রগুলিকে মানবাধিকারের আওতার বাইরেই রাখা হয়েছে। মূল ধারের দৃষ্টিভঙ্গী হল এগুলি নারী সমস্যা, মানবাধিকার নয়। আন্তর্জাতিক আইনে এই গ্রন্থগুলি তত গুরুত্বপূর্ণ নয়।

যদিও যখন মেয়েদের ওপর আক্রমণ হয়, যেমন পুলিশ হেফাজতে ধর্ষণ বা আটকে রাখা তখন মানবাধিকার সংগঠনগুলি একজন ব্যক্তি নারীর পক্ষে পদক্ষেপ নেয়। কিন্তু মানবাধিকার সংগঠনের কাজ সাধারণত: রাষ্ট্র-স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি নির্বাচন, বা জনস্বীকৃতি প্রকাশ ঘটে। কিন্তু মেয়ের প্রধানত: থাকে এর বাইরে। ব্যক্তিগত গার্বহুজীবনে, যেখানে মেয়েদের অধিকার লক্ষিত হয়। এর ফলে একটা কৃত্রিম আইনী ও 'দৃষ্টিভঙ্গীজাত-ভাগ' তৈরী হয়েছে রাষ্ট্রীয় অপরাধ এবং অন্যান্য অপরাধের মধ্যে — যার ভিতরে রয়েছে স্বাধীনতা, সংগঠন এবং সরকারও অসরকারীভাবে।

এই সীমাবদ্ধতা পীড়াদায়ক হলেও মানবাধিকার সনদে নারীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের নির্দোষ ও সন্ত্রাসের স্বীকৃতি থাকা উচিত। কারণ মানবাধিকারের সব থেকে বড় হোতা রাষ্ট্র। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নারীর বিরুদ্ধে পারিবারিক হিংসাকে বৈধতা দেয়। তাই নারী সংগঠনগুলির এই ব্যাপারে 'দৃষ্টিভঙ্গী'র সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত পোষণ করা গেল না। পারিবারিক হিংসার শিকার যেসব নারী, তাদের রাজনৈতিক আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করাটা দৃষ্টিভঙ্গীর সীমাবদ্ধতা। একথা সত্যি পুরুষ ও হিংসাত্মক আক্রমণের লক্ষ্য হয়। কিন্তু মেয়েদের ওপর যেভাবে লিপিজাতিক নির্যাতন চালান হয় তার একটা নির্দিষ্ট ছক আছে।

পুরুষকে পারিবারিক আইনের বৈধতা ভোগ করতে হয় না। যেভাবে রুটিন মাসিক মেয়েদের হিংসার বলি হতে হয়, অসম্মানিত হতে হয়, খুন হতে হয় তা রাষ্ট্র নায়কদের ঘুম কেড়ে নেয় না। কিন্তু তারা পুরুষ হলেই যে রাষ্ট্র মাজেচড়ে বসতে সে কথাও সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

মোদা কথা নারীর মানবাধিকারের সংগ্রামকে নারীর সমানধিকারের সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এই বোধ থেকেই নারী আন্দোলন ১৯৯৩এ ভিয়েনা সম্মেলনে দাবি জানায় নারীর অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবেই দেখতে হবে।

কি আছে পথের শেষে

নারীর মানবাধিকারের সংগ্রামে ১৯৯৩ সালে ভিয়েনায় আয়োজিত রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার সম্মেলন এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। পাঁচ বছারপন্থিক নিয়ে যে টাইফুনাল গঠিত হয় তার সামনে ২৫টি রাষ্ট্রের নির্দোষিতার নিসংকেতে নিজেদের নির্দোষতার ঘটনার কিন্নর বিকল্প দেন। দক্ষিণ কোরিয়ার যে যোডনীরকে জাপানি সেনার মনোবল্লভের জন্যে প্রান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় তিনি সাতবছর লাগাতার ধর্ষণের পর যখন ছাড়া পেলেন তখন তার ভগ্ন স্বাস্থ্য ও সন্তান ধারণের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে। আর যেসব দেশ থেকে নির্দোষিতারা আসেন সেগুলি হল সার্বিয়া, ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়া, তুর্কী, কম্বোডিয়া, আমেরিকা, সুদান, পোল্যান্ড, আলজিরিয়া, চিলি, পেরু ইত্যাদি। কেউ থাকার হাতে যৌন নিগ্রাহের শিকার, কেউ হিংসার বলি, কেউ পাচার হয়ে গণিকাবৃত্তিতে। ১১ ঘণ্টা ধরে ৩০ জন নারী তাঁদের ওপর অত্যাচারের কথা বলেন। এই বৈঠকের শেষে টাইফুনালের এক সদস্য বলেন আমরা অবশ্যই আইনত অনুধাবন করব যে লিঙ্গ নিরপেক্ষ বিচারই একমাত্র বিচার। আমরা মেয়েদের অধিকার লঙ্ঘন শুনব, নিষ্পা করব, শাস্তি দেব এবং বন্ধ করব। বৈঠকের শেষে সদস্যরা বলেন 'আমরা আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এই সাক্ষ্য দিয়ে, হিংস্রতাকে প্রকাশ করার সাহসের জন্য। আপনার এই সাহস অন্যান্য মহিলাদের অনুপ্রাণিত করবে কথা বলার জন্য তাদের অধিকার দাবী করার জন্য, উৎসাহিত করবে 'হিংস্রতাকে' প্রতিরোধ করার কাজে যুক্ত হওয়ার জন্য।'

এই সম্মেলনের পর চূড়ান্ত বসড়ায় নারীর অধিকার মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এই স্বীকৃতির ফলে নারী আন্দোলন সবাই কে গোখাতে সমর্থ হয় যে তারা নিজেদের কথা

সবাইকে শোনানর ক্ষমতা রাখে। মানবাধিকারের স্বীকৃতি নারীবাদী মতাদর্শকেও মূল ধারায় নিয়ে আসে।

এটা বড় স্বীকৃতি হলেও আমাদের মনে রাখতে হবে ১৯৪৮ থেকে ১৯৭৯—পর্যন্ত ৩২ বছর লেগেছে নারীর বিরুদ্ধে সবরকম বৈষম্যের অবসানের দলিল CEDAW পেশ করতে।

ভারত জুড়ে হিন্দুত্বের প্রসার, নারীর একান্ত ব্যক্তিগত অধিকারে শাসক সম্প্রদায়ের অবিরাম হস্তক্ষেপ, দেশপ্রেমের জিগির তুলে সেনাবাহিনীর নারীর ওপর সন্ত্রাস, সব ধরনের জাতি দাঙ্গা ঘরে ও বাহিরে নারীর মানবাধিকার হরণ করতে উদ্যত। কম্বিত ভারতীয় আদর্শে নারীর ভাবমূর্তিতে তুলে ধরা, যুদ্ধবাজ মানসিকতার দিকে নারীকে টেনে আনা যেভাবে বৈধতা ও মান্যতা পাচ্ছে তাতে আজকের এই বাজারী অর্থনীতিতে নারীর সবরকম অধিকারের আসনই টলমল। পারিবারিক হিংসা, উগ্রজাতীয়তাবাদ, যুদ্ধবাজ মানসিকতা সবকিছুই নারীর কষ্টজর্জিত মানবাধিকারকে ছিনিয়ে নিতে পারে। তাই নারীকে শান্তির অধিকারকে, আন্দোলনের নীতি হিসেবে মেনে নিতে হবে।

এক শহীদের সাক্ষাৎকার “জারী থাকলো যুদ্ধ”

প্রেরনা রায় সেনগুপ্ত

প্র: তোমাকে শহীদের মর্যাদা দিয়েছে জাতীয় মহিলা কমিশন, জানো?

দামিনী: শহীদ? কী করে হলাম? কার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গিয়ে শহীদ হলাম আমি? আমি তো বলি হলাম পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার হাতে, শহীদ নই আমি। আর যারা প্রকৃত শহীদ, মনিপুরের মনোরমা, সিঙ্গুরের তাপসী মালিক, মধ্য ও উত্তর পূর্ব ভারতের অসংখ্য নাম না জানা লড়াইয়ে মহিলাদের শহীদ তো দূরে থাক তাদের মানুষ মানতেও বিধা হয় মহিলা কমিশনের।

প্র: ভারতীয় সেনাবাহিনী তোমার মৃত্যুতে তাদের নববর্ষের অনুষ্ঠান বাতিল করেছিল...

দামিনী: আর এই সেনাবাহিনীই সারা উপমহাদেশের তথাকথিত উপকৃত অঞ্চলে গণধর্ষণের বিশ্বরেকর্ড কয়েম করেছে, হাসিও পায়।

প্র: তোমার নিয়ে সারা ভারত জুড়ে ওঠার পরও সারা দেশে ধামেনি ধর্ষণের বন্যতা।

দামিনী: কি করে ধামবে বলে প্রত্যাশা করো, ধর্ষণ শুধুমাত্র শারীরিক লাগসার পরিণতি নয়, এটা একটা দমনের হাতিয়ার। যা দিয়ে পিতৃতন্ত্র জারী রাখছে তার শাসন ও শোষণ। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জও মেনে নিয়েছে যে ধর্ষণ একটি যুদ্ধের অঙ্গ। তার মানে একটা যুদ্ধ চলেছে। ধর্ষণ তার অঙ্গ মাত্র।

প্র: কর সঙ্গে কর যুদ্ধ দামিনী? পুরুষ বনাম নারীর যুদ্ধ?

দামিনী: না, যুদ্ধটা পিতৃতন্ত্র বনাম সমানাধিকার ভাবনার। পিতৃতন্ত্রের সচেতন-অসচেতন-অবচেতন মহিলা প্রচারকও পাবে। আবার সমানাধিকারের সঙ্গে পুরুষ সৈনিকও আছে। তাই যুদ্ধটা কোনো ভাবেই পুরুষ বনাম নারীর নয়। কিন্তু এটা আজ মানতেই হবে যে যুদ্ধটা চলেছে, আর ধর্ষণ সেইযুদ্ধের এক বড় হাতিয়ার।

প্র: ধর্ষণবিরোধী কড়া আইন কী ধর্ষণকে ধ্বংস করতে পারবে? তোমার কি মনে হয়?

দামিনী: পারবে না, পারতে পারে না। কোনো আইন দিয়ে হবে না। আর তুমি বিষয়টাকে ধর্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলছো কেন? প্রকৃতি সমানধিকারের। ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যু বা যাবজ্জীবন হলেও আসলে তো পিতৃতান্ত্রিকতারই জয়। কারণ ধর্ষণের সাথে সাথেই নারীর সম্মান চলে যায়, এমন ভাবনা তো পিতৃতন্ত্রই প্রচার করে।

প্র: তাহলে রাস্তা কি দামিনী?

দামিনী: রাস্তা তো একটাই, নারী স্বাধীনতা। যা সমানধিকার প্রতিষ্ঠা করবে। সেই সমানধিকার প্রতিষ্ঠার পথে যদি মাতৃতন্ত্রের এক সাময়িক পর্বও আসে তাও স্বাগত। তবে সেটা অবশ্যই যেন উত্তরমনশীল পর্ব হয়।

প্র: কোনো আশার আলো দেখছ সুদূর ভবিষ্যতেও?

দামিনী: উত্তাল দিল্লির রাজপথে আশা দেখতে পাওনা। যদিও সেই উদ্‌মত্তাতেও ছিল দাবী দাওয়ার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা, আরও অনেক দুর্বলতাও ছিল, তাও। তোমার রাজ্যে সোনামুখী গ্রামে আখা—সামরিক বাহিনীর হাতে মহিলারা গণধর্ষণের শিকার হওয়ার পরদিনই ঝাড়গ্রাম শহরে হাজার মহিলার মিছিল আশা দেখায় না তোমায়? মনোরমা শহীদ হওয়ার পরদিন মনিপুরের মায়েদের দৃষ্ট প্রতিবাদ কি আমার আলো তুলে ধরে না?

প্র: যে যুবসমাজ তোমার চলে যাওয়ায় এত কাঁদছে তাঁদের কি বলবে তুমি?

দামিনী: অভিযোগ জানাবো। শুধু আমার জন্য কেন কাঁদলো ওরা? কেন এই বিশ্ফোরণ প্রতিটা ধর্ষণের জন্য হয় না? কারণ কি আমি তুলনায় স্বচ্ছল-এবং দিল্লির মোয়ে বলে? হাজারিবাগের জয়া, বীজপুুরের সোনি, বরানগরের রানীরা গরীব আর দলিত-আদিবাসী বলে কান্না আসে না? কেন ওরা ফেটে পড়ছে না হিন্দু ধর্মহুলগুলোর বিরুদ্ধে? যেখানে 'আদর্শ' যৌনসঙ্গম বলতে যা বর্ণিত আছে তা ধর্ষণ ছাড়া কিছু নয়, কেন তারা কথা বলছে না ঐ সাম্রাজ্যবাদী পণ্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, যা নারীদেরকে আশ্রয় করে ও বিক্রি করেই বেঁচে আছে?

প্র: ভার্মা কমিটির রিপোর্টও সরকার সহ সব কটি মূল ধারার রাজনৈতিক দল গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে জানো?

দামিনী: সেটাই স্বাভাবিক নয় কি? কারণ ঐ রিপোর্টে বেশ কিছু ভাল দিক ছিল, কিন্তু

সেগুলি প্রতিটি রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে যেত। প্রতিটি মূল ধারার রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধেই নারী নির্ধাতনের একগালি অভিযোগ আছে।

প্র: মজার কথা হলো নকশালবাদী বলে প্রচারিত গোষ্ঠীগুলিই রিপোর্টকেই স্বাগত জানিয়েছে...

দামিনী: তোমাকে এই তথ্যটির সাথে আরও একটি তথ্য জানিয়ে রাখি, কেন্দ্রীয় সরকারের সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতের ১৭ টি ব্লকে নারী নির্ধাতনের সংখ্যা শূন্য। যদি পিতৃতান্ত্রিক এই রাষ্ট্রব্যবস্থার বন্দুক থেকে পুরুষের একনায়কত্ব বেরিয়ে আসে তবে বন্দুক থেকেই বেরিয়ে আসুক না নারীর একনায়কত্ব, যার অভিমুখ থাকবে সমানধিকারের দিকে, ক্ষতি কি?

প্র: ৮ ই মার্চ, আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবস পেরিয়ে গেল, ৮ ই মার্চ উপলক্ষে কিছু বলতে চাও আমাদের?

দামিনী: একটা ঘটনা বলতে চাই, তাকে ঠিক ঘটনা বলে চলে না। ঘটমান কিছু সেটা। এ দেশের বনাঞ্চলে, যেখানে আদিবাসী নারীরা বিয়ের পর দেহের উর্ধ্বাঙ্গে কাপড় পরতেও পারত না, স্বতুমতি হলে থাকতে হতো গ্রামের বাইরে, ডিম-মাছ-মাংস খেতে পারত না, তারাই আজ গড়ে তুলছে সংগঠন। ৮ ই মার্চ সারা ভারতে বিশাল বিশাল সমাবেশ দিয়ে পালিত হয়েছে নারী দিবস। রাঢ়ী শহরের সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন কম করেও ১৫ হাজার মহিলা। পিতৃতান্ত্রিক মৃত্যু যাত্রাপথ পেরিয়ে এসেছিল যেন ১৫ হাজার আগুন পাখি। তাঁরা আমায় যেন বলছে 'যুদ্ধ জারী থাকলো দামিনী, তোমার জন্য যুদ্ধ, আমাদের জন্য যুদ্ধ'। যদি পারো তো সেই যুদ্ধে সামিল হয়ো। ভালো থেকে, যুদ্ধে থেকে।

(নির্মম রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের শিকার ছত্তিশগড়ের আদিবাসী শিক্ষিকা ও সমাজকর্মী সোনী সোরির মুক্তি চাই।)

রীবাজ (রেওআজ)

মনোরঞ্জন ব্যাপারী

পাঁচ সাল বাদ গাঁও বাপস হয়েছে মণিরাম। কাউকে কিছু না জানিয়ে সেওনকাঠ বওয়া ট্রাকের মাথায় সেই যে উধাও হয়েছিল, ফিরে এসেছে লাল চুকটুক বউ সাথে করে। লেড়কা বাপস হওয়ায় এবং নতুন বউ নিয়ে আসায় বাপ ঢোলকুরামের খুশিতে মাতাল হবার কথা। কিন্তু তার ভয়ে ভেড়ে নেশা ছুটে যাচ্ছে। বুক কাঁপছে। মণিরাম যে বনরাজ্যের রীত রীবাজ মানে নি। বউ নিয়ে যায় নি লিঙ্গনাথনের মন্দিরে প্রণাম করতে। বাভন দেবতা দিয়ে শুদ্ধি করায় নি নতুন বউকে। সোজা এনে তুলেছে নিজের ঘরে। ভয়ের ভাবনার কারণ সেটাই।

তিনদিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা, অন্যদিকে নদী। সভ্য জগৎ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন এই অঞ্চলের একচ্ছত্র মালিক দেওনন্দন মিশ্র আর তার পরিবার পরিজন। তাদের নীতি নিয়ম আইন কানুনই বন রাজ্যের শেষ কথা। সেই কথা, বিধি বিধানের বিরুদ্ধাচরণ সাক্ষাৎ শমনকে আমন্ত্রণ। দেওনন্দনরা কোন সাধারণ মানুষ নয়, দেওতার আশীর্বাদ প্রাপ্ত উঁচু জাত, বাভন।

দেওতার আশিষ যাদের সঙ্গে থাকে তাদের ক্ষমতা অসীম। যে কাউকে কেটে কোতরি নদীর জলে ভাসিয়ে দিতে পারে। কানুনবাবু নদী পার হয়ে মিশ্র সাহেবের হাবেলির চা খেয়ে বাপস চলে যাবে। তাদের সাথে বিরোধ মানে দেওতার সাথে বিরোধ। মানুষ সব পারে কিন্তু দৈবি তাকতের সাথে পারে না। মণিরাম তাই করছে।

বনরাজ্যের এক কোণে পঞ্চাশ হাট ঘর নীচু জাত চামরাহা চরবাহা পরিবারের বাস। যথ সামান্য কিছু চাষ আর গরু মোষ গুরুর ভেড়া পালন তাদের জীবিকা। এখানকার সবকিছুতে যুগ যুগ ধরে লিঙ্গনাথনের অধিকার। লিঙ্গনাথনের প্রধান পূজারী বর্তমানে দেওনন্দন।

দেওনন্দন একটা চলমান আতঙ্কের নাম। বনরাজ্যে তার নামে মানুষ তো ছার, বাঘও মুছা যায়। মণিরামের ঔদ্ধত্যের খবর তার কানে গেছে। বলে পাঠিয়েছে, জানের মায়া আছে কি নেই? সূর্য্য ডোবার পহেলে বউকে রেখে যা। না হলে ফল ভোগার জন্য তৈয়ার থাক।

ছেলেকে তাই বোঝায় ঢোলুক, মোর কথা মান বেটা। ভেজ সে। মাত্র তিন কি চার রাত তারপর বাকি সারাজীবন তো বউ তোরই। কতকাল ধরে এই রীবাজ চলে আসছে। কেউ না বলে নি। কি লাভ! বাভন পণ্ডিতরা বহুত বলবান। কেউ ওদের ক্রথতে পারবে না। বেকার বিপদে পড়বি।

ছেলেকে বলে না ঢোলুক। কাউকেই বলা যায় না বুধরামের কথা। কারবাশের মত পাকানো শরীর, মনে বাঘের মত শক্তি আর সাহস। এই বনরাজ্যে সে প্রথম দেওতার আড়ে বাভন পণ্ডিতদের চালানো কর্ণ প্রথার বিরোধ করে বলেছিল -- আমাদের বহু বিটি এতক সন্তা লয়

আর কেউ যেন কোনদিন না পাঠায়। শুদ্ধি, না কুন্দি ভোলে ভালে লোগকে খোঁকা দিয়ে বহুগলানকে নাস্তা করা, ভোগ করা।

বলেছিল সে আরও, এইসব জমিনে আমরা মেহনত দিই, ফসল উঠাই। বাভন পণ্ডিতরা কিছু করে না। শ্বেক খটা হিলায়। আর তাহিতে আমাদের বোরা বোরা ধান গেছ মকই পরণামি দিতে হয়। তোমরা যার ইচ্ছা দাও। আমি এই সাল দিব না পরণামি।

বাল্যকালে, না ঠিক ততটা বাল্যও নয়, বেশ একটু বোঝাবার মত বয়সের ঘটনা। এখনও মনে আছে ঢোলকুর।

এই অঞ্চলের প্রায় অর্ধেক জমি জিরেত লিঙ্গনাথনের বকলমে বাভন দেওতার অধিকারে। চাষের পর খাড়াই বাছাই করে নিজে বসে সেই জমির আর্থিক ফসল গ্রামবাসীদের পৌছে দিয়ে আসতে হবে ওদের গোলায়। এই জমি চাষের পরই নিজেরটুকু চাষের ছুটি পাবে। সেই নিজের জমির ফসল থেকে যেটা নেওরা হবে দেওতার নামে সেটাই প্রণামি।

দেওনন্দনের বাপ গণপত্ মিশ্রা তখন লিঙ্গনাথনের প্রধান সেবায়ত। পণ্ডিত সমাজের শীর্ষ নেতা। সে দেওনন্দনের মত উগ্র নয়। ধীর স্থির শাস্ত প্রকৃতির মানুষ একটুও রাগ না করে নরম গলায় নিকটজনকে বলেছিল, দেওতাকে বঞ্চিত করে দেওভূমে থাকা যায় না। দেওতা নরাজ হয়। আকত দেয়।

জেনে বুঝে বুধরাম সাপের লেজে পা দিয়েছিল। সে আজ এক আজ একা যা বলেছে কাল যদি সবাই তাই বলে ধরম করম আর কি কিছু অবশিষ্ট থাকবে? পূজা পাঠে অরুচি দেব বিজে ভয় ভক্তি না থাকলে বাভন পণ্ডিতদের কি গতি হবে। কেমন করে থাকবে দবদবা? একে বিনষ্ট করা দরকার।

তাই করেছিল তারা। জলজ্যাস্ত মানুষটা জঙ্গলে পানী ধরা কাঁদ পেতে ফেরবার পথে ধরা পড়ে গেল দেওতা বাভনের কাঁদে। আর ফিরতে পারলো না ঘরে।

কেউ সে খবর জানেন না। জানে একটা ঢোলকুরাম। কিন্তু সে কথা কাউকে বলতে পারে নি। তাহলে দেওতা তাকে আকত দিতো। আর তাই বুধরামের মৃতদেহ কেতরির বালি গর্ভে চাপা দিয়ে গণপত্ আর তার সাগরেনরা পরম নিশ্চিন্তে হাত পা ধুয়ে সবাই কে বলতে পেরেছিল - লিঙ্গনাথন বনরাজ্যে কোনও বেনিয়ম সহন করবে না। যা চলছে তাই চলবে। যে উল্টা যাবে তাকে দেও তুলে নেবে। বুধরামের পরিণতি জানা থাকায় আর নিজের বিয়ের সময় ইচ্ছা থাকলেও শুদ্ধি রীবাজের বিরোধ করতে সাহস পায় নি।

মণিরামের মা সুকলি বাইয়ের তখন কত বা বয়েস। তোরো কি চৌদ্দ। একটু লম্বা গোছের রোগা শরীর। চোখ দুটোয় যেন জড়িয়ে ধরা অজানিত ভয়। নদীর ওপার দূর বনগ্রাম রানভটা থেকে অসতে ক্রান্তিতে বয়েল গাড়ীতে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে।

কোতরি নদী বর্ষাকালে পারাপার করা যায় না। তখন তার দীতে থাকে কল্লভের ধার। অন্য

সময় সুশীলা বালিকার মত শান্ত অচঞ্চল। তখন হেঁটে পার হওয়া যায়। ঠেলে ঠেলে গরুর গাড়ী চালিয়ে আনা চলে।

বিধান অনুযায়ী বউকে সাথে করে গাড়ি নিয়ে আসতে পারে নি ঢোলকু। গ্রামের প্রবেশদ্বারে ঘুমকাতর সুকলিকে বসিয়ে দিয়েছিল মন্দিরের সিঁড়িতে।

তখন সন্ধ্যা নামছে। বনরাজ্যে রাত আসছে ভয়াবহতা নিয়ে। বাঘ ভালুক বনরাজার প্রজারা রিওর হয়ে নামতে শুরু করেছে আহাতির সন্ধানে। ভয় পেয়ে ঢোলকুকে জড়িয়ে কুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল সুকলিবাঁই -- মোলা একেলা ছোড় কাঁহা যাবস ?

একেলা কি রে ! দেও আছে না ? বসে থাক, কোন ভয় নাই।

ভয় নাই বলে বউকে সাধুনা নিলেও নিজেও কঁপে যাচ্ছিল ঢোলকু। বাপ মারা যাবার পর দেওনন্দনের উপর এখন পূজার্তনার ভার। ছয় ফুটের উপর উচ্চতার দেওনন্দনের দেহটা বিশাল। যেন চলমান ছোটখাট পাহাড়। কান পর্যন্ত তার পাকিয়ে তোলা মোচ। লম্বা জুলফি। রোজ নাকি যাবের ছাতুতে মেখে একপোয়া ঘি খায়। রাতকালে তাকে দেখায় যমদূতের মত। সেই যমদূতের কুকের মধ্যে হৃদয় নামক কোন বস্তু নেই। সুকলি ওই যমদূতকে সহ্য করবে কি করে।

আর কিছুক্ষণের মধ্যে তার এসে যাবার কথা। রোজ আসতে হয়। পূজাপাঠ করে প্রণামি নেয়। লিঙ্গনাথন নাকি বড় ক্রোধী। পূজাপচারে বিঘ্ন হলে বনরাজ্যে রোগ শোক বরা বন্যা ভূমিকম্প দেবে। বসুধা আর ফসল ফলাবে না। কোতিরির জল বিধ হয়ে যাবে। মউহা ফুলে নেশা হবে না। আর সে ভুট্ট থাকলে আকাশে তির চালালে বরহা গায়ে বেঁধে। খুব ফলে ধান গেছ বঁদু কুটি মাতিয়া মকাই। মানুষ সুখে থাকে। বাতনরা মন্ত্র জানে। যে মন্ত্রে লিঙ্গনাথন ঘুম থাকে। এই কথা এই অঞ্চলের মানুষ বিশ্বাস করে। তারা ধান গম পাট ভেড়া প্রণামি দেয়।

তখনকার সময় মন্দিরের গঠন এখনকার মত ছিল না। পাথরের উপর পাথরের চাকর সাজিয়ে চারিদিকে তোলা ছিল মোটা দেওয়াল। উপরে হেতাল পাতার ছাউনি।

এখন পাকা ছাদ হয়েছে। মিশ্ররা দু দিনের পথ বয়েল গাড়ী হাঁকিয়ে সিমেন্ট আনিয়া গড়েছে মন্দির। সেই সিঁড়িতে বউকে বসিয়ে দিয়ে ঘরে এসে স্থির থাকতে পারেনি ঢোলকু। তাই আবার গিয়েছিল লিঙ্গনাথন মন্দিরে। জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে দেখেছিল কেমন করে শুদ্ধি যজ্ঞ হয়।

পূজাপাঠ সেরে উদ্যোগ গায়ে দেওয়ার ঘর থেকে বের হলো বাতন দেওনন্দন। কখনও কুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে সুকলি। হঠাৎ দৈত্যাকার দেওনন্দনকে দেখে আতঙ্কে আশঙ্কায় কঁকড়ে গেল সে। বাতন এক লোটা দুখ মেশানো জল ঢেলে নিল তার গায়ে মাখায়। অং বাং করে খানিকক্ষণ কি সব মন্ত্র বললো। তারপর হমকি দিল- উই। উঠকে পাছু যা।

উঠতে পারে না সুকলি। যেন শিকারী চিত্তর সামনে হরিণছানার মত মুচ্ছাতুর। তার সর

না সেবাইতের। সময় দেয় না সামলে উঠবার। পীজা কোলে করে তুলে নেয় সুকলিকে। মন্দিরের ভান দিকে পাহাড়ের খাঁজে চাতালে নিয়ে ফেলে। সেদিকটা অন্ধকার। দৃষ্টি চলে না ঢোলকুর। শুধু অন্ধকার ছিন্নভিন্ন করে ভেসে আসতে থাকে সুকলির গোঁঙ্গানি - মাই হো বাপ হো। মোলা ছোড় নো, তো গোড় লাগি বাতন বাপ।

পরের দিন সকালে ঢোলকুর মাই পুত্রবধুর জন্য গরম দুধ আর কুটি দানার ভাত নিয়ে মন্দিরে যায়। নদীর জলে বউকে চান করিয়ে, সেক তাপ দিয়ে কুসুম তেল মাখিয়ে সাধুনা দেয় - কি করবি বেটি, এই কষ্ট বনরাজ্যের সব মেয়ের ললাট লিখন। সহ্য কর।

তিনদিন তিনরাত সুকলি বাঁহকে রাখতে হয় দেওধামে। তবে প্রথম রাতের পর দেওনন্দন তাকে আর স্পর্শ করে নি। শুদ্ধিক্রিয়া সম্পন্ন হবার অন্যদের হাতে ন্যস্ত করে দেয়। তারা পালক্রমে পর পর সুকলিবাঁহিকে পুত পবিত্র বানায়।

যেদিন সে স্বামীগৃহে ফেরবার অনুমতি পায় চলৎশক্তি রহিত একটা অর্ধমৃত আতঙ্কিত সন্তোগভীতা শরীর মাত্র। স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে তার বহুদিন লেগে যায়।

কেউ জানে না কতকাল আগে থেকে এই ধর্মিক আচারের প্রবর্তন। তবে সবাই এটা জানে স্বয়ং লিঙ্গনাথন দেও এর প্রবর্তক।

যখন সে এই পিরখিমির সৃষ্টি করে তখন তাঁর বড় ইচ্ছা হয় নিজের জন্য নিরিবিলা একটা সুন্দর স্থান সংরক্ষিত রাখবার। সরগ থেকে এসে সেখানে কিছুকাল বসবাস করা যাবে। তাই তিননিক ঘেরা পাহাড় দিয়ে এক দিকে রাখে নদী। চলাচলের পথ করে রাখে দুর্গম। তৈরী করে বনানীর দুর্ভেদ্য জঙ্গল। বনে জঙ্গলে বানায় বাঘ ভালুক।

যেন কোন মানুষ এসব বাধা পার হয়ে এখানে প্রবেশ করতে পারে না। তারপর বহুকাল পরে সরগ থেকে ভ্রমণে আসে নিজের সৃষ্টিতে। বড় বড় পাথর দিয়ে গড়ে তোলে বিশ্রামাগার। তারপর সেই আবশ্যে ঘুমিয়ে পরে গভীর স্রাস্তিতে।

মানুষ বড়ই লোভী। তারা খোঁজ পেয়ে যায় দেওভূমির। সেখানে নদীতে আছে সুমিষ্ট জল আর অঢেল মাছ। মাটিতে আছে ফলদার আম জাম মহুয়া কেন্দুর অসংখ্য গাছ। বনে আছে বনমোরগ খরগোশ বরহা হরিণ সশরীর মত স্বাদু শিকার। তারা দখল করে নেয় দেওস্থান।

তখন লিঙ্গনাথন ছিল গভীর ঘুমে। যখন তাঁর ঘুম ভাঙ্গে অবাক হয়ে দেখে নদীর জলে আর সেই স্বাদ নেই। ফলদার বৃক্ষ শুকিয়ে কাঠ। মাটি অনুর্বর, বন্ধা। কেন এমন হলো ? জানলো দেওতা, এই স্থান গুপ্ত নেই। নদী সীতের, পাহাড় পার হয়ে মানুষের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এখানে। আর সেইসব মানুষদের বউ হয়ে এসেছে যেসব মেয়েমানুষ, তাদের অশুদ্ধ অশুচি দেহকে কবজা করে রেখেছে অমঙ্গলের দেবী মাতঙ্গী যার ধ্যান জ্ঞান একমাত্র লিঙ্গনাথনের সৃষ্টি বিশুদ্ধত্বা ঘটানো। মাতঙ্গির চরনের কারণেই এমন দুরবস্থা।

মানুষের উপর ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হলেন দেও লিঙ্গনাথন। তাঁর গরম নিঃশ্বাসে মানুষের শরীরে

জ্বালা ধরলো। তখন তারা ছুটে গেল সেবতার কাছে। মাথা ঠুকলো, খুব কাঁদলো। বললো লিঙ্গনাথন-ঠিক আছে, তোদের কিছু বলবো না থাক আমার স্থানে। কিন্তু অলকহীন বাইদের বিদায় করে দে। না হলে মাটি আর ফসল দেবে না, ফল দেবে না বৃক্ষ, বনে পাবি না শিকার। মরবি রোগ শোক বজ্রপাতে।

বললো মানুষেরা, বাই না থাকলো কে আমাদের জন্য মহলা বিনবে, কে বানাবো দারাবো। কে জ্বাল দেবে মাণ্ডিয়া কুটকি?

বলে লিঙ্গনাথন, নতুন বাই আন। তাকে আমি যাচ পরখ করবো। যদি মাতাসী প্রকোপ থাকে শুদ্ধি দেবো। তারপর প্রবেশ পাবে দেওস্থানে।

মানুষেরা পুরাণো বাইদের গলায় পাথর বেঁধে কোতরিতে দিয়ে নতুন বাই নিয়ে এল। লিঙ্গনাথন যাচ পরখ আর শুদ্ধি দিয়ে তাদের দেওভূমে প্রবেশযোগ্য করে দিলেন। বনরাজে আবার সুখ সম্পদ ফিরে এলো।

লিঙ্গনাথন তো আর অনন্তকাল ধরাধামে থাকতে পারে না। তার যেদিন চলে যাবার ইচ্ছা হলো, মুখ হা করলো। সেই হা মুখের ভেতর থেকে হেঁটে বেরিয়ে এলো অসূলি প্রমাণ কে মানুষ। যার গলায় পৈতা। বললো, সেই বাভনকে, যতকাল আমি আবার না আসি দেওধাম রক্ষা করবি। দেখবি মাতাসীর কোন চর যেন প্রবেশ না পায়। নারী গুণ্ডাসের গোপন অঙ্ককারে আস্তানা গাড়ে ওই শরতানি। ব্রহ্মতেজ ছাড়া কোন পুরুষ তাকে বিনষ্ট করতে পারে না।

সেই থেকে বনরাজে চলে আসছে শুদ্ধি ব্রতের ধর্মচরণ। এই ব্রত পালন না করে কোন নারী প্রবেশাধিকার পায় না।

বনরাজে মণিরামের আগে আর কেউ কোনদিন ট্রাকে চাপেনি। পরতাপ গড়ে বাঁশ কাটিতে গিয়ে সেই সৌভাগ্যের দ্বার খুলে গেছে। লোভে সে চলে গিয়েছিল নাদগাঁও। জুইভার বলেছিলো যেতে দুই আসতে দুই। বাস চারদিন পরেই ফেরত। ট্রাক ফিরছিলো, কিন্তু মণিরাম ফিরতে পারেনি। নাদগাঁও দেখে চোখ ঝাঁকিয়ে গেছিলো তার। এতলোক, এত ঘরবাড়ী, এত পাড়ীখোড়া। সবচেয়ে আশ্চর্য হয়েছিলো এই দেখে যে, কোন কাম বেগার নয়, ঘাম স্বরালে মজুরি মেলে। তাই খানানে কাজে লেগে গেছিলো। পাঁচ বছর পর অনেক টাকা আর রূপবতী বউ নিয়ে বাপস হয়েছে বনরাজে।

গ্রাম থেকে যাবার সময় মণিরামের সাথে ছিলো আদিম সারল্য আর অসীম কৌতূহল। ফিরে এসেছে কিছু বুদ্ধি বুদ্ধি বিচার বিবেচনা নিয়ে। সে কিছুতে মানতে রাজি নয় বাভন দিয়ে তিনরাত শুদ্ধিকরণের নামে যথেষ্ট ধর্ষণের।

কেন অবুঝ হোস বেটা। হেলেকে বোঝায় ঢোলকুরাম, মিস্ত্রী বড় খতরনাক। বোঝায় গাঁও সেয়ান ভোঙ্গারাম, দেওথরের খিলাফ ওরা বনরাজে কিছু হতে দেবে না। কেন দেবে? দেওতার নির্দেশে তারা সর্বজন্য রক্ষক। বনরাজের মালিক। অধরম হলে দেও রুস্ত হবে গাঁও

উজ্জার যাবে। কুরা বয়েল গাইয়া সব মরে যাবে।

কোন বাতাইস? তেইশ বছরের কালো পাথর কৈদা শরীর মণিরামের। পাথরের সাপে লড়াই করে মনটাও শক্ত পাথর। বল সেয়ান, কে বলেছে, বল কে শুনেছে!

দেওতা বলেছে, বাভনরা শুনেছে!

তো দেওতা সব কথা খালি ওদেরই বলে কানে? যা বলে তাতে আমাদের লোকসান হয় কেন? বল বল, কেন হয়?

চুপ যা বেটা।

হেলেকে ধামাতে চায় ঢোলকু। সে জানে বাভন দেওতার বিরুদ্ধে দ্রোহ মঙ্গলকর হয় না। তাই আবার বলে, বলতে বাধ্য হয়- দেখ বেটা আমরা নীচু জাত। বাভনঠাকুররা আমাদের কোনদিন ছোঁয় না। ছোঁয়া লেগে গেলে গায়ে মাটি লেপে চান করে। তারা কি সাধ করে শুদ্ধি ফজ করে? দেওতার আদেশে করতে বাধ্য হয়।

ছাড় তেমনি বীক করে বলে মণিরাম- বাপ তোর মুখ কিছু বলছে, মন আর কিছু। যা বসি বলে যা। দেওতা না ফেওতা। আমি ওসব মানি না। গাঁও সেয়ান মনে মনে রাগ হয়। সে এই গ্রামের সবচেয়ে বুদ্ধ, সবচেয়ে সম্মানীয়। তার পরিবার যখন বাভনদের হাত থেকে নিস্তার পায়নি, মণিরাম পাবে কেন?

বলে সে- তোর বহকে আশ্রয় করে মাতাসী যদি তার খেল দেখায়, অপশওণ অমঙ্গল হয়, কে দায়ী হবে?

আমি।

খরা হলে কি তোর একর ফসল মার খাবে? কোতরি ফুসলে কি তোর একর ঘর ডোবাবে? বাজ পড়লে কি একা মরবি? এরকম পাগলামো করিস না। আমি বলছি বহকে দিয়ে আর। ভালো হবে।

কিসের ভালো। সর্বনাশের পথ দেখাচ্ছিস। আর বলছিস ভালো হবে। ঝাঁকিয়ে ওঠে মণিরাম। গাঁও সেয়ান বুঝতে পারে মণিরাম মচকাবে না। কিন্তু গ্রামের আর সবাই ধরে নেয় সে আর সোজা সরল মানুষটি নেই। এই লিঙ্গনাথনের সীমানার বাইরে ডাকিনী ডাহিন আরও কত অপদেবতার অবাধ চলচল। তারা কত ছল কপট মারা চমৎকার জানে। মানুষের বুদ্ধি নাশ করে দেয়। মণিরাম এখন নষ্টবুদ্ধির মন্দ মানুষ। না হলে এমন কথা কেউ বলে।

আমরা সব আন্ধারে আছি। কেউ কিছু জানি না, বুঝি না। না হলে কেউ নিজের বউকে অন্যের ভোগে দিয়ে আসে। শুদ্ধিভুক্তির আছিলায় ওরা আমাদের বহবিটিদের নষ্ট করে। লিঙ্গনাথন এমন নিয়ম বানবাতে পারে না। এসব বাভনরা বানায়।

গাঁও সেয়ানের পিছনে হাঁটু মুড়ে বসা গাঁওবালে। তার পিছনে দরজার ওপারে মণিরামের

মাই সুকলিবাঁই। ছেলের কথার মধ্যে সে যেন কিছু অজ্ঞেয় অথবা অথচ কিছু নিটোল সত্যের সন্ধান পায়। পঁচিশ বছর আগে ঢোলকুরাম যদি সেই সত্যের সন্ধান জানতো, যদি একবার সাহসভরে বলতে পারতো-না। তাহলে একটা দুঃসহ স্মৃতির দংশন থেকে বেঁচে যেতো সুকলি।

কিন্তু ঢোলকুরাম এখন ভয়ে ভাবনায় অস্থির। বড়ই কাতর। অবাধ্য মণিরামের কোন অমঙ্গল হবে না তো। বহু বড়া রূপমতী। সারা বনরাজে এমন দুলহন কারও ঘরে নাই। জঙ্গলে প্রবাদ আছে সুন্দর শরীরে শয়তানীর বাসা। তারা মানুষকে মুগ্ধ মোহগ্রস্ত করে রাখে, বিপথে চালায়। কালো কুৎসিত বৌঁচা স্বীকারের দিয়ে মাতঙ্গী তার উদ্দেশ্য সফল করতে পারে না। তাই তার বিশেষ পছন্দ রূপমতী। বাভন দেওতার এ তত্ত্ব জানে, না-সামন্ত নাবালিকা রূপমতী কিশোরীর যেহি গহ্বরের অন্ধকারে মাতঙ্গী লুকিয়ে রাখে পাপের বীজ। স্বামী সহবাসে শুক্রানুর সাথে সেই বীজ প্রবেশ করে জরায়ুর মধ্যে। তারপর গর্ভস্থ সন্তানকে কবজা করে নেয়। দশমাস পরে যে সন্তান জন্ম হয় সে সাক্ষাৎ শয়তান। না মানে দেওদেবতা, না মানে বাপ মা। অব্যাক্ত কুখ্যাত বায়, অকথা কুখ্যা বলে জনজীবনের সুখশান্তি ধ্বংস করে কায়ম করে মাতঙ্গীর অরাজক রাজ।

ভাবে ঢোলকু, মণিরাম কেন কোন হতশ্রী কুৎসিত বউ ঘরে আনলো না। তাহলে তো কোন সমস্যা হতো না। বেশ কটা তেমন মেয়ে বউ হয়ে বনরাজে এসেছে। কাউকেই শুদ্ধি দেয় নি বাভনর। এক লোট দুখজল দূর থেকে ছুঁড়ে নিয়ে অক্ষত ফিরিয়ে দিয়েছে- লে যা।

এখন ঢোলকুরামের মাথা ঝাঁঝ করে। কি করবে আর কি না করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। শেষবারের মত মণিরামকে বোঝায় সে কথা মান বেটা। দেও ধরমের সাথে বের করিস না।

মণিরাম তবু অনড়, দেশ দুনিয়া দেখে এসেছি। কোথাও এমন গন্ধা ধরম নাই। আমি মানবো না লিঙ্গনাথনের নামে বাভনদের বদমাইসি চালাকি। যো হোগা দেখ লোকে।

দেওনন্দন মিশ্র বা আঞ্চলিক উচ্চারণে মিশ্রা বা মিশ্রা হয়ে গেছে, তারা এ অঞ্চলের আদি বাসিন্দা নয়। কোতরি নদীর বালি ছানলে রেণু রেণু স্বর্ণকণা মেলে এ খবর প্রথম যারা জেনেছিল, সুদূর অতীতে তাদেরই একদল সোনা সন্ধান নদীর অববাহিকা ধরে নেমে এসেছিল। নামতে নামতে পৌঁছেছিল দূর দুর্গম এই অরণ্য কন্দরে। এই অঞ্চলে তারা যে পরিমাণ বালি ছানলে যে পরিমাণ সোনা মেলে তাকে যথেষ্ট মনে না হওয়া সত্ত্বেও স্থায়ী বসবাসে মনোনিবেশ করলো। কেন না এখানে তারা খুঁজে পেলো সোনার চেয়ে দামি একদল সহজলভ্য মানুষ। যারা নিরীহ নির্বিরোধী এবং অবশ্যই নির্বোধ। দেবী দেবতার নামে ভয় দেখিয়ে যাদের ইচ্ছামত ব্যবহার করা চলে। ব্যবহৃত হতে আপত্তি করে না। প্রলভ তোলে না উচ্চিতা নিয়ে।

আর মিশ্রা ফিরে যায়নি। ঝাঁট গেড়ে বসে গেছে বনরাজের ক্ষমতা কেন্দ্রে। আঞ্চলিক মানুষের শ্রম ঘামের মুনাফা দখল করে নিয়েছে কুট কৌশলে। বোকা সোকা লোকদের সামনে

অদৃশ্য আতঙ্কের আজওবি গল্প ফাঁদে নিজেদের সমুদ্র করেছে ইহজাগতিক যাবতীয় সুখে।

বহির্বিষয়ের সাথে এই অঞ্চলের বিশেষ কোন যোগাযোগ নেই। তার তেমন দরকার পড়ে না। বনকে কেন্দ্র করে বুনো মানুষগুলো স্বাবলম্বী। তাদের চাহিদা তো তেমন কিছু নেই। সামান্য কিছু মশলাপাতি, বছরে এক আধটা কাপড়, চা-পাতা শুড় খইনি আর নুন। সে তার মিশ্রদের কাছ থেকে পেয়ে যায়। কয়েল গাড়ীর এক গাড়ী কাঠ, কি আধ বস্তা ধান দিলে ওরা বা নুন দেয় একমাস হেসে খেলে চলে যায়।

এ অঞ্চলে এখনও নগদ টাকার প্রচলন ততটা ব্যাপকতা পায়নি। মানুষ বিনিময় প্রথায় বেশি আস্থাবান। তাদের কাছে থেকে ওই প্রথায় পাওয়া ধান গম মকই তিল সরষে মিশ্রা গরুরগাড়ী ভরে প্রতাপগড় পাঠায়। সেখানে হাট বসে, হাটে ট্রাকে আসে। ট্রাকে মাল চালান হয় শহরে।

ফেরবার সময় গরুর গাড়ীতে বোঝাই হয় বনরাজের মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। নিজেদের অতি প্রয়োজনীয় তেল ঘি সাবান গরম মশলা আর আতুর মার্কা মদ।

প্রতাপগড় বাজারে বনরাজের চরবাহা চামরাহা মানুষেরা যেতে পারে না। বাভন পণ্ডিতরা যাবার অনুমতি দেয় না। তবে তার চেয়ে বড় বিপদসংকুল পথ। পথে পথে পাক খায় ভূত শ্রেত ডাকিনী ডাইন। যারা ব্রহ্মতেজা ছাড়া কাউকে রেয়াৎ করে না। ঘাড় মটকে রক্ত খায়। কথাটা মিথ্যা নয়। এই তো বছর তিন চার আগে মউহা বিনতে বিনতে নহরু রামের বোন রমিলা বনরাজের সীমার বাইরে গিয়ে ভূতের পালায় পড়ে গিয়েছিলো। গরম শিকের ছাঁকা দিয়ে ভবেই ভূত তাড়ানো যায়। মণিরাম কেমন করে রক্ষা পেলো সেটাই বিস্ময়।

দেওনন্দন মিশ্রা এখন আতুর মার্কা মদে শরীর মন চাপা করে লিঙ্গনাথনের মন্দিরে এসেছে। একটা বোতল আরও সাথে। শুদ্ধিযজ্ঞে মদ অতি আবশ্যিক। ঢোলকুর বোটা যা দেবে সে তো মদ্য। বয়স হয়েছে। আজকাল আর মদ্যার কড়া মদ শরীরে সয় না। আর দু এক বছর, তারপর পূজাপাঠ, বনরাজের ভার অন্য কাউকে দিতে হবে।

মন্দিরের সিঁড়িতে চড়বার আগে চারদিকে চোখ ফেরায়। কই, নেই তো। নিয়মমত মণিরামের নতুন বউতো সিঁড়িতে বসে থাকবার কথা। একদম ডবকা ছোকড়ি। দুপুরেই খবর পেয়েছে দেওনন্দন। সে খবরও পেয়েছে, মণিরাম খাড় কেলাছে। তারপরই তো বলে পাঠিয়েছে সন্ধ্যা হবার আগে বউ পাঠা। তবে কি ধমকিতে কোন কাজ হয় নি।

আর একবার চোখ ফেরাতে দেখতে পায়, ঢোলকুরাম হীপাতে হীপাতে ছুটে আসছে। এসে বাভন দেবতার গায়ে যেন ছায়া না পড়ে ততদূর থেকে ইটুঁমুড়ে আতুঁমি প্রণত হয়। দেওনন্দন ডান পা তুলে সমবয়সী ঢোলকুকে আশীর্বাদ জানায়।

বল।

কৈদে ওঠে ঢোলকু, পায়ে পাড় বাভন দেওতা। মোর লেরকা অবুঝ। তারে মাফ করে দে। মাফ! সে আবার কি পদার্থ। আতুর মার্কা রসের ধারায় মুড়টুড বানিয়ে, একদম ডবকা

ছোকড়ি শুদ্ধ করতে এসে এসব কি বিবিসির কথা শুনেতে হচ্ছে। পেটের মদের আগুন জ্বলে ওঠে। তবু ধীর গলায় বসে সে - মাফ করার আমি কে? লিঙ্গনাথনের নিয়ম। বনরাজের সবাই মানছে। মণিরাম কি অন্য নাকি।

কैसे চলে ঢোলকু - বাভন দেওতা, তুই তো কতজনাকে মাফ দিয়েছিস। ছুয়েও দেখিস নি। আমার লেরকার নাদান বউটাকে রক্ষা কর।

কি সে আর কি সে। যাদের ছাড় দেওয়া হয়েছে সবকে সব যেন পচা পোকা কবের মরা। কাছে দাঁড়ালে বেটিকা গন্ধ নাকে এসে কামড়ায়। কতকাল চান করে নি কে জানে। করলেও ভালভাবে করে নি। তাও যদি দেখার মত রং রূপ হতো। কোনটার দাঁত উচু যেন রাক্ষসী, কোনটার চোখ ডাবডাব। দেখলেই ভক্তি উবে যায়। আর মণিরামের বহু নাদগাঁওয়ের ডবকা ছোকড়ি। রোজ চান করে, সাবান মাখে - আর গরম মশলা খায়।

বলে সে - এটা দেওস্থান। দেওতার বিধান সবাইকে মানতে হবে। মণিরামের বহুর কথা সব শুনেছি। অত যার রূপ মাতঙ্গী নিশ্চয়ই তাকে মুক্তে ছাড়ে নি। যার পরখ শুদ্ধি না করে মাফ দিলে বনরাজা ধ্বংস হয়ে যাবে। যা, জলদি ভেজ।

ভয়, বড় ভয় করছে দেওনন্দনের, আবার কি আর এক বুধুরাম পরলা হলো নাকি। যার চোখে অন্ধকার নেই, যে বাভন দেবতার রোষ উপেক্ষা করতে পারে - তাহলে যে মহা দুর্দিন আসন্ন। মণিরামের মধ্য দিয়ে এককাল ধরে ঠেকিয়ে রাখা সভ্য জগতের নিয়মনীতির যদি অনুপ্রবেশ ঘটে, জঙ্গলের রাজত্বে মিশ্রামের সুরক্ষাবলয় ভেদ হয়ে যাবে। সমূহ সর্বনাশ, প্রভাব প্রতিপত্তি সব শেষ।

চোখ লাগল হয় দেওনন্দনের। এতকাল ধরে ঠেকিয়ে রাখা জ্বাধ দরজা খাঁকায়। না, অত বড় দুর্ঘটনা, ঘটতে দেওয়া যাবে না। মণিরামের মধ্য দিয়ে যে অমঙ্গলের দেবতা শনি মহারাজের অনুপ্রবেশ লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে, তাকে চিরতরে বিনাশ করে দিতে হবে।

এবার তার গলায় মেঘের মত গর্জন। যে গর্জনের পরই বাজ পড়ে। যা ঢোলকু - ছেলেকে গিয়ে বোঝা। তুই তো বুধুরামের কথা জানিস। মনে আছে কি, নেই?

দেওতা মহি বাপ।

আমার এক কথা, সুকজ ভোবার আগে বন্ধকে সিঁড়িতে বসা চাই। না হলে - বুকে দেখ কি হবে।

কি হবে তা ঢোলকুরাম ভালোমত জানে। তাই এমন পাগলপানা দয়া ভিক্ষা করতে ছুটে আসা। কিন্তু বাভনের দয়ামায়া নেই। তার চোখে লক লক করছে লোভ। লালা গড়াচ্ছে।

ঘরে ফিরে এসে মণিরামকে বলে ঢোলকু - যে ওদের বিলাফ যায়, ওরা মেরে দেয়। বাপ আমার, তুই একলাতা বেটা, তোকে হারিয়ে আমরা কি করে বাঁচবো? তারপর তার গলায় জমা হয় একরশ দুঃখ বেদনা, বাপ আমার দেওনন্দন মানুষ নয় একটা জানোয়ারের চেয়ে

বদতর। তোর মায়ের শুদ্ধি হয়েছে। কেমন করে তা হয় আমি দেখেছি। তিনদিন তি-ন-রা-ত। সুকলির কান্নায় পাথর গলে গেছে, বাভনরা গলে নি। আরে শেয়াল কুকুরে যে মরা ছেড়ে, তাও একটু দেখে বিচার করে। ওরা করে না।

মণিরাম চুপ করে আছে। কিন্তু তার বুকের অতলে নিঃশব্দে কড় উঠেছে। দেওনন্দন মিশ্র তার মাকে সদলবলে নির্মমভাবে ধ্বংস করেছিল। কোন অনুতাপ হয় নি, জাগেনি কোন ন্যায় অন্যায়বোধ। এখন কন্যাসমা মণিরামের বউকে লাগসার শিকার বানাতে চাইছে।

আবার বলে ঢোলকু - চলে যা --

না, একটা বিরাট শব্দ আছাড় খায় ঘরের দেওয়ালে। সেটা সুকলির গলা, মাত ভেজ। তোরা কি জানিস, আমি জানি শুদ্ধি কত যত্নশীল কত অপমানের।

ফুঁপিয়ে নয়, হাহাকারে কৈসে ওঠে সুকলি। বিশ বাইশ বছর আগেকার সব হারানো শোক উথলে উঠে দু গাল বেয়ে নামে। চরম অবমাননাকর সেই দুর্বিসহ মুহূর্তগুলো যেন সাপের মত ছোবল মারে। বাপরে, আমি জানি। মাত ভেজ।

সুকলি একটু শান্ত হলে বলে ঢোলকু চলে যা। রাত রাতে বন্ধকে নিয়ে পালিয়ে যা। বনরাজ্যে আর আসিস না।

তোরা কি করবি? উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চায় মণিরাম। আমাদের জন্য ভাবিস না। যা হয় হবে।

তখনও সূর্য ডোবেনি, সন্ধ্যা আসে নি। তবু যেন চারদিকে গ্রাস করে নিয়েছে অতল অন্ধকার।

বলে মণিরাম - তোরাও চল।

কোথায়?

বনরাজ্যের বাইরে।

ঢোলকু কথা বলার সুযোগ পায় না। তার আগে বলে সুকলি - যাবো। পাঁচ সাল বাদ এলি, তোকে একলা ছাড়বো না। আমি যাবো। তেমন কিছু নেবার মত নেই। শুধু মণিরাম বাপের কাঠকটা টাঙ্গিখানা সাথে নেয়। বন জঙ্গলের অন্ধকার পথ। পথে কত বিপদ। বাঘ ভালুক আরও কত কি। টাঙ্গি থাকলে ভরসা থাকে।

নিঃশব্দে চারজন ঘর থেকে বের হয়ে বনের ঝোপঝাড় মাড়িয়ে কেতরির বালু পথ পেরিয়ে এসে দাঁড়ায় এ প্যাড়ের বিশাল অর্জুন গাছতলায়। একটু থেকে কি যেন ভেবে বউকে বলে, শাড়ি দে। বাপকে বলে একটু দাঁড়া, আমি যাবো আর আসবো।

কোথায়। বাপের বিহবল প্রশ্নের জবাবে বলে মণিরাম - শুদ্ধি করে আসি।

তখনও অন্ধকার চোখ চেপে ধরে নি। অথবা রাতচরা ঝাপদেরা অন্ধকারে ভালোই দেখে। পূজাপাঠ সমাপ্ত করে আশাহত ভগ্নমন নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে থাকে দেওনন্দন।

রাতটা আজ জমে যাবে আশা ছিল। মণিরামটা বিগড়ে গেছে। ওকে ঠিকঠাক করতে হবে। হঠাৎ তার চোখে পড়ে সিঁড়ির শেষ ধাপে।

আরে এতো সেই ডবকা ছোকড়ি। বুকটা তার দুলে ওঠে। মণিরামের তাহলে শেষ পর্যন্ত সুখুখি হয়েছে। ভালোই হলো।

কাছে গিয়ে নতুন বছর ঘোমটা সরিয়ে দেওনন্দন অবাক। ডবকা ছোকড়ির মুখে অমন পুঞ্জালি গৌফ কেন। আর হাতে কেন ধারালো টালি। সে একবার টালি গুন্যে উঠতে দেখলো, একবার নামতে। তার সব প্রশ্নের জবাব লুকানো ছিল ওই ওঠা নামায়।

ঠিকানা

গৌতম আলী

“আল্লা, মেহেরবান। তুমি আমাদের ক’রে দাও—কোনজা আমার দ্যাশ। তোমার বানানো এই জমিনে ক’নে এঁটো শান্তিতে থাক্তি পারব....” নামাজ শেষে ডুকরে কেঁদে ওঠে বুড়ো। কাঠকাটা রোদে গাছতলায় বসে নামাজ পড়ছিল। বয়সের হিসাব নেই তার। ন্যাড়া মাথা, দাঁতগুলো ঝরে গেছে। রোগা দেহ। ছেঁড়া গামছা পেতে নামাজ পড়ছিল সে।

ঠিকানা নেই বুড়োর। অথচ মেহেরবান আল্লা পয়লা করেছিলেন যখন, ঠিকানা তার একটা ছিল বৈকি। এই বাংলায়-ই। সে ঠিকানার কোন পূর্ব ছিল না, পশ্চিম ছিল না। পূর্ব পশ্চিমের মাঝে কোন সীমানাও ছিল না। এক আধা গঞ্জে তাঁর জন্ম। বাপের ছিল ছোটখাট ব্যবসা। পাটের ব্যবসা, তিলের ব্যবসা, মরওমে কিনে জমাত। আবার সুযোগ বুঝে পাইকারী বিক্রি করে দিত সব।

অনেকগুলো দিদির পর জন্মেছিল বুড়ো। খুশীর জোয়ার বয়েছিল দাদা-দাদী নানা-নানীদের মধ্যে সবার মধ্যে। সেই খুশীর আমেজেই এক এক করে সাদি হয়ে গেল সব কটা দিদির। একসময় ধুমধাম করে বিবি এল তার ঘরে। আবার বাপ হতেও সময় লাগল না তার।

এই সময় কি সব ওলট পালট হয়ে গেল। তাদের দেশটা নাকি আর তাদের নেই। ভাগ হয়ে গেছে সেটা। দেশের মধ্যে সীমানা তৈরি হয়ে গেছে। শুধু সীমানাই তৈরি হয়নি—তাদের পরিচয়ও পাশ্টে গেছে। তারা আর বাঙালী নেই—মুসলমান এবং পাকিস্তানী।

দঙ্গ-হাসামা হল। বাপ নির্বিকার। খুব-জব্বম হল। ভয়ে মানুষ বাড়ি ছেড়ে পালাতে লাগল। বাপ অনড়। এ মাটি তার, তার বাপের। তার পূর্বপুরুষের। এ মাটি ছেড়ে সে যাবে না। কারা কোথায় বলল—এ দেশ তার নয়, সে কথা মানবে কেন? তার সারা জীবনের ঘাম, আশা—এই মাটিকে ঘিরেই। সে এটা ছাড়বে না, কিছুতেই না।

দেশ ভাগ হ’ল। এদেশ থেকে মানুষ গেল। ওদেশ থেকে মানুষ এল। দাঙ্গা থিতুয়ে এল। বুড়োর বাপ কিন্তু ভিটে ছাড়ল না। তারপর এল একটা রাত। যে রাতটার কথা সে ভুলতে পারে না। যে রাতটা তার সারা জীবনের হিসেবনিকেশ তছনছ করে দিয়েছে।

বাপ শুয়ে পড়েছিল। শুয়ে পড়েছিল মিয়া-বিবিও। এমন সময় কিছু মানুষের চিংকার চোঁচামেচি কানে এল। ক্রমশ সেটা বাড়ল। বাড়তে বাড়তে একসময় জোর ধাক্কা মারল তাদের সদর দরজায়। বেদম ধাক্কা, গালিগালাজ। মানুষেরই তবে অন্যরকম মানুষের। ভয়ে কঁকড়ে গেল বুড়ো। বুড়োর বাপ কাশতে কাশতে বিছানা ছেড়ে এল বারান্দায়। বুড়ো তার বাপকে চিংকার করে বলল—দরজা খুল না—আব্বা।

ওর ভয়ান্ত আবেদনে সাড়া দিল না তার বাপ। এগিয়ে গেল, দরজা খুলল। হুড়মুড়িয়ে ঢুকল

কিছু উত্তেজিত মানুষ। অকথা গালিগালাজ করতে করতে আদেশ করল—বাঁচতে চাস্ তো বেরিয়ে যা এখুনি। বাপ সামনে দাঁড়াল তাদের। দুহাত তুলে বলল—“চলি যাও তোমরা। এ বাড়ি আমার, আমার বাপের, আমার চৌদ্দ পুরুষের। এ ভিটে আমি ছাড়বনি। কোন মতেই না। পুরান থাক্তি না, চলি যাও তোমরা—চলি যাও—” উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল বাপ।

কিন্তু বুড়োর বাপের গলার জোর থেকেও ওদের গলার জোর আরো বেশি। তাই ঢাকা পড়ে গেল তার বাপের গলা। বাপকে জোর খাড়া দিল একজন। বারান্দার থামের উপর আছড়ে পড়ল বাপ। লুটিয়ে পড়ল... আল্লা বলে। জ্ঞান হারাল। সে জ্ঞান আর ফিরল না। নিজের বাপের ভিটে থেকেই সোজা চলে গেল আল্লার দরবারে।

ঠিকানা বদলায় বুড়োর। বিবি ছেলেকে নিয়ে উঠল গাঁয়ের এক আখীরের বাড়ি। পরের জমিতে আক্তানা গড়ে উঠল নতুনভাবে। কিন্তু নতুন আশায় বুক বাঁধতে পারল না। সব খুঁইয়ে কোন রকমে দিন গুজরান করতে লাগল। তার প্রতিদিনের দীর্ঘশ্বাসের জড়িয়ে গেল একটা ধন্দু—এদেশ তার নয়, অথচ এটা তার বাপের দেশ, এটা তার জন্মভূমি।

ছেলে বড় হয় ধীরে ধীরে। বায়না ধরে পাকিস্তানে যাবার। শুধু বায়নাই ধরে না—একসময় কিছু বন্ধুর সাথে চলেও যায়। সে-ই কয়েকমাস পরে আবার ফিরে আসে আরো বড় স্বপ্ন নিয়ে। এবার নিয়ে যাবে সে তার বাবা-মাকে। সেই স্বপ্নের দেশে—যে দেশ একেবারেই তাদের, মুসলমানদের। মুসলমান হিসাবে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে পারবে সেখানে। পরের দরায় থাকতে হবে না।

ছেলের আশ্বাসের কাছে পরাস্ত হয় বুড়ো। হারানো আশা ফিরে পেতে চায় সে। বিধা-ধন্দু কাটিয়ে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করে—কিন্তু বাপ, সেখানে গেলে খাব কি? থাকব কোথায়?

সে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমার বন্ধুর চাষের অনেক জমি। উত্তর দেয় ছেলে। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে বুড়োর। আরেকটা নতুন ঠিকানা। আরো একজন মানুষের কাছে চেপে।

বুড়ো চলে নতুন আশানায়। নতুন কিছু মানুষের সাথে আলাপ হয় তার। তবে কিছুই নতুন লাগে না। নতুন মানুষগুলো কথা কয় তারই মত, একই ভাষায়। দিনে পাঁচবারই নামাজ পড়ে তাঁরা। কিন্তু সবাই নয়। কারণ মুসলমানের পাঁঠস্থান পাকিস্তানে সবাই মুসলমান নয়। সম্ভ্রায় উলুধনি ভেসে আসে গাঁয়ের কোন কোন ঘর থেকে। মন্দিরে যত্না বাজে, দূরে দেখা যায় গির্জায় চূড়া।

কখনও একাধী নির্জনে ভাবনায় পেয়ে বসে বুড়োর। মন্দির-গির্জা-মসজিদ—সে তো এখানেও আছে, ওখানে ছিল। ওখান থেকে সবাই তারা চলে আসে নি, এখান থেকেও সবাই ওখানে চলে যায়নি। এখানে হিন্দু যারা রয়ে গেছে—তারা কিভাবে বেঁচে আছে? সে কি তার মতই—যেমন সে ছিল; ভয়ে—আশাহত হয়ে? এরা যদি এদের জন্মভূমি আঁকড়ে থাকতে পারে, যেমন আরো অনেকে ওখানে রয়ে গেছে, সে কেন পারে না? সে কেন চলে এল তার

বাপের ভিটে ছেড়ে?

ধর্ম পেষ্টের ভাবনা থেকে নিস্তার দেয় না। সেটা বুঝতে পারে বুড়োর ছেলেও। দিন-রাত ধান্দায় ঘোরে সে। ইতিমধ্যে সংসার বেড়েছে তার, আর বেড়েছে অন্যের গলগ্রহ হয়ে বেঁচে থাকার যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চায় সে। মুক্তির আশায়, বাঁচার তাগিদে, ছেলের পিছু পিছু আবার সীমানা পেরোয় বুড়ো। আবার সে পা রাখে তার বাপের, তার ছেলের জন্মভূমিতে। বুক ভরে জন্মভূমির বাতাস নিতে নিতে বুড়ো বহু দূরের, ভিন রাজ্যের খুপড়ির বাসিন্দা হয়ে যায়। আরো একটি নতুন ঠিকানা। নির্বাসিত মাতৃভাষার মধ্যে বেড়ে ওঠে তার সন্ততিরা।

সংসার চলে যায় ভালোই। খাবার জোটে নুবেলা। ছেলে কাজ করে, ঘরের বউকে কাজ করে ধনী লোকের বাড়িতে। লায়েক হয়েছে নাতি। সিনেমার হিরো সেজে ঘুরে বেড়ায়। কাজ কিছু একটা করে সেও—তবে কি কাজ বুড়ো জানে না। কথা শুনে মনে হয় সে তার মায়ের ভাষাটা ভুলেই গেছে। একটা টেপেরেকর্ডার কিনেছে। তাই বাজিয়ে ধাই-ধাই করে নাচে ঘরের মাথো, আর এইভাবে নাচতে নাচতেই একদিন নাচ-বৌ ঘরে তোলে সে।

পাকা দাড়ি আর টাক মাথার কথা ভাবতে ভাবতে বুড়ো ভুলেই গিয়েছিল নিজের পরিচয়। সে ভাবছিল সাড়ে তিন হাত জমির কথা। যেখানে সে শোবে শেষ বারের মত, তারপরে চলে যাবে আকা আশ্মার কাছে।

কিন্তু সে ভাবনায় ছেল পড়ল বুড়োর। চাপা গুঞ্জন স্রব হ'ল একসময়। আবার সে চিহ্নিত হয়ে গেল ‘মুসলমান’ হিসেবে। শুধু মুসলমান নয়, সঙ্গে আরো একটি নাম—‘অনুপ্রবেশকারী’।

ধর্মনিরপেক্ষতার পোষাকে বুলডোজারে চলে বসল প্রশাসন। হঠাৎ গেল ওঁড়িয়ে। তার আদরের নাতিটা কাজ থেকে বাড়ি ফেরেনি তখনো। তাকে ছেড়ে পুলিশের গুঁতো খেয়ে গাড়িতে উঠল সবাই। খালি হাতে, তিনদিন পরে—আরো গাড়ি পাল্টে, আরো অনেকের সাথে, আবার তারা চলে এল সেই সীমানায়, স্বদেশের সীমানা, বা বুড়ো এর আগে দু'বার পেরিয়েছে।

চিহ্নিত সীমানা পেরোতে হ'ল চিহ্নিত হয়েই। দাগী চোরের মত সমস্ত বেঁটা ছেলেদের মাথা অর্ধেক কমিয়ে সীমানার ওপারে ঠেলে দিল প্রশাসন। বাচ্চা বুড়োর আঁকড়ে রাখা শেষ সম্বল ঝাঁক-কঞ্চল টেনে হিঁচড়ে নিয়ে জ্বালিয়ে দিল আগুনে।

বন্দুকের বাঁটের খোঁচায় ‘দেশ’ পেরিয়ে ‘দেশে’ ঢুকতে গেল বুড়ো, বুড়োর দল, কিন্তু কিছুটা এগিয়েও ‘দেশে’ ঢুকতে ধমকে দাড়াতে হ'ল তাদের। তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে আরেক দল বন্দুকধারী—একেবারে পিছনে ফেলে আসা ওদের মত, কেবল পোষাক একটু আলাদা। বন্দুক উচাল তারা। এদেশও তাদের নয়—অবাক্তিত তারা।

কেটে গেল চারটে দিন। অনাহার, অনিদ্রায়, খোলা আকাশের নিচে পড়ে রইল তারা।

একদিকে স্বদেশ—অন্যদিকে স্বধর্মের দেশ,—অথচ কোন দেশেই চাকরির অধিকার নেই তাদের। মাঝখানের আমবাগান-ফলাবাগানের সামান্য একটু জমি, যা সরকারি ভাষায়—'নো ম্যানস্ ল্যান্ড'। তার গাছ ভল্লায় ছেঁড়া গামছা পেতে দিনরাত আল্লার দরবারে করুণ আর্জি জানাচ্ছে বুড়ো—আল্লা মেহেরবান। তুমি আমারে ক'য়ে দাও—কোনটা আমার দ্যাশ? তোমার বানানো এই জগতে ক'নে এটু শান্তি থাক্তি পারব.....?



কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মরণে

বিনোদ বেরা

সূচনায় ছিলে প্রেম প্রশান্তির দিকে
কিন্তু দেহ সংঘ ও সময়
অবিচার ব্যাভিচারে অস্বাস্থ্য অসাম্যে
ক্রমে হয়ে উঠলো জঘন্য নরক,
সে সময় আর কোন রূপবান বিশ্ব শিল্পকৃতি
সরল বিশ্বাস স্থির থাকে।

আত্মহীনতার প্রাণি
গীত কীটা ঘাম রক্ত
কষ্টের আঘাতে
দেশের সন্তানদের ভাইদের
বদলে যাওয়া মরে যাওয়া দেখে
অস্থির হৃদয় নিয়ে বাস্তবের কঠিন মাটিতে
দাড়িয়ে নিজেকে যেন শেখবার ভ্রম শূন্য করে নিলে।

স্বপ্নের রঙিন চুনকো নিষ্ঠুর তামস ভেঙে
মুখ ও মুখোস চিনে এবং চিনিয়ে
রক্তে নিয়ে সর্বহারা নিরস্ত্রের ব্যথা
নীলকণ্ঠ রুদ্র হলো, ফোঁড়ে অভিমানে
তখন কবিতা তীর অন্ধকারে আগুনের ফুল।

ক্ষুধা আর বঞ্চনার বলি যারা
জল আর আগুনের মতো
তারাই তোমার প্রাণ জুড়ে থাকে।

মানুষের পৈশাচিকতার
মূৰ্খতার অপদার্থতার প্রতি জ্বলে—
মুক্তহীন ভক্তভাড় জ্বলদণ্ডির পিঠে
কবিতা তোমার
কড়া হাতে তখন চাবুক।

মানুষের দুঃখ কষ্ট বেদনাকে যুকে
শিখের শরীর থেকে
ঝরে যায় অলংকার লতাপাতা
সুখ সৌখিনতা
ভুল ফুল স্বপ্নের রঙিন,
স্বদেশ ক্রমশ বড় পৃথিবীর অন্তর্গত
তোমার কলম স্বজু ভানহীন
আড়াল আবড়াল হীন
সকল অন্যায়-ধ্বংসী অস্ত্র যেন এক।

ঐতিহাসিক মেনে নিয়ে
মানুষের প্রয়োজনে ঐতিহ্য ভেঙে
যে পথে তোমার যাত্রা
গুচ্ছ সুকঠিন সেই মানসিক পথে
আজ আমরা অনুগামী হতে চাই কবি।

দেশদ্রোহ

অসীম বিশ্বাস

ক্রম বন্ধনার শেষে উত্তেজনায়
উত্তেজনায়
যে কবিতার জন্ম হয়
তার নাম বঙ্গ
ক্রমবন্ধনার শেষে রাগের শব্দে
এক একটি ডিটোনেটর
রাগের অক্ষরগুলি গোল পাকাবার
সুতোর মতো
তা ঘনীভূত ক্রমধুমায়মান ক্ষোভে
একদিন অগ্নিসংযোগ করে
এবং এভাবেই প্রলয়ের জন্মক্ষণ
সূচিত হয়।

জারী থাকুক যুদ্ধ

সুশান্ত সর্দার

ঘুট ঘুটে অন্ধকারের মধ্যে, অন্ধের মতো
দুটি হাত সম্মুখে প্রসারিত করে
খুব সাবধানে এগিয়ে চলেছি বাঁচার সন্ধানে

দাউ দাউ করে জ্বলছে আমার কুঁড়ে ঘর
পুড়ছে আমার আত্মীয় পরিজন আমার মন
আগুন বাহিরে ও ভিতরে

হাজার হাজার বছরের মানুষের শ্রমে অর্জিত
মানব সভ্যতাকে বারে বারে স্নান করেছে
হিংসে পশু নরখাদকের দল
এরা থাকে সমাজে মানুষের মধ্যে মুখোশ পরে
মানুষ সেজে, চেনার উপায় নেই, চিনতে পারি না

সেদিনও ছিল এমন দিন চারদিকে আগুন মৃত্যু
রক্তের ঘোতে সন্তান আর স্বজন হারানোর বেদনা
বন্ধু সেজে সান্তনা দিতে বাড়িয়ে দিয়েছিল
বন্ধুত্বের হাত এরা, বলেছিল জীবনের কথা
জয়ের কথা, বাঁচার কথা

বুঝিনি সেদিন এরাই হানবে আঘাত জ্বালাবে আগুন
নেভাবে জীবন, শিশুঘাতী, নারীঘাতী পশুর দল
তাই আজও ঘুট ঘুটে অন্ধকারের মধ্যে, অন্ধের মতো
দুটি হাত সম্মুখে প্রসারিত করে
খুব সাবধানে এগিয়ে চলেছি মানুষ ও জীবনের
সন্ধানে।

ঘুট ঘুটে অন্ধকারের মধ্যে, অন্ধের মতো
দুটি হাত সম্মুখে প্রসারিত করে
খুব সাবধানে এগিয়ে চলেছি বাঁচার সন্ধানে।।

কবি - পেশায় শ্রমিক - অশিক্ষিত

এক বাতিল মানুষের ফিরে দেখা

বাপী মন্ডল

কেমন কোরে শুরু করবো সেটাই ভাবছি। এই কারণে যে, আমি একজন কম লেখাপড়া
জানা অভিসাধারণ মানুষ। বলার কথাগুলো যে লিখে জানাবো সেই ক্ষমতাটা আমার নেই।
অথচ অনেক জমে থাকা কথাগুলো এত সব কঠিন কঠিন প্রশ্নের জন্ম নিয়ে চলেছে, যে, তার
উত্তর খুঁজে পাই না এবং কাউকে বলতেও পারি না। প্রশ্ন আর না জানা উত্তর এই দুই মিলে
আমার ভিতরে শান্ত মানুষটাকে জ্বালিয়ে মারছে। ভেতরে ভেতরে এই অশান্তির একটি দোষ,
যতক্ষণ না তাড়াতে পারছি, ততক্ষণ স্থিতি নেই। তার মানে কাউকে বলা এবং গুছিয়ে বলা বা
কোথাও লেখার সুযোগ পাওয়া আমার স্বস্তি আনতে পারে। আমি বলতে পারি না সেই
কথাগুলোই যেগুলো প্রশ্ন তৈরী করে আমাকে যন্ত্রনা দেয়। অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন উত্তর সেবো কি
করে?

না বলা কথাগুলো একদিন আমায় প্রশ্ন করলো - তুমি মানুষ হয়ে জন্মালে কেন? সে হালুয়া
এ আবার কেমন কথা? পশু হয়ে জন্মালে কি তুমি খুশি হতে? আমি বললাম মানুষ হয়ে জন্মে
কি মানুষের অধিকার পেয়েছি? আমাদের মতো দীন দরিদ্র হাভাতের দল তো এরকমই অবস্থার
থাকে। পশু হয়ে জন্মালে হয়ত অনেক কিছু ভাবার সুযোগ থাকতো না। মানুষ একা থাকলেও
নিজেকে নিয়ে, নিজের নিকটজনকে নিয়ে, নিজের পাড়া নিয়ে, নিজের সমাজ নিয়ে, হয়তো
দেশ দুনিয়া নিয়ে ভাবতে বাধ্য হয়। তোমার জীবনের বঞ্চনা, লাঞ্ছনা, শোষণ পীড়ন, দমন
এসবই জন্মের কিছু দিন বাদ থেকেই বুঝতে পারা যায়। এখন সেই সব দিনগুলি আমাকে তাড়া
করে বেড়ায়।

যে সব যন্ত্রনা জীবনে ভোগা যাবে না তা কার সাথে কথা বলে যন্ত্রনা অবসানের পথ
খুঁজবো। আমি যখন নিজেকে মানুষ বলে দাবী করি, তখন এই যন্ত্রনার জন্মদাতা কে তাড়ো
জানতেই হবে।

আমার যখন ৫ (পাঁচ) বছর বয়স, তখন আমার বাবা মারা যায়। বড়দা পাগল, মেজদা,
সেজদা রাজনৈতিক কারণে পাড়া ছাড়া। আমার যখন বয়স ১০ বছর তখন বুঝলাম যে আমার
বাবা, যিনি ছিলেন একজন দীনমজুর, সাধারণ রোগে কিম্বা বিনা চিকিৎসায়, প্রায় অনাহারে
মারা যায়। বাবা মারা যাওয়াতে আমার অনিশ্চিত জীবন শুরু হলো। ঐ বয়সে খিদে সহ্য
করতে পারতাম না। কতবার খিনের জ্বালায় অজ্ঞান হয়ে রাস্তায় পড়ে গেছি তার হিসাব নেই।
মা বাবুদের বাসন মাজার কাজ পাওয়াতে কিছুটা রেহাই পেলাম। আমার এক দাদা তখন খুঁটে
খেতে শিখেছে। ময়লার ঢিবি থেকে লোহা লকর, পোড়া কয়লা, পুরানো ববরের কাগজ
যোগার করে তা বেচে দিন চালাতো। ঐ বয়সে তার সাথে মাল বওয়া আমার কাজ ছিল।

তারও আগে মা যখন কাজে চলে যেতেন, আমার কোমড়ে মুড়ি বেঁধে দরজার সঙ্গে বেঁধে রেখে সামনের একটা কলাই-এর থালাতে মুড়ি রেখে চলে যেতেন। যাদের দরিত্র্যে রেখে যেতেন তারা ছিল আমার বন্ধু আর খেলার সাথী। তাদের সাথে এক থালা মুড়ি ভাগাভাগি করে খেতাম, আমার জীবনের শুরু সেই দুই বন্ধু লালু আর কালু (বাড়ীওয়ালার পোষা নেড়িকুকুর) আমার বহু দিনের সাথী ছিল। জীবনের শুরুতেই মানুষ আর পশুর তফাৎ বোঝার উপায় ছিল না। বড় হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করেছি অনেক উত্তর পাইনি। পশুর, সে লালু কালু বা অন্য যাই হোক, খাবার জুটে যায়, রাতের আশ্রয় পায়, তাদের নিজের মতো করে সংসার করে, সন্তান পালন করে।

আমার ভাবনার যখন বাড়ার সময় হলো, জন্ম নিলো প্রশ্নের। আজো হাজার প্রশ্ন জন্মে চলেছে উত্তর নিতে পারিনি একটাও প্রশ্নগুলো ছিলো বড় সহজ। আজগুবি, স্বাধীনতা, ফ্রিডম-কর স্বাধীনতা, কিসের স্বাধীনতা, কোথায় স্বাধীনতা, খুঁজে চলেছি পথে ঘাটে, হাটে, মাঠে পাড়ায় অঞ্চলে শহরে গ্রামে, পুরুষে নারীতে শিশুতে বৃদ্ধিতে জন্মতে মৃত্যুতে শান্তিতে চলে ডালে তেলে খিদের পাতে তন্ন তন্ন করেও খুঁজে পাইনি আমার স্বাধীনতাকে।

স্বাধীনতার স্বরশে প্রতি বছর শত শত কোটি টাকা খরচ করে চলেছে আমাদের দেশের ভণ্ডরাষ্ট্র নায়কের। স্বাধীনতার কত বছর প্রায় অতিক্রান্ত, আজও কোটি কোটি মানুষ দরিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে কয়েক কোটি মানুষ একবেলা খেয়ে বেঁচে আছে, তারপরেও আমাদের শোনানো হয় দেশপ্রেমের গান, সারে জীহাসে আজো হিন্দুস্থানি হামারা, ইত্যাদি ইত্যাদি, না গ্রানে সয় না মনে। দেশ আমার চৈতন্যে ভাসে, রবীন্দ্রনাথে ভাসে, আর অপুষ্টি বিনা কোলের সন্তান হারিয়ে লক্ষ কোটি মায়েরা আমার চোখের জলে ভাসে তবুও জয়ফনি তোলে মেরা ভারত মহান, মেরা ভারত মহান, মেরা ভারত মহান। আমরা জয় বলার দল মুখখু।

আমার ভাবনাও বলিহারি। বাসা বাধার আর জায়গা পেলো না ভাড়া চোর মন অধফলি জীবন চালচল হীন দেখে, তার মধ্যে বাধন বেঁধে ঠ্যাং নাড়ানো, আমি কি শালা পণ্ডিত কল্যাণগর তোমার ওই জন্ম দেওয়া খোঁচামারা প্রশ্নের উত্তর দেব, ছাত্রাটো বছর পার করে ফেল্লুম, তবুও তোমার প্রশ্ন কমে না।

কোটি কোটি বছরের এই শোষণ, শাসন, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা এর কি অবসান আছে। যে জানে তাকে তো আমি জানি না। দৃষ্টি আমার আপসা যেদিকে তাকাই আঁধার আর আঁধার। পদধ্বনি শুনি ওই কুন্ডি কে আসে, পথ দেখাবে এবার। কিন্তু কোথায় যেন পথ হারিয়ে যায়। আর হতাশা আবার অশান্তি। সব খেড়ে ফেলে আবার শুরু হয় বেঁচে থাকার লড়াই। একটু যখন হাতে পায় বল এলো বেরিয়ে পড়লুম খাবারে সন্ধানে। মিলে গেল এক বিরাট খাবারের ঠেক। পরিচয় করিয়ে দিলো আমার দুই বন্ধু লালু আর কালু তাদের প্রিয় ডাস্টবিনের সাথে প্রথমটা একটু কেমন কেমন হচ্ছিলো, তার পর আমার অজান্তে হাত দুটো কখন চলে গেল ডাস্টবিনের

ভিতরে উঠে এক দামি দামি সব খাবার। গোটা গোটা রসগোল্লা, কটলেট, মাছ, মাংস জীবনের প্রথম এতো সুখাদু খাবার। এ কি আমাদের জন্যে রেখে দেওয়া, না ফেলে দেওয়া না নয় ফেলে দেওয়া নয়, রেখে দেওয়া এতো ভালো ভালো খাবার কেউ কি ফেলতে পারে?

পরে জেনেছি, ওই খাবারগুলো আমাদের জন্যে রেখে দেওয়া নয়, ফেলে দেওয়া, খুটা এটো উচ্ছ্রিষ্ট, জীবন শক্তি এতো যে কলেরাও হলে আমার বেশি করে খেতে চেয়েছি বহুবার, শত লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, যন্ত্রনার সঙ্গে রসগোল্লা খুটাটোও হজম হয়ে গেছে ভিতরে ভিতরে।

নিজের সঙ্গে নিজে আপস করে নিয়েছি বেঁচে থাকার তাগিদে। যখন আমি টের পেলাম ভারি কিছু চাপাতে পারি, মাথায় মোট বইতে পারি বেড়িয়ে পড়লাম কাজের সন্ধানে, বরস তখন আমার চৌদ্দ কি পনের, কারোর জল তুলে দেওয়া আরো কত কি। কিন্তু ভাবনা আমার মধ্যে একটা অংক তৈরী করে তোলে তাহলে ন্যায্য, বোধটাকে আমার মধ্যে কিছুটা বসিয়ে নিলো। টের পেলাম, আমার শ্রম চুরি হচ্ছে। কারণ সকাল আটটা থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত এক টিপি কয়লা ভেঙ্গে মজুরি দেয় দশ পয়সা আগে কাজের মাসি পেত অতিআনা, আমার বেলায় দশ পয়সা কেন। আমার প্রশ্ন আমার কাছেই জমা থাকে আমি শুধু গিন্নি মায়ের মুখের নিকে ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি, খিদে পেয়েছে বুকি এই বলে রান্না ঘর থেকে দুটো বাসি রুটি এনে আলগোছে আমার হাতে দিয়ে বললো নাও পেট ভরে খেয়ে বাড়ী চলে যাও।

বাড়ীই চলে যাব। তোমার বাড়ীতে থাকব না। তোমার বাড়ীতে আমি কয়লা ভাসতেও আসব না। তুমি চোর তোমার শরীর ভরতি গহনা। ঘর ভরতি আলো, খটি পালঙ্ক কি নেই তোমার তুমি মা হয়েও একটা শিশু শ্রমিকের শ্রম চুরি করো। আমার মায়ের কিছু নেই, নেই গহনা, নেই খটি পালঙ্ক, ঘর ভরতি আলো নেই, পরের বাড়ীই কিরের কাজ করে আমাদের খাওয়া, তোমার মত চুরি করে না।

রুটি দুটো তখন আমার হাতের মুঠোর মধ্যে, ভেবেছিলাম লালু কালুকে দিয়ে দেব, বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই ভাবলাম যা আমি ঘেঁষায় খেলাম না, তা তাদের খাওয়াতে যাব কেন? ছুড়ে ফেলে দিলাম ওই ডাস্টবিনটার মধ্যে। আমাদের বস্তির কাছে একটা শানবাখানো পুকুর ছিল ভাল করে স্নান করে ঘরের কাছাকাছি আসতেই গরম গরম ভাতের গন্ধ নাকে এলো। সঙ্গে সঙ্গে পেটের নাড়িগুলো দুলতে শুরু করলো। সারা সকালের যমজাক বজ্রাত ক্ষিদে, ঘরে ঢুকে দেখি মা আমার কাঠের উনানে ভাত রান্না করছে বজ্রাতটাকে ধামাতে চোখবুখে শ্বাস নিলাম খুটখুট ভাতের গন্ধ খেতে।

মা বলল যা স্নান সেরে আয় ভাত হয়ে এসেছে, এখনি খেতে দেব। আমার ছোট বেলায় শোনা একটা গান আজোও আমার মনে আছে। ধন ধানো পুষ্পে ভরা আমাদেরই বসুন্ধরা তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা। কবির এই কথা শুলোকে নিয়ে ভাবনা আমায় কম ভাবায় না। আমি ভাবনাকে ভালবাসি বলেই। ভাবনা বলে কেন ধামবো। তুমি কি

জানতে চাওনা ওই কথাটা ভুল না ঠিক, কবি মিথ্যে, না কথা মিথ্যে, কবি তার কবিতার মধ্যে দিয়ে বলে গেছে, তোমাদের শব্দভান্ডারের পরিপূর্ণতার কথা। তা যদি সত্য হয়, তাহলে তোমার এই দশা কেন, তোমার এক দাদাকে পাগলা গারদে থাকতে হয়। দুই দাদাকে পাড়া ছাড়া হোতে হয়। মাকে পরের বাড়ী পরিচারিকার কাজ করে খেতে হয়। আর তোমাকে যে বয়সে তোমার লেখাপড়া করা দরকার, খেলাধুলা করা দরকার পেট ভরে খাওয়া দরকার তা নেই।

তখন তোমার কি দশা, দিনে একবার একমুঠ খাবারের খোঁজে ওই ডাস্টবিনটার ভিতরে কুকুরে তোমাতে টানাটনি হয়। জানতে চাইবেন না তোমার সেই কবির পরিপূর্ণ শব্দ ভান্ডারের মাল খেলো কোন গরতে। বংগের না দিল্লির, পাঞ্জাব না হরিয়ানার উত্তর দাও, এখন বলবেন তবে কি কবির কথা মিথ্যে? তোমার জুতাটা অজস্র বিজ্ঞাপনের মত, তোমাদের ভুলিয়ে রাখা মিথ্যে স্বাধীনতার মত? তোমাদের ছোট নেতা, মাথাগিরি নেতা, রাজ্য নেতা রাষ্ট্র নেতা, সকলে মিলে তোমাদের চেটেছে, মেরেছে।

রক্ত, ঘাম শ্রম হাড়, মাংস সব চেটে পুটে খেয়ে তোমাদের কঙ্কালটাকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছে তাদের মহান ভারতভূমির আনাছে, কানাছে তাদের সেবার স্বার্থে দাস হিসাবে, আর তোমরা, কেলানে কঙ্কালের দল, মাথাগুজে সসোর করে চলেছো বছর বছর ধরে। আর আমি একটু ভাবলেই, ভাবনার দোষ হয়ে যায় তাই না।

তোমাদের দেশের একজন নেতার তলার কাঁটা ফুটলে সেই কাটা ভুলতে যায় বিলাতের হাসপাতালে, আর তোমাদের বেলায় অসুখ হলে দুটো বড়ি এক চামচ টনিক জোটেনি। তোমার বাবার কথা ভুলে গেছো কেলানে কঙ্কাল। এক বছর ধরে নাক কান মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে ফুলে জোপ হয়ে কিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন। কিছু করতে পেরেছিলে তার জন্যে। শুধু হাত পা ছুড়ে কামা ছাড়া। কেন তোমার বাবার চিকিৎসার অধিকার ছিল না। তোমার কবির ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা দেশের কাছে, মেরা ভারত মহানদের কাছে গনতন্ত্র ভরা দেশের কাছে। মাথাগুজে ঘাপটি মেরে আছে কেন উত্তর দাও, একটু পরেই ইনিয়ো বিনিয়ো বলবে আমি কিছুই জানিনা, কিছুই বুঝিনা, এর উত্তর দেবে কেমন করে তাই না, তোমাকে দেখে ক্রান্ত বলে মনে হচ্ছে। বেশ তুমি একটু জিরিয়ে নাও। আমিও একটু ঘুরে আসি।

আমিই ক্ষমা চাইছি আপনাদের কাছে আমার ভাবনার হয়ে জ্ঞানী গুনি মানুষদের সম্বন্ধে এমন করে কেউ কথা বলে, আসলে লেখাপড়া নাজানা অশিক্ষিত আমার মত গাছাটের সঙ্গে থাকার ফল, ও খুব ভাল মানুষ জানেন, এর ওই কঠিন কঠিন কথা শুনে আমি বুঝতে পারিনা দেখে ও রাগের মাথায় এই সব বলে ফেলে, আমিও বোঝার চেষ্টা করি, কিন্তু সময় পাই কোথায় বলুন, দুবেলা দুমুঠো ভাতের যে লড়াইটা করতে আমাদের আঠেরটা দাঁটা পেরিয়ে যায় বোঝাপড়ায় আর চেষ্টা করি কখন। যখন আমার বয়স স্কুড়ি পেরোল, মাকে হারানাম, আমার শেষ সম্বল, সেটুকু হারিয়ে গেলে জানি মাকে ছাড়া আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। তবুও

মনে হয় আমি রিক্ত হয়ে গেলাম, আমার কাছে আমার পৃথিবীটা শূন্য হয়ে গেলো, আমি আজ একা বড় একা, সারাদিনের ক্লান্তি, একপেটে খিদে নিয়ে যখন মায়ের কাছে আসতাম, মা আমার কাছে গিয়ে আঁচল দিয়ে হাওয়া দিতো, মাথায় গারে হাতবুলিয়ে দিতো, আর আমার মনে হতো আমার সব ক্লান্তি, সব খিদে, কোথায় উধাও হয়ে গেল, মায়ের আঁচলের শীতল বাতাসে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়তাম টের ও পেতাম না। এখন আর আমি আগের ব্যক্তিতে নেই। বাড়িওয়ালার - লাথকুত, ঘাড়খাঁকা খেয়ে রাজভাগ্যার খালপাড়ায় এসে খুপড়ি বেঁধে এখন রাতের ঘুমোবার ব্যবস্থা করে নিয়েছি। গীতার কৃষ্ণ নিজেই বলেছেন, তোমার যা কিছু হয়েছে, তা ভালর জন্যে হয়েছে। তোমার যা কিছু হচ্ছে ভালর জন্যে হচ্ছে তোমার যা কিছু হবে ভালোর জন্যে হবে। যদিও ভালোর কারণগুলো বলেনি। বলে থাকলেও আমার বোধ হয় পাড়ার দাদারা জানতেন না বোধহয় আমায় যে গালাগাল দেয় তার দুই-একটি আপনারা শুনে ফেলেছেন আর নয় অনেকে অনেক পের, যেমন, দালাল, খচ্চর, পণ্ড, গাধা, তয়োয়, ভেড়া, শালা উল্লুক। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এইগুলো হতো। তা ওদের বোঝাবে কে?

ছোট বেলায় যাদবপুরে দালানবাড়ি থেকে বন্ধুর বাবা তাদের আদরের ছেলেকে চিৎকার করে বলত - "পৌদের ছেলেটার সাথে খেলবিনা" - পরে জেনেছি আমরা পৌত্র, তাতে কি দোষ, আমার হাফপ্যান্ট ছেঁড়া তাই আমি খেলার সাধী পাব না। আজ নোনাডাংগায় উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে আছি। সকলে মিলে ঠিক করেছি যে সকলের সাহায্য সহযোগীতা নিয়ে নিজেদের সমস্যা নিজেরা মেটাতে পারি, নিজেরাই লড়াই এ নেতৃত্ব দিতে পারি, প্রশাসনের সাথে দাবী নিয়ে কথা বলতে পারি তখন "ভদ্রলোক বাবু" নেতারা গালাগালি দেয় কেন? নেতৃত্ব হারাবার ভয়? "ছেটলোক অশিক্ষিত"দের নেতৃত্বে ভয়? নাকি মডল নম্বর দের থেকে ভট্টাচার্জ - চক্রবর্তীরা বেশি বোঝেন? এ আর এক প্রশ্ন আবার তাড়া দিতে শুরু করেছে। যাই কোথায়?

জয় ভীম কমরেড অর্ক সেনগুপ্ত

যে কোনো সংগ্রামের ইতিহাসে এমন একটা সময় আসে যখন সঠিক অবস্থান নেওয়ার ওপরই নির্ভর করে সংগ্রামের জয়-পরাজয়। সেই সময়টাতেই সংগ্রামের প্রতি আন্তরিক সাথীদের শিখতে হয় সংগ্রামের ইতিহাস থেকে। শিখতে হয় নির্মমের ভাবে। ঠিক করতে হয় ভবিষ্যতের পথ। বহুজন আন্দোলনের আমরা একটা তেমনই সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি। এই সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য। কারণ দলিত-আদিবাসী-সংখ্যালঘু ও নারী আন্দোলনের মর্যাদা আমাদের আমরা অজস্রবার আন্তরিক প্রচেষ্টার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি এবং এখনও করছি। পেরিয়ার- ফুলে-রোকোয়া-আবেদকারের দেখানো পথে অনেক সংগ্রামী সাথী আপোষহীন লড়াই করে গেছেন ও যাচ্ছেন। তারাই সাথে এঁদেরকে শুধুমাত্র মৃত্যুত পরিত্যক্ত করে ব্রাহ্মণ্যবাদের তালোকারেও পরিত্যক্ত হয়েছেন অনেক। আর এই তাঁদের তৈরী করে শোষণ চালিয়ে যাওয়াটা ব্রাহ্মণ্যবাদ তথা যে কোনো শোষণ মতাদর্শের বহুদিনের নীতি। অবার অন্য দিকে ব্রাহ্মণ্যবাদের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর জঙ্গি আঘাতও হোনে চলেছেন বহুজন জনগণ, তারা বামপন্থী মতাদর্শ নিয়ে লাড়তে চলেছেন এবং তাদের লাড়তেই রয়েছে বহুজন জনগণেরই সিংহভাগ উপস্থিতি। বস্তুতঃ চরিত্রের নিক দিয়ে দুটি পন্থই শ্রেণী সংগ্রামের ও একই সাথে ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম। বহুজন আন্দোলনের এই ক্রান্তিকালের দাবী হল পেরিয়ার-ফুলে-রোকোয়া-আবেদকারের মতাদর্শের সাথে বামপন্থী মতাদর্শের আত্মসম্পর্ক অনুসন্ধান করার ও একে অপরের থেকে গ্রায়েজনীর শিকড়গুলি গ্রহণ করার।

প্রথম ধরার মধ্যে আবেদকারই একমাত্র বামপন্থী আদর্শের সাথে কিছু মতপার্থক্য রেখে গেছি সেন, এবং আবেদকারবাই এই ধারার সবচেয়ে জনহীন মতাদর্শ। পেরিয়ার বেশ কিছু দিন বামপন্থীদের ঘনিষ্ঠই ছিলেন (এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে সেই সময়ের বামপন্থী নেতৃত্ব ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী কোনো ভাবনা বা কর্মসূচী হাজির করতেও পারেন নি এবং তারা তা চেষ্টাও করেন নি) এবং ব্রাহ্মণ্যবাদ দ্বারা প্রভাবিত থেকে বামপন্থার থেকেই দুইই অবস্থান নিরেয়েছিলেন। তাঁর লেখা পড়ে বামপন্থার সাথে মতপার্থক্য নয় বরং সমর্থনই পাওয়া যায়, ফুলে বা রোকোয়া এ নিয়ে কিছু সিনে যান নি। এদের মধ্যে আবেদকার ছাড়া আর কেউই সেভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদের অর্থনৈতিক চরিত্রটির নিকে আলোকপাত করে যান নি। তারা সবাই জোর দিয়েছিলেন সাংস্কৃতিক দিকটিতে, অমর্যাদা ও অসম্মানের দিকটিতে। আসলে অমর্যাদা ও অসম্মানের যে পাতাল ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বহুজন জনগণের ফুলের ওপর চালিয়ে যেতেছে হাজার বছর ধরে সেই পাতালের নীচে লুকিয়ে থাকা অর্থনৈতিক উদ্বেগকে দেখতে পাওয়া

সহজও ছিল না। অন্যান্যদের প্রচেষ্টার পর্বগুলি পার হওয়ার মাধ্যমেই আবেদকার তার কাছাকাছি পৌঁছান। এখানেই আবেদকারের কৃতিত্ব। আর এই কৃতিত্বের মাধ্যমেই আবেদকার বামপন্থী মতাদর্শের অনেক কাছাকাছি চলে আসে, কারণ বামপন্থী মতাদর্শ মানে করে অর্থনৈতিক শোষণই হল সব ধরনের শোষণের ভিত্তি (অন্যান্য শোষণগুলিও কম গুরুত্বপূর্ণ তা নয়)। কাছাকাছি অবস্থান করলে আবেদকার বামপন্থী মতাদর্শের প্রতি কিছু মতপার্থক্য রাখেন, মূলতঃ ২ টি বিষয় ছিল এই মতপার্থক্য— (১) একদলীয় শাসন; (২) হিংসা। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও ইতিহাসের স্বাপেক্ষে আমরা আলোচনা করে দেখব এই মতপার্থক্য কোন মতাদর্শ সঠিক, আবেদকার না বামপন্থী।

আলোচনা শুরু করার আগে এটা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার যে এই আলোচনার উদ্দেশ্য কোনোভাবেই বহুজন মুক্তির শিখার বাবাসাহেব আবেদকারের অবদানকে খাটো করা নয়, বরং তার অনস্বীকার্য অবদানকে স্বীকার করে নিয়েই এই আলোচনা। বামপন্থী ভাবাদর্শের সাথে আবেদকার যে ২টি প্রধান মতপার্থকের উল্লেখ রেখে গেছেন তার ১টি হল বিপ্লব পরবর্তী সমাজে একদলীয় শাসনের বিষয়টি। এক দলীয় শাসন প্রকৃত অর্থে শ্রমিক শ্রেনীর একদলীয় শাসন, যা ভারতের মতো আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-ঐপনিবেশিক দেশে সমস্ত শোষিত জনতার একদলীয় শাসনের প্রতিনিধি। এখানে এই শ্রমিক শ্রেনীর একদলীয় বা সমস্ত শোষিত মানুষের একদলীয় শাসনটিতেই প্রধান। এক দলীয় শাসনের ভাবনাটি নয়। কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিক শ্রেনী ও সমস্ত শোষিত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে বলেই ঐ একদলীয় শাসনের কথাটি ওঠে (এখানে কমিউনিস্ট পার্টি বলতে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির কথা বলা হয়েছে, কমিউনিস্ট মুখোশ পরা শাসকের দালালদের কথা বলা হয় নি) এবং ঐ একদলীয় এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা। যদি আমরা ইতিহাসের দিকে তাকাই তবে দেখতে পাব যে এই উপমহাদেশে অর্ধ আগ্রাসনের সাথে সাথেই প্রায় শুরু হয় ব্রাহ্মণ্যবাদের একদলীয় শাসন, অধিকার থেকে দলিত-আদিবাসীদের বঞ্চিত করে তাদের শুধুমাত্র উচ্চবর্নের দাস-দাসীতে পরিনত করে রাখার ইতিহাস তারপর থেকেই চলে আসছে। সামান্যতম প্রশ্ন তোলা, প্রতিবাদ করা ও ব্রাহ্মণ্যবাদের বেঁধে দেওয়া ছকের বাইরে গেলেই দলিত-আদিবাসীদের ওপর নেমে এসেছে চরম প্রশাসনিক দমন। শত্রু পাঠ করার 'অপর্যবে' রাসের শপুক হত্যা, অস্ত্র চালনায় পারদর্শী হবার জন্য একদলীয় আঞ্চলিক সন্ত্রাস করে দলিত-আদিবাসীরা ধর্মাস্ত্রিত হয়েও সাথে অমর্যাদা-অসম্মানের পরম্পরা সত্য করে দলিত-আদিবাসীরা ধর্মাস্ত্রিত হয়েও রেহাই পান না। ব্রাহ্মণ্যবাদের এই চলমান একদলীয় শাসনের প্রতিবাদ বহুজন জনতার একদলীয় শাসন। আর ভারতে ৮-৭ শতাব্দী বহুজন জনতার একদলীয় শাসনই হলো প্রকৃত বহুজন জনতার একদলীয় শাসন। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা সমস্ত শোষিত মানুষের একদলীয় শাসনকে পঙ্কাস্ত্রের বিপ্লবী বামপন্থী মতাদর্শ অনুযায়ী সমস্ত শোষিত মানুষের সিংহভাগই হলেন বহুজন। বহুজন জনতার একদলীয় শাসন। কারণ ভারতে শোষিত মানুষের সিংহভাগই হলেন বহুজন। তবে জাতি-বর্ণ বহুজন কিন্তু শোষণ কিছু মানুষও নিশ্চয় আছে, যারা ব্রাহ্মণ্যবাদের তালোকারে

পরিণত হয়েছেন। তারা যে কোনো গ্রামের চরেও বড় দ্রাক্ষণ। শোভিত মানুষের একদারকর চলে তাদের ওপরও। যারা বহুজন হয়েও বহুজন জনতাকে সন্ত্রাস চালিয়ে উচ্ছেদ করতে চান তাদের জল-জল-জলির থেকে — হত্যা করেন — কারারুদ্ধ করান নিজেদের বহুজন ভাই-বোনদের, তারা আশ্বেকদের সেই শিক্ষা সমাজকে ফিরিয়ে দাও, থেকে বিচ্যুত। তাদের বহুজন বলে স্বীকার করে না আশ্বেকদের। বহুজন আন্দোলনের প্রতি আন্তরিক আশ্বেকদের সাথীরাই ঠিক করুন ঐতিহাসিক শিক্ষাকে গ্রহণ করে একদারকরের ধারনাকে তারা ঠিক বলে মানবেন কিনা? বহুজন আশ্বেকদের আকর্ষিত 'সুরাজ' (খুল রাজ) আসলে একদারকর ছাড়া প্রতিজ্ঞা হতে পারে না।

বামপন্থার সাথে আশ্বেকদের দ্বিতীয় মতপার্থক্যের বিষয়টি হল হিংসার প্রশ্ন। বামপন্থা বিপ্লবীরাই বলেছেন যে হিংসা ও বলপ্রয়োগের দ্বারা শোভিত জনগণ শোষকদের উৎখাত করবেন। যে কোনো শাস্ত্রপ্রিয় মানুষের কাছেই এই বিশ্বাস খুব নির্মম লাগতে পারে। কিন্তু ইতিহাস ও ঘটনাবলী কি আর কোনো পথ খোলা রেখেছে? শতক হত্যা, একদার আত্মল কেটে দেওয়া যেখানে গর্ব ভরে উজ্জ্বলিত হয়ে দ্রাক্ষণবাদী শাসকদের কাঠে, সেখানে হিংসার মাধ্যমে প্রতিরোধ ছাড়া পথ কি শোভিত বহুজন জনতার কাছে। এক দ্রাক্ষণবাদী তাত্ত্বিক মোহনদাস করমর্দন গান্ধী বলেছিলেন — “একটা গোখের বদলে আরেকটা চোখ সমাজকে অন্ধ করে দেবে।” ধূর্তভাবে দ্রাক্ষণবাদ এভাবেই শাস্তির বাণী ফেরি করে আস্তিনে ঘুরি লুকিয়ে। বিপ্লবী হিংসা কখনোই বলা নয় যে চোখের বদলে চোখ চাইবে, এ হল প্রতিরোধ যুদ্ধ। যে যুদ্ধ শোভিত জনগণের ওপর চালিয়ে দিয়েছে শাসক, আমি অনন্তকাল ধরে। ইতিহাসের দিকে তাকালে ঐ সব দ্রাক্ষণবাদী হিংসার কোনো জবাব কি আমরা বুঝে পাই বিপ্লবী হিংসা ছাড়া? শাস্ত্রপূর্ণ প্রতিবাদে কি ছালা হয়েছে তা আমরা বারবারই দেখছি। দেখছি চার্বাকদের পরিণতি, চৈতন্যের অন্তর্ধান (সেটা খুন হবার সম্ভবনাই বেশি), সৌতম বুদ্ধ ও চৈতন্যকে দ্রাক্ষণবাদী অবতার দানের মাধ্যমে দ্রাক্ষণবাদের বিরোধী এই আন্দোলনগুলিকে গিলে খাওয়া।

সুদূর ইতিহাস থেকে অদূর অতীতে নেমে এলে আমরা আরো ভালো করে দেখতে পারব দ্রাক্ষণবাদী হিংসার চেহারাটিকে। ১০ বছর পার করলাম আমরা গুজরটি সংগঠিত সংখ্যালঘু গণহত্যা। ইটালির নেটের সাহায্যে সংখ্যালঘুদের বাড়িগুলি চিহ্নিত করে চালানো ঐ গণহত্যাকে নিশ্চয় আমরা ভুলে যাইনি। দাসার নামে বারবারই সংখ্যালঘু নিধন যজ্ঞে নেমেছে দ্রাক্ষণবাদী শাসকরা। বিহার-ঝাড়খন্ড-উত্তর প্রদেশের গ্রাম-গ্রামান্তর দাপিয়ে বেঁচেয়েছে রনবীর সেনা, ভূমি সেনার মতো উচ্চবর্ণের জেতদারদের বেসরকারী সেনা। খুন-বর্ধন-গ্রাম পোড়ানোর রেকর্ড স্থাপন করেছে তারা। বাখানিটোলা-আরওয়েল-আহানাবল গণহত্যার মাধ্যমে গড়ে তুলেছে বহুজন জনতার মৃতদেহের স্তূপ। লক্ষ্য করুন পাঠক-পাঠিকা

এই বেসরকারী সেনা একই সাথে উচ্চবর্ণ ও জমিদার-জেতদারদের স্বার্থ রক্ষা করে, দ্রাক্ষণবাদের অর্থনৈতিক দিকটার স্পষ্ট প্রমাণ। দীর্ঘ আন্দোলনের পর অগুনতি খুন-বর্ধন-অপহরণ-সম্পত্তি ধ্বংসের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয় রনবীর সেনার প্রধান ব্রাহ্মণের সিং। গত বছর পটিনা হাইকোর্ট তাকে জামিনে মুক্তি দেয়। কিন্তু রনবীর সেনা ভূমি সেনার বিরুদ্ধে সংগ্রামের বামপন্থী কর্মীরা জেল খাটছেন হাজারে হাজারে, মৃত্যুদণ্ডেও দণ্ডিত হয়েছিলেন বেশ কয়েকজন। রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র বাহিনী, বিচার ব্যবস্থা ও বেসরকারী সশস্ত্র বাহিনী কাজ করে চলেছে দ্রাক্ষণবাদের খাতিয়ে। চালাচ্ছে হিংসাত্মক আক্রমণ। সেখানে জবাব দেওয়ার পথ কি? হয়ত পথ সেখানে বিহার-ঝাড়খন্ডই, যেখানে তিরিশ বছর ধরে সশস্ত্র প্রতিরোধের মাধ্যমেই বামপন্থীরা ভেসে দিয়েছেন রনবীর সেনা, ভূমি সেনার মতো বেসরকারী সশস্ত্র বাহিনীগুলিকে। পটিনা হাইকোর্ট থেকে জামিনে মুক্তি পাওয়ার পরদিনই নিজের বাড়ির সামনে খুন হয়ে যান ব্রাহ্মণের সিং। সেদিন বিহার-ঝাড়খন্ড তো বটেই বাংলার বিহারী বস্ত্রভলিতেও অকাল দেওয়ালী নেমে এসেছিল। এখন বিহার-ঝাড়খন্ডে বেসরকারী সশস্ত্র বাহিনীর জয়গা নিতে নেমেছে সরকারী সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ-সি.আর.পি.এফ.-কোবরা। গত তিরিশ বছরের সংগ্রাম যেখানে দ্রাক্ষণবাদী জমিদার-জেতদারদের হাত থেকে জমি কেড়ে নিয়ে বটন করেছে বহুজন কৃষকদের মধ্যে, যা দ্রাক্ষণবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তিতেই কামান যোগেছে। তাকে রুখে দিয়ে দ্রাক্ষণবাদকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে নেমেছে সশস্ত্র সরকারী বাহিনী। হিংসার পথ এতানোর পথ আছে কি? উদ্ভটতা ডাকার সময় এসেছে।

একথা খুবই সত্যি কথা যে, “বিশ্বের সবচেয়ে এগিয়ে থাকা মতাদর্শের বাহক” বলে নিজেদের দাবী করা বামপন্থী কর্মীরা বহুদিনই হিন্দু দ্রাক্ষণবাদ নামক এক ব্যাপিস্ট মতাদর্শটিকে নিয়ে সঠিক ভাবনা ও কর্মশীলী হাজার করেন নি। কিন্তু, সাতের দশকের শেষ থেকেই তারা এ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। শিবরাম চক্রবর্তী, কোসাম্বী, রাহুল সাকীর্জান, দেবীপ্রসাদ, দামোদরনের মতো বামপন্থীরা যদিও বিভিন্ন সময় দ্রাক্ষণবাদ ও জাতি-বর্ন ব্যবস্থাকে নিয়ে ভাবনা চিন্তা হাজার করেছেন তবু একটা বড় সময় ধরেই দ্রাক্ষণবাদ বিরোধী আন্দোলনের সাথে ভারতের পরিস্রোদ্ধিতে রাজনৈতিক বিপ্লবের আন্তর্গতীয় ধরতে পারেন নি বামপন্থী কর্মীরা। এবং অবশ্যই একথা স্বীকার না করলে অন্যায় হবে যে আশ্বেকদের-পেরিয়ার-মুলে-রোকোমারের ভাবনার সাহায্যেই গড়ে উঠেছে বামপন্থীদের দ্রাক্ষণবাদ বিরোধী সংগ্রামের রূপরেখা। যে কর্মীরা ভারতে সংগ্রাম গড়ে তুলতে চান তাদের অবশ্যই এখনও শিক্ষা নিতে হবে আশ্বেকদের-পেরিয়ার-মুলে-রোকোমার রচনাবলী থেকে এবং বহুজন মুক্তি আন্দোলনকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। তেমনই এদের যে সাচ্চা অনুশীলীরা বহুজন মুক্তি আন্দোলনের প্রতি আন্তরিক তাদেরও একথা স্বীকার করতে হবে যে, যে কোনো মতাদর্শেই নানা পর্যায়ের মাধ্যমে আগের ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উন্নত হয়, আশ্বেকবাদের-পেরিয়ারবাদের ক্ষেত্রেও তা সত্য, এই মতাদর্শগুলিরও ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা

আছে, তাকে কাটিয়ে উন্নত করতে হবে বহুজন মুক্তি আন্দোলনের মতামতকেই। আর তা করতে গেলে এ সংক্রান্ত বামপন্থী কর্মীদের ভাবনার সাথে পরিচিত হতে হবে তাদের, এদের কর্মসূচী ও ভাবনার থেকে শিক্ষাও নিতে হবে।

বামপন্থীদের সম্বন্ধে কিছু অভিযোগ খুব শুনেতে হয় বহুজন আন্দোলনের সাথীদের থেকে। যার একটি উঠে আসে কিছু ডান বামপন্থীদেরই বামপন্থার প্রকৃত প্রতিনিধি ধরে নেওয়া থেকে। যারা বামপন্থার নামাবলী গায়ে চাপিয়ে মরীচি ঝাঁপিতে দেশের সবচেয়ে বড় দলিত গণহত্যার কুশীলব, যারা নন্দীগ্রাম-কালগড়ে বহুজন জনগণকে গুলি করে হত্যা করেন তারা বামপন্থী নন। এদের বামপন্থী ভাবলে ভুল হবে। এরা ব্রাহ্মণবাদ সহ সমস্ত শাসকদের দালাল মাত্র। আরেকটি অভিযোগ হল বামপন্থীদের নেতৃত্বে যসে আছেন উচ্চবর্ণ হিন্দুরাই। কিছু দূর পর্যন্ত এটি একটি সত্য হলেও অভিযোগ হিসেবে সঠিক নয়। কারন পদবী নিয়ে যদি আমরা মানুষের সামাজিক অবস্থান নির্ণয় করতে বসি তবে মান্যতা দেওয়া হবে জন্ম নির্ধারিত ব্রাহ্মণ্যবাদী জাতি-বর্ণ ব্যবস্থাকেই। এবং তার সাথে অবশ্যই এটাও মাথায় রাখা দরকার যে নিছক ক্ষমতার ভাগ পাওয়ার জন্য যখন জন্ম সূত্রে বহুজন কিছু মানুষ ব্রাহ্মণ্যবাদের তাঁকোদের পরিণত হচ্ছেন, তখন নৈতিকতার ব্যতিরেকেই কিছু জন্মসূত্রে উচ্চবর্ণ মানুষও বহুজন-শোষিত মানুষের পক্ষে অবস্থান নিতেই পারেন। আর আমরা যদি গত ৩০-৪০ বছরে বামপন্থীদের ক্রিয়াকলাপ ওলিকে একটু গভীরভাবে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাব যে তাদের আন্দোলনে-সংগঠনে বহুজন জনগণের অংশগ্রহণই সিংহভাগ। ভারতের মতো দেশে শোষিত মানুষদের সংগঠনে সেটা হওয়াটাই স্বাভাবিক। এমনকি এই অংশগ্রহণের পরিমাণটা যে কোনো বহুজন সংগঠনের চেয়ে খুব কম নয়, বরং বেশিই বেশ কিছু ক্ষেত্রে। বামপন্থীদের নেতৃত্বেও বহুজন জনগণের সংখ্যা বাড়ছে, সেটা আরেকটি ভাল লক্ষন।

শেখের কথা হিসেবে একটি বাস্তবতা তুলে ধরতে চাই, যা ঐতিহাসিক সত্য, ১৯৪৭ সালের পর থেকে বেশ কিছু বহুজন মানুষ প্রশাসন-রাষ্ট্র-সরকারের ক্ষমতাবাদী পক্ষে আসীন হওয়ার পরও বহুজন জনগণের অবস্থা একবিমু পান্টায় নি, কিছু বহুজন মানুষের ক্ষমতায়ন নয়, দরকার সামগ্রিকভাবে বহুজন জনতার ক্ষমতায়ন বর্তমানে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী রাষ্ট্র বহুজন জনতার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তাতে সমস্ত শোষিত মানুষদের প্রতি আন্তরিক সাথীদের এক হয়ে লাড়়ে এই যুদ্ধে জেতার মাধ্যমেই ঘটতে পারে শোষিত ও বহুজন জনতার সামগ্রিক ক্ষমতায়ন। আসুন বামপন্থী কর্মী ও সাজা আবেদনকারী-পেরিয়ারবাদীরা গড়ে তুলি এক শ্রেণী-জাতি-বর্ণহীন সমাজ, এক নতুন ভারত।

“জয় তীম কমরেড”

মার্কিনী কাবুলীওয়ালা এবং

অনন্ত আচার্য

এদেশে আফগানদের সাধারণতঃ কাবুলীওয়ালা বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যমন্য ছোটগল্প অবলম্বনে তখন সিংহের সুপরিচিত ফিল্ম ছবি বিশ্বাসের অভিনয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল। হিন্দি দুটি মূল্যবিশেষ “কাবুলীওয়ালা” চরিত্রে অমিতাভ বচ্চন এবং প্রাণ অভিনয় করেছিলেন। স্বত্বিক কুমার যটক পরিচালিত কোমলগাঙ্গার ছবিতে নির্মল ঘোষ এক কাবুলীওয়ালার চরিত্রে এক দৃশ্যের জন্য অভিনয় করেছিলেন যে চারিটি নাটকের দলকে সুদে ধার দেয়। আমরা বরং স্বত্বিকের কাবুলীওয়ালাদের নিয়েই আলোচনা করি। ভারতে কাবুলীওয়ালাদের সংখ্যা ১ লাখের কাছাকাছি। তিব্বতি, ইরানী, পাকিস্তানী, বামিজদের মতো এরা ভারতে বিদেশী উদ্বাস্তু। রপ্তাপঞ্জর তহকিল থেকে এদের অন্তর্দান দেওয়ার জন্য ভারত সরকার প্রচুর টাকা পায়। এই কাবুলীওয়ালারা কয়েক দশক আগে হিং, কিসমিস, আখরোট ফেরী করত। এখন সুদের ব্যবসা চালায়। এ এক মৃত্যু কাঁদ।

কোনও ব্যক্তি যদি এদের কাছ দশ হাজার টাকা ধার নেয়, হাতে পায়ে আট হাজার টাকা। প্রতি মাসে সুদ দিতে হবে এক হাজার টাকা, অর্থাৎ বছরে ১২ হাজার টাকা সুদ। সুদের হিসাবে যা বাৎসরিক ১৫০ শতাংশ। রিজার্ভ ব্যাংকের আইন অনুসারে যা বেআইনী করণ এরা এই ব্যবসাকে লাইসেন্সপ্রাপ্ত আইনানুগ করে নিয়েছে। লাখ লাখ মানুষ সর্বস্বান্ত হচ্ছে।

ইসলাম ধর্মের নির্দেশে সুদ নেওয়া এবং দেওয়া ওনাহ (পাপ)। ভারতে কোনও ইসলামী ধর্ম প্রতিষ্ঠানকে এই কাবুলীওয়ালাদের অপকর্মের বিরুদ্ধে টু শপ করাতে শোনা যায়নি। কলকাতা শহরে ডাবানীপুরে এক মসজিদে এদের ভেড়া। কাবুলীওয়ালাদের সুদ ব্যবসা এ প্রবন্ধের মূল বিষয় নয়। অনেক মৌলানা মৌলবীরা, অনেক “ধার্মিক” রাজনৈতিক নেতারা ইসলামের নামে এমন সব ফতোয়া দেন যা কোরান-হাদিশেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভালাক (যে শব্দটি শুনাগে নাকি হাজারত মহম্মদের আসন কোঁপে উঠত) এখন মুসলিম সমাজে পুরুষতান্ত্রিকতার প্রধান অস্ত্র। সুদ ব্যবস্থা এড়াবার জন্য ইসলামী ব্যাংক আরেক ধরনের জোড়াতালী দেওয়া ধর্মোৎসাহী। ইসলামে ছবি আঁকা, ছবি তোলা নিষিদ্ধ। ফলে যারা পাসপোর্ট করে “হজ” গেছেন তাঁরা কতটুকু ওনাহ করেছেন কতটুকু পুণ্য অর্জন করেছেন তা বিচার্য। ইসলামে জাতিভেদ মান্যতা পায় না। তবুও শেখ, সৈয়দ, জোলা, আনসারি ইপারিকালে ওকিদি মুসলমান ফরাক থাকে। মীর মুসারফ হোসেনের বিবাহ সিদ্ধু গড়ার পর সেন তাজির নিয়ে “মোজিব” কে নাযাতা দেখে? মক্কতুমীর দেশে বাধ্য সন্ধারের জন্য, অনাহারের কষ্টের প্রতি সহমর্মীতা জাগানোর জন্য রমজান মাসে রোজা রাখার প্রথা চালু হয়েছিল। এখন রমজান মাস মাসে অতিব্যয়ের মাস, দরিদ্র মুসলিম পরিবার আরো কনগ্রু করার মাসে পরিণত হচ্ছে। “সুন্নত”, বুরখা ধারণ প্রাক ইসলাম যুগে মধ্য প্রাচ্যের লোকচার, আজকের সময়ে তা অবশ্য পালনীয় নাও হতে পারে।

মধ্যপ্রাচ্য, ইজাখুল, ইপোনেশিয়া, ভারতবর্ষ সহ বিভিন্ন দেশে ইসলাম অনুগামীরা তাদের

নিজেদের মতান করে জীবন যাপন করে যার মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাসে সমতা থাকলেও প্রয়োগে বিভিন্নতা আছে। হজরত মহম্মদের জন্মলাভের নাম আরবী। তিনি মুসলমান ছিলেন না। কোনও মুসলমানকে আরবী নাম নিতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রনায়িকা মেঘবতী সুকর্ণ এক মুসলিম পরিবারে জন্মেছেন।

আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে এক সুপরিচিত সমাজসংস্কারক তার অনুগামীদের উপদেশ দিয়েছিলেন :- “অমরত্বের সময় বোঁজ নেও যে তোমার গৃহের দক্ষিণে, উত্তরে, পশ্চিমে, পূর্বের কোনও প্রতিবেশী অভুক্ত আছেন কিনা।”

অন্যত্র তিনি বলছেন যে মজদুরের ঘাম মাটিতে পড়ার আগেই তাঁদের মজুরী দিতে হবে। তবুও সমাজবাদের নাম শুনেই মুসলিম দুনিয়ার শাসককুল রক্তচোষা “কাবুলীওয়াল”র মতো আচরণ করে।

ওসামা বিন লাদেনকে খুন করে নদীর জলে মার্কিন সেনারা ফেলে দিয়েছিলো বিচারের তোয়াক্কা না করে। সাদ্দাম হোসেনকে ফাঁসি দেওয়া হয় এক “পরবের” দিনে। এসবই মার্কিন সরকারের নির্দেশে ঘটেছে। দুনিয়ার তথাকথিত মানবাধিকার সংগঠনগুলি এব্যাপারে বিশেষ মতামত দেয়নি। মুসলিম দুনিয়ার উপর সাংস্কৃতিক আঘাত অনেকেরই নজর এড়ায়।

মধ্যপ্রাচ্যের তেল ব্যবসায়ীকুলের মসজিদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে যতটা আগ্রহ, নামাজী প্রার্থনাকারীদের জ্ঞানমান রক্ষায় ততটা আগ্রহ নেই।

আজ যখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সারা পৃথিবী জুড়ে “ইসলামোফোবিয়া” ছড়াচ্ছে, ইরাক আফগানিস্তান ধ্বংস করেছে। তখন মুসলিম সমাজকে আধুনিক দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে পথ চলতে হবে। একজন মুসলমানের একটি অনৈতিক কাজ তসলিমা নাসরিন, সুলমান রুসদির পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি করবে যা ভবিষ্যতের পক্ষে মোটেই শুভলক্ষণ নয়। প্রার্থনাস্থলে আটকে থেকে বাইরের দুনিয়া না দেখলে প্রার্থনা স্থান ও আত্মপ্ত হোতে পারে। বাবরি মসজিদ ধ্বংস তার একটা নমুনা। ভারতে মুসলিম সমাজ যদি তাদের দলিত, আদিবাসী জাতিব্রাতা-ভগ্নিদের সাথে একতা না গড়ে বারবার গুজরাট, ভাগলপুর, নেলী, মীরাটের মতো গণহত্যা ঘটবে। হিটলার ইহুদি নিধনের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদের সূচনা করেছিলো। ভারতে ফ্যাসিবাদ আসতে পারে বর্ণহিন্দু আধিপত্যবাদ এবং বিশ্বায়নের যৌথ বড়বয়ে। ভারতবর্ষ সহ বিভিন্ন দেশে এক ব্যাপকতম যুক্ত মোর্চার গঠনের চেষ্টা চলছে যেখানে আন্তর্জাতিক স্বৈরতন্ত্রের প্রতিটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরোধী শক্তিকে জমায়েত করা যায়।

এ সংগ্রামে যে শত্রু নয় সেই বন্ধু।

